# সূচীপত্র

১৩৬৯ দ্বিতীয় বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVER

756.3
·001/40
Y.2. No-6

বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ ॥ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ ৯

ভগবদগীতা রহস্য ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১১

নষ্টচন্দ্র নিঃশব্দ ॥ গোবিন্দ গোস্বামী ॥ ২৬

আর্টের অপমৃত্যু ॥ বিশ্বনাথ রায় ॥ ৩৬

ক্রৌঞ্চমিথুন ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ১৩

একজন ও আরেকজন ॥ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪৭

মাকালি দুর্গের কুকুর ॥ বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ ॥ ১২৭

চিনিবাস চরিতামৃত ॥ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ॥ ৫৯

ফুলক গল্প

মৃত্যুসেল-এ মধুচন্দ্রিকা রহস্য ॥ বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥ ২৯

অপরাধের অধিনেত্রী মা-বেকার ॥ সুনীলচন্দ্র বসু ॥ ১১৯

বিভাগীয় রচনা

নিজের বুকের আগুনে ॥ সনাতন পাঠক ॥ ২৮

স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি ॥ শান্তি ঠাকুর ॥ ৪১

মেঘে ঢাকা শুকতারা ॥ হিরণ্যপ্রিয় ॥ ৪৩

তামাক ॥ অমিয় চট্টোপাধ্যায় ॥ ৫৫

আপনার শব্দ ভাণ্ডার পূর্ণ করুন ॥ অরিজিৎ আচার্য ॥ ১১০

গিল্ট কমপ্লেক্স ॥ আনন্দ ভট্টাচার্য ॥ ১১১

একটি বিচিত্র অসুস্থতা ॥ জীবনময় দত্ত ॥ ১১৬

চলচ্চিত্র ॥ চিত্রদূত ॥ ১৩২

নতুন বই ॥ খবরনবীশ ॥ ১৩৩

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা দেশে একটি পরিণত শতদল। যার এক একটি পাপড়ি বিরাট প্রতিভার জ্যোতিষ্ক হয়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে দীপ্তি ছড়িয়েছে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে যিনি দেশবাসীর হৃদয়ের গর্ব; তিনি এই জ্যোতিষ্ক পরিমণ্ডলের অন্যতম সূর্য।

আজ থেকে একশো বছর আগে দ্বিধায়, তমসায় দেশ যখন বিমূঢ়—মানুষ অবিশ্বাসী স্বধর্মে, আস্থাহীন আপন স্বাধীনতাবোধে, সেই নিমজ্জমান পঙ্ককুণ্ড থেকে বিবেকানন্দ তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস ও অতুলনীয় কর্ম-ক্ষমতা দিয়ে সকলকে সরল পথটি নির্দেশ করেন। বিবেকানন্দ প্রথম বয়সে ঈশ্বর খুঁজেছেন সর্বত্র, বিচলিত হয়েছেন তাঁর অস্তিত্বে কিন্তু একবারও পার্শবর্তীর প্রতি নজর দেন নি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর চোখে

সেই দৃষ্টিই বুঝি এঁকে দেন—এই তো ঈশ্বর, এই মানুষ, দেশমাতৃকা এর ভিতরই তাঁর স্থান। গুরুর কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে তাঁর বিলম্ব ঘটে নি; আমার গুরুকে—? তিনিই তো মনুষ্যরূপী ভগবান—এবং যেখানে যাদের প্রতি তাঁর কৃপা, তাদের সেবাতেই, তাদের জ্ঞানচক্ষু জেবলে দেওয়াতেই আমার মুক্তি, আমার ঈশ্বর প্রাপ্তি।

ঠাকুর তাঁর মানসপুত্র সম্পর্কে বলেছেন, দেখ কেশবের মধ্যে যদি একটা শক্তি থাকে, তবে নরেনের তেমন আঠারোটা শক্তি আছে; নরেন জগৎ জয় করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দিগ্বিজয় করেছেন। ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে ঈশ্বরের মতোই প্রতিভাত। এবং আবার ঈশ্বরের পায়েই সর্বতোভাবে নিবেদিত।

১৯৬৩ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী—১৭ই জানুয়ারীতে এই জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে যে নিবেদনের দীপটি শত-শত বর্ষ ধরে দেশবাসীর হৃদয়ে বিশ্বাসের ধ্রুব জ্বালানো হল তা যেন কর্মে বীরত্বে স্বাজাত্য অভিমানে আলোক জ্বালিয়ে রাখে। সেই আলোকই বিবেকানন্দর প্রতি আমাদের প্রণামের প্রতীক হবে।

অনন্যা

দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা॥ ১৩৬৯ জানুয়ারী ১৯৬২

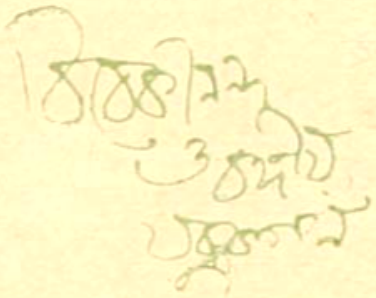

## গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বিবেকানন্দ একটি অতুল সম্পতি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার ধন ছিল না, যশ মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনসমাজ যে সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পত্তি তাঁহার নাই। তাঁহার সম্পত্তি—প্রেম। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আশা-ভরসা ছিল; সেই নিমিত্ত তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন। তাঁহার এই কষ্টার্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অতি যত্নে এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর সম্পত্তির রক্ষার নিমিত্ত নানা জনের সাহায্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। মনে স্থির বিশ্বাস রাখ, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্বার্থত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই পরকার্য-মহাব্রতে অগ্রসর হইতে পারিবে। "অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না"—বিবেকানন্দ বারবার উচ্চৈস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার-কার্য—ভারতমাতার কার্য,—দীন, হীন, সন্তাপিত, পদদলিত ভারত-মাতার সন্তানের কার্য, যে কার্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বারবার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন।

বিবেকানন্দ বলিতেন, "প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই মেরুদণ্ড ভগ্ন হইলে জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে। সন্ন্যাস ধর্ম সকলের জন্য নয়। বুদ্ধদেব সকলের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম নির্দেশ করায় অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি

হইয়াছে। বঙ্গ যুবক, বিশ্বাস করো—তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো—তোমরা অপরিসীম কার্যক্ষম। বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো—ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো—জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও—পশ্চাৎপদ হইও না, তোমরাই আত্মবলিদানে ভারতমাতার প্রীতি সাধন করিতে পারিবে, বিশ্বাস করো—তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো—কখনই নিষ্ফল হইবে না; তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই একমাত্র ব্রতী।"

বিবেকানন্দের এই শেষ কথা "বিশ্বাস করো।" এই বিশ্বাস দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি স্থাপনা করিবে।

[ গিরিশ রচনা থেকে

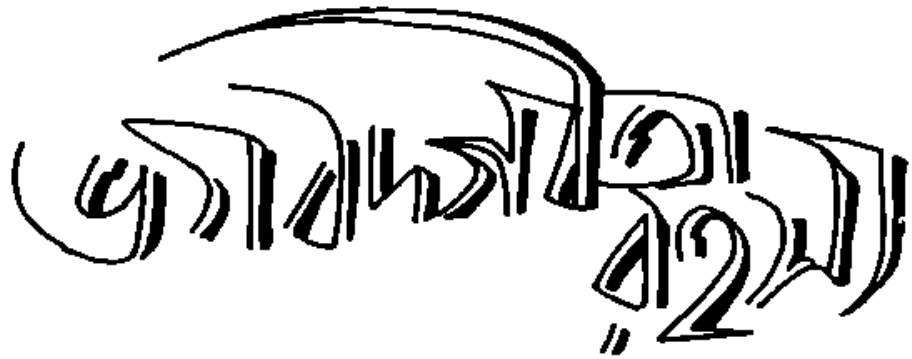

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কীর্তন করা বাহুল্য। এমন উদার ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে আর একখানিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা এত উদার যে, সকল ধর্মসম্প্রদায়ই এই অমূল্য মহাগ্রন্থকে আপনার করিয়া লইয়াছে। কতটা উদার, নিম্নলিখিত শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ।।"

অর্থাৎ, যে কোন ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাকে সেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি।

এমন গ্রন্থের ভাষাকার হওয়াও গৌরবের বিষয়। এইরূপ গ্রন্থের যে বহুতর ভাষা হইবে তাহাতে আশ্চর্য নাই। কিন্তু এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, কালিদাসের ভাষ্যকার যেমন মল্লিনাথ, মহাত্মা তিলকও সেইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার। ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহবা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা সন্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সমন্বয় সাধনের মুখ তাৎপর্যটা কি, তাহারই তিলক তাঁহার গীতারহস্যে আভাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্মই গীতার মধ্য-বিন্দু—মুখ্য উদ্দেশ্য, ভগবান অর্জুনকে সর্বতোভাবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি, কর্মের পরিপন্থী নহে পরন্তু কর্মের পরিপোষক ও সহায়। জ্ঞান ও ভক্তি কর্মে গিয়া পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে। এই ভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয় করিয়াছেন। কর্মই যে গীতার প্রধান কথা তাহাতে সন্দেহ নাই,—

—কেননা, অর্জুনকে যুদ্ধকর্মে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শুধু কর্ম করিবে বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না, ভগবান বলিয়াছেন, যাহা স্বধর্ম অনুমোদিত সেই কাজই অবশ্য কর্তব্য এবং ঈশ্বরের হস্তে কর্মের ফলাফল সমর্পণ করিয়া, নিষ্কামভাবে যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মই শ্রেয়। এইরূপ কথা বলাতে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় সমাকরূপে সাধিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য পৃথকভাবে কীর্তিত হইলেও, জ্ঞানভক্তিসমন্বিত কর্মযোগের প্রাধান্যই যে গূঢ়ভাবে গীতাতে সূচিত হইয়াছে, ইহাই মহাত্মা তিলক গীতার সমস্ত উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন এবং এই মতের পোষাকতায় সমস্ত শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, এমনকি এই উদ্দেশ্যে বিদেশী শাস্ত্রকেও বাদ দেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রের এত কথা আনুসঙ্গিকক্রমে তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, একজন যদি মনোযোগসহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করে, তাহার বেশ একটু শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে এবং সে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য এই গীতারহস্য পাঠ করিয়া, এই রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্যের দিনে, যদি কাহারও স্থিরপ্রজ্ঞা লাভ হয়। যদি কাহারও অন্তরে অচলা ধর্মবুদ্ধি নিষ্কাম কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয়, তাহা হইলে গ্রন্থ রচনা সার্থক হইবে।

"গীতারহস্যের ভূমিকা"

পৌষ ১৩৩০

# কৌঞ্চ মিথুন

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অনিল অনেকদিন ধরেই ভাবছিল তার বাবার ফটোখানা এনলার্জ করবে। অস্পষ্ট হয়ে আসছে ছবি। পঁচিশ বছর আগের জিনিষ। হবেই তো।

অনিলের স্ত্রী মীরা প্রায়ই বলে, জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে এনলার্জ করে নাও। বাবার আরতো কোন ফটো ঘরে নেই। ওটা গেলে আর কোন চিহ্নই তাঁর থাকবে না।' অনিল বলে 'কেন ও কথা যদি বলো তাতে আমার বাবারও মান থাকেনা আমারও অপমান করা হয়।'

মীরা ভ্রু-কোঁচকায়, 'তার মানে।'

অনিল বলে, 'মানে আমার মধ্যে কি বাবার কোন চিহ্ন নেই?'

মীরা হেসে বলে, 'ও সেই কথা? তা এক হিসাবে বলতে গেলে নেইতো। তাঁর কত গুণ ছিল, কত নাম ছিল। এক গাঁয়ে থাকতেন। কিন্তু পঁচিশখানা গ্রামের লোক নাম জানত। তোমাকে কজনে চেনে? বিশ পঁচিশ পনেরর বেশি নয়।' কথাটা ঠিক। মার্চেন্ট অফিসে দেড়শ টাকা মাইনের চাকরি করে অনিল। শ্যামবাজারের সরু গলির ভাড়াটে বাড়িতে দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকে। একখানা স্বামী স্ত্রীর। আর আধখানা অনিলের বুড়ো মার। তাঁর বয়স এখন সত্তর পেরিয়েছে। একচোখে ছানি। আর একটি চোখেও ভালো করে দেখতে পান না।

তবু অনিলের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানার সামনে তিনি মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ান। একলক্ষ্যে চেয়ে দেখেন। যৌবনের নয়, তাদের প্রৌঢ় বয়সের ফটো। পাশাপাশি স্বামী স্ত্রীতে বসে আছেন দুখানি চেয়ারে। কর্তার গা খালি। হাতে একখানি পকেট গীতা। মুখে মৃদু হাসি। চুলে পাক ধরেছে। বেশ বড় একটি ভুঁড়ি বেরিয়েছে। তার পাশে গৃহিণী চারুবালা। তিনি অত সাদাসিধে ভাবে বসেননি। বেনারসী শাড়ি পরে এসেছেন। গলায় হার, হাতে মোটা মোটা অনন্ত, বালা। কিন্তু কাণ্ড দেখ ফটোগ্রাফারের। অত গোল গোল চোখ ছিল নাকি চারুবালার! সেকালে সবাই তাঁর চোখের প্রশংসা করত। ভবশঙ্কর পর্যন্ত ঠাট্টা করতেন 'তুমি অমন পটলচেরা চোখে তাকালে আমার মাথা ঘুরে যায়।'

চারুবালা বলেন, 'তোমার শ্বশুরের ছবিটা বেশ ভদ্রলোকের মতই উঠেছে। কিন্তু আমার যা উঠেছে একেবারে জঘন্য। ফটোওয়ালা সুবল রায় আমার চোখ দুটোকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে।'

এই নিয়ে ভবশঙ্কর কি কম ঠাট্টা করেছেন। তখন গাঁয়ের বাড়িতে নিজেদের শোবার ঘরে ফটোখানা টাঙানো থাকত। কর্তা বলতেন, 'আসলে তোমার চোখ দুটি ওই রকম। কবরেজের দুটি বড়ির মত।' কিন্তু নিজের পরিবারের চোখকে তো তা বলা যায় না। তাই বানিয়ে বানিয়ে বলি পটলচেরা মৃগনয়না পদ্ম পলাশাক্ষী। কিন্তু ফটোগ্রাফার তো আর তোমাকে সে চোখ দেখেনি, ছবিতে যদি সত্যিই কমল নয়না হয়ে উঠতে চাও, ফটোগ্রাফার সুবল দাসকে একটু আলাদা চোখে দেখতে শুরু কর। ভিতরে ডেকে এনে বেশ ভাল করে আদর যত্ন—।'

'চারুবালা বলতেন, 'রাম রাম ছি ছি ছি। বুড়ো বয়সে তোমার হল কি। যত বয়স বাড়ছে তত রস বাড়ছে বুঝি?'

ভবশঙ্কর হেসে বলতেন 'আসল রস কি আর বাড়ে? সব রস চোখে আর ঠোঁটে এসে জমা হয়।'

সুবল দাস ছিলেন সখের ফটোগ্রাফার। ভবশঙ্করের বন্ধু। বয়সে সুবল কিছু ছোট হলেও রঙ্গ রসিকতা বেশ চলত দুজনের মধ্যে। সুবলবাবু বলেছিলেন, 'বৌদি। এরপর ভালো করে আর একখানা ফটো আপনাদের তুলে দেবে।' কিন্তু তোলা আর হয়নি। পুরোন ফটোখানার সামনে দাঁড়িয়ে সেকালের অনেক সুখ দুঃখের কথা মনে হয় চারুবালার। নিজের আর স্বামীর প্রতিকৃতি দুটি ভালো করে আজকাল আর দেখতে পাননা। কিন্তু আরো অনেকদিনের অনেকরকম ছবি একের পর এক

তাঁর চোখের সামনে ভাসে। ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মত।

সেই পুরোন আমলের ফটোখানা আজ যেন বসে আছেন চেয়ারের ওপর। সেইরকম একখানা ছবি কর। আমি থাকতে থাকতে কর। একটা চোখ তো গেছেই।

বই গোছাতে গিয়ে অসাবধানে ছবিখানা ফেলে দিল

যেতে বসেছে। চারুবালা নিজেও ছেলেকে তাগিদ দেন। 'ফটোখানা ঠিক করে আন। নষ্ট হয়ে গেলে আর পাবিনে।' অনিল বলে, 'আনব মা।'

চারুবালা বলেন 'কবে আর আনবি। আনব আনব করে সাত বছর কাটিয়ে দিলি। ওর থেকে কর্তার বড় করে একখানা ছবি করিয়ে আন, সরকার বাড়িতেও তাই দেখেছি, ওদের কর্তার কি চমৎকার ছবি করেছে! মনে হয় তাজা মানুষটিই আর একটি চোখের নজর যেটুকু আছে সেটুকু থাকতে থাকতে ছবিখানা করে আনা।'

অনিল তবু গাফিলতি করছিল, কিন্তু বই গোছাতে গিয়ে একদিন অসাবধানে ফটোখানা সে ফেলে দিল। মেঝেয় পড়ে চৌচির হয়ে গেল কাচ।

মীরা বলল, 'ছি ছি ছি, একি করলে।'

চারুবালা বললেন 'ওইটুকুই বাকি ছিল।'

এরপর অনিল আর দেরি করলনা। ফটোগ্রাফার বন্ধু দীনেশ রায়কে খবর দিয়ে আনল। দীনেশ বেশ ভালো ফটো তোলে। অনিল আর মীরার অনেক ফটো সে তুলে দিয়েছে। সেগুলির কিছু আছে অ্যালবামে। খান কয়েক বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে মীরা।

দীনেশ এসে সব দেখেশুনে বলল, 'বেশ তো করে দেব। এনলার্জ করে রঙীন করে দেব। অনেকটা অয়েল পেইন্টিং এর মত হবে। তোমাদের তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। কম খরচায় বেশ ভালো জিনিষ হবে।'

অনিলের যা অবস্থা তাতে তিরিশ টাকা ব্যয় করা শক্ত। এযেন নতুন করে পিতৃশ্রাদ্ধ। ফ্রেম থেকে ফটোখানা তুলে নিয়ে বন্ধুর হাতে দিল অনিল বলল, 'দুটো ফিগারই উঠবেতো?'

দীনেশ হেসে মাথা নাড়ল 'না না না। দুটো হবেনা। সে বড় ক্লামজি, খরচও পড়বে বেশি। তোমার বাবারই এখনকার মত করে দিচ্ছি। মা তো আছেন। তাঁরটা অন্য সময় করব। তাছাড়া এখানে ওঁর যা ফটো উঠেছে তাতো তেমন ভালো হয়নি। নতুন করে ওঁর একটা ফটো তুলে সেখানা এনলার্জ করে দেব।'

অনিল বলল, 'সেই ভালো। তুমি স্পেশালিস্ট মানুষ। যা ভালো বোঝ তাই কর।' ফটোখানা নিয়ে দীনেশ প্রায় তিন-মাস সেখানাকে নিজের কাছে রেখে দিল। অসুখ বিসুখ। অন্য পাঁচজনের অর্ডারপত্র আছে। অনিলের বাবার ফটো আর হয়না। এদিকে মীরাও তাগিদ দেয় অনিলের মাও তাগিদ দেন। 'কী হল সেই ফটোর?' অনিল বিরক্ত হয়ে বন্ধুকে এক পোস্টকার্ড লিখল, 'ওহে আমিও নগদ টাকাই দেবো আমার কাজটা আগে করে দাও।'

চিঠিতে কাজ হল। পরের সপ্তাহে দীনেশ এসে হাজির। ফটো এনলার্জ করে একেবারে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছে। কাগজের মোড়ক খুলে দীনেশ হাসিমুখে বন্ধুকে নিজের শিল্পকীর্তি খুলে দেখাল।

সেই আগের চেহারা ভয়ঙ্করের! মাথায় আধ-পাকা চুল, খোলা গা, ভুঁড়ি, হাতে গীতা সব আছে। মীরা স্বামীর বন্ধুর দিকে হেসে বলল, 'ভালোই তো হয়েছে।' অনিল বলল, 'মন্দ হয়নি, থ্যাংক ইউ, টাকাটা নিয়ে যাও।' দীনেশ ভদ্রতা করে বলল, 'এখন থাকনা।'

কিন্তু অনিল ওকে দামটা নগদই গছিয়ে দিল, 'পরে খরচ হয়ে যাবে। তখন কষ্ট হবে দিতে, দেনা পাওনা যখন মিটে গেছে জপ শেষ করে উঠে এলেন চারুবালা, 'ছবি এসেছে নাকি? দেখি দেখি।'

দীনেশ হেসে বলল, 'দেখুন তো মা কেমন হয়েছে।'

এনলার্জ করা বাবার ফটোখানা অনিল মার হাতে তুলে দিল। মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি, যা সে করিয়েছে তা যেন সামান্য একখানা ফটো নয়, স্মৃতি সৌধ। তার মত কেরানীর কাছে মাসের শেষে তিরিশ টাকা যে তিরিশ হাজার টাকার সমান।

অনিল হেসে বলল, 'কেমন হয়েছে মা?'

চারুবালা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, তারপর ছেলের হাতে সেখানা ফিরিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'বেশ হয়েছে বাপু, ভালোই করেছ।'

তারপর আর্টিস্টের দিকে চেয়ে

বললেন, 'বাবা দীনেশ, আমার সেই পুরোন ফটোখানা কোথায়? সেখানা আননি?'

দীনেশ লজ্জিত হয়ে বলল, 'একটা বড় দুঃখের ব্যাপার হয়ে গেল মা। ছেলে মেয়ের অসুখ বিসুখ গেল, বাসা বদলালাম, নানা গোলমালে কোথায় যে গেল ফটোখানা কিছুতেই খুঁজে পেলাম না, আমি আপনার একখানা ফটো বেশ ভাল করে তুলে দেব।'

চারুবালা রুঢ় কণ্ঠে বললেন, 'থাক থাক আর কিছু তুলতে হবেনা, বেশ করেছ, ভালই করেছ বাপু।' সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন চারুবালা, গিয়ে ঢুকলেন নিজের ঘরে। তক্তপোষের ওপর বিছানা গুটানো ছিল। সে বিছানা খুললেন না, খালি তক্তার উপর উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ব্যস্ত-হয়ে অনিল আর মীরা তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

মীরা বলল 'কী হয়েছে মা? শরীর খারাপ লাগছে?'

চারুবালা জবাব দিলেন 'না।'

অনিল বলল, 'কী হল মা? অমন করছ কেন তুমি?'

চারুবালা কান্নাভরা গলায় বললেন। 'কিছু হয়নি বাবা তোমরা যাও। ঘরে যাও।'

'যম যা পারেনি তোমরা তাই করে ছাড়লে। তোমরা একেবারে আলাদা করে দিলে।'

তক্তপোশের শক্ত কাঠে ফের মুখ গুঁজলেন চারুবালা।

[ নব ঐকতান

# নিউরবুকের আড্ডা

**সনাতন পাঠক**

বায়রণ যেদিন লর্ড মেলবোর্নের প্রসাদে এলেন তখন ক্যারোলিনের বয়স ছাব্বিশ। সেই বন্যসুন্দর, অদ্ভুত, চমৎকার মেয়েটি কবিকে দেখে কেঁপে উঠলেন। তারপর কোন কথা না বলেই ছুটে গেলেন বাথরুমে মুখ ধুতে। এতক্ষণ বহু পুরুষ মহিলায় পরিবৃতা হয়ে প্রগলভ হাসি গল্পে মগ্ন হয়ে ছিলেন কিন্তু বায়রণের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল তার মুখের প্রসাধন বোধ-হয় নষ্ঠ হয়ে গেছে। বায়রণের এক সঙ্গী বলে উঠলো, দেখো বায়রণ, তুমি কি ভাগ্যবান, লেডি ক্যারোলিন এতক্ষণ বিশেষ করে তোমাকে দেখেই তার মনে হল যে নতুন করে সেজে আসতে হবে।

তার মাত্র কয়েকদিন আগে বায়রণের চাইল্ড হ্যারল্ডের প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে।

ইংলণ্ডের অভিজাত-শ্রেষ্ঠ সমাজের দেব-কান্তি যুবক, হাউস অব লর্ডসে প্রথম

বক্তৃতা দিয়েই সাড়া তুলেছেন, সেই সঙ্গে অমন জ্বলন্ত, হৃৎপিণ্ড কাঁপানো কবিতা। ফলে রূপসী বিলাসিনী মহিলাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল তাঁর সান্নিধ্য পাবার জন্য। সে সময় ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজের মেয়েদের সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল দেশ বিস্তৃত, পুরুষেরা সাধারণত হতো পাগলাটে ধরনের—নানারকম অদ্ভুত সৌখিনতার প্রতিযোগিতা চলতো। কোনো কবি বা সাহিত্যিককে নিয়ে উৎসাহিত হবার বিশেষ লক্ষণ ছিল না—কিন্তু বায়রণ তো শুধু কবি নন—রূপবান অভিজাত, সেই চব্বিশ বছর বয়েসেই তাঁর ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তা ছাড়া তাঁর সমস্ত কবিতারই নায়ক ভাবা হত কবিকেই। চাইল্ড হ্যারল্ড বই ছাপা হবার আগেই একখণ্ড প্রুফ কপি পৌঁছেছিল ক্যারোলিনের হাতে, দিয়েছিলেন কবি রজার্স, দেবার সময় বলেছিলেন বইটা তিনি খুব পছন্দ করেন নি, বড় বেশি দুর্নীতি মূলক। ক্যারোলিনের সাহিত্যবোধ যে খুব সূক্ষ্ম ছিল বলা যায় না, তবু হৈ চৈ করার নেশায় তিনি বইটা নিয়ে মেতে উঠলেন, সরবে আবৃত্তি করতে লাগলেন বহু লাইন, ছুটে ছুটে বন্ধু বান্ধবদের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন এই দুঃসাহসিক কবির কথা—ফলে বায়রণের জনপ্রিয়তা সুরু হল। জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছিলেন বায়রণ, প্রকাশের প্রথম দিনেই তাঁর কবিতার বই বিক্রী হয়েছে দশ হাজার, চার সপ্তাহে সাতটা সংস্করণ হয়েছিল—পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন কবির কাছে এ কথা স্বপ্নের মতো।

ক্যারোলিন বায়রণের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। তারপর সত্যি সত্যি যেদিন দেখলেন বায়রণকে—সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যেন। মনে মনে শিহরিত হয়ে বললেন, 'ঐ বিষাদময় মুখই আমার নিয়তি।' তার বহুদিন পর বায়রণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, উন্মাদ, নষ্ট, ওর সঙ্গে পরিচিত হওয়াই বিপজ্জনক। বায়রণের মুখে ছিল একটা অদ্ভুত বিবর্ণ বিমর্ষতা—যা মেয়েদের চুম্বনের মতো টানতো। বহু রমণীর সঙ্গেই বায়রণের প্রেম এবং লাম্পট্যের সম্পর্ক ছিল—কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম অগ্রণী ছিল মেয়েরা। মেয়েরাই বায়রণের কাছে খারাপ হতে এবং দুর্নাম কুড়োতে আসতো। ক্যারোলিন ল্যাম্ব সেইসব মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এক সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন লর্ড মেলবোর্ণ। ক্যারোলিন সেই পরিবারের বউ। লর্ড মেলবোর্ণের ছেলে উইলিয়ম লাম্বের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বায়রণের সঙ্গে পরিচয়ের আগে ক্যারোলিনের নামে কোন কুৎসা শোনা যায় নি, সামান্য দু'এক জনের সঙ্গে হৃদ্যতা—সেটা কিছুই নয়, অভিজাত পরিবারের মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁদের সমাজে প্রাণোচ্ছল ফূর্তিবাজ মেয়ে হিসেবেই তার নাম ছিল। ক্যারোলিনের চেহারা ছিল অদ্ভুত রকমের—খুব সুন্দরী বলা যায় না। কিন্তু অন্য আকর্ষণ ছিল। রোগা, লম্বা, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, চোখ দুটো ঝকঝকে—অনেকটা সুকুমার বালকের মতো চেহারা। তার স্বভাব ছিল অসম্ভব জেদী এবং পাগলাটে ধরনের। ছেলেবেলা তার সুখে কাটেনি,

বিশাল নির্জন বাড়িতে চাকর বাকরের হাতে মানুষ হয়েছেন—মায়ের সাহচর্য পাননি বেশি—বিলাসিনী হিসেবে তার মায়েরও কম সুনাম ছিল না।

বায়রণের সঙ্গে আলাপ প্রণয়ের গাঢ়তায় পৌঁছোতে খুবই কম সময় লেগেছিল। মেলবোর্ণদের বাড়িতে পার্টি লেগেই থাকতো—বায়রণ সেখানকার নিত্য অতিথি। প্রায়ই সকালের দিকে বায়রণ যেতেন তাদের বাড়িতে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে—ক্যারোলিনের সন্তানকে আদর করতেন, তার স্বামীর সঙ্গে গল্প করতেন। এই সব রমণীর স্বামী হিসেবে যাদের কথা মনে পড়ে—তারা সাধারণত বোকা, নিরেট, পুরুষত্বহীন ইত্যাদি। কিন্তু ক্যারোলিনের স্বামী উইলিয়ম মোটেই তা ছিলেন না, বেশ বুদ্ধিমান—বায়রণ তাঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতেন। উইলিয়মের রসবোধ কম ছিল না, অনেকটা লঘু চরিত্রের মানুষ—স্ত্রীর এই সব কাণ্ডকে ছেলেমানুষী মনে করতেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অবস্থা চরমে উঠেছিল—কিন্তু উইলিয়ম কোন সময়ই স্ত্রীকে ক্ষমা করতে দ্বিধা করেন নি।

বেশ স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল হঠাৎ একদিন বায়রণ ক্যারোলিনের প্রেম পত্র পেলেন। বায়রণ লণ্ডনে থাকতেন একা বাড়ি ভাড়া নিয়ে—খুব একটা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অভিজাত হিসেবে শুধু তার নামের বোঝাটাই ছিল—অর্থ সম্পদ ছিল না তেমন। অভিজাতদের প্রতি তার একটা অকারণ ক্রোধ ছিল—যদিও ওদের বিলাসপ্রিয়তা পছন্দ করতেন। ক্যারোলিনের কাছ থেকে প্রেমের আহ্বান পেয়ে সাড়া দিতে দেরী করেন নি। ক্যারোলিন চিঠিও লিখতেন খুব সুন্দর। বায়রণ তাকে লিখলেন, 'আমি সব সময় তোমার কথা ভেবেছি—নিপুণিকা, দুর্বোধ্য, সহৃদয়, জটিল, ভয়ংকর, আকর্ষণময় ছোট্ট প্রাণীটি...। ক্রমে ক্রমে জেগে উঠলো শরীরের আগুন, সমস্ত বিশ্ব সংসার ভুলে দুজনে দুজনের শরীর মন নিয়ে ডুবে গেল।

অসম্ভব নির্লজ্জতা ছিল ক্যারোলিনের—বায়রণের প্রতি উন্মাদ ভালোবাসা জানাতে তিনি কখনো স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করতেন না। ক্যারোলিনের শয়ন ঘরে, বায়রণের বাড়িতে যে কোন জায়গায় বাদলা পোকার মত ক্যারোলিন ছুটে যেতেন বায়রণের কাছে। সমস্ত পার্টিতে বায়রণের কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকতেন—এমন কি যে সব পার্টিতে ক্যারোলিনের নেমন্তন্ন থাকতো না—সেখানেও তিনি রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাঁর উপপতির জন্য। বায়রণও অসম্ভব রকমের আবেগময় চিঠি লিখেছেন তাকে। 'আমি সম্পূর্ণভাবে তোমারই, আমি তোমার ইচ্ছার অধীন, তোমাকে মানবো, সম্মান করবো, ভালবাসবো—এবং যেখানে, যখন এবং যে রকমভাবেই হোক তুমি যেতে চাও বা যেতে পারো আমি তোমার সঙ্গে যাবো।...'

ক্রমে চতুর্দিকে ফিস্‌ফাস্ শুরু হয়ে গেল। লোকের চোখে মুখে ইসারায় ইঙ্গিতে, গোপন আলোচনায় এই মুখরোচক কেলেঙ্কারী নিয়ে হাসি ঠাট্টা শুরু হয়ে গেল। সে সময় (হয়তো এখনো) অভিজাত সমাজের মেয়েদের কাছে সতীত্ব বড় কথা নয়, বড় কথা গোপনীয়তা এবং সম্মান বাঁচানো। ক্যারোলিন সেটাও গ্রাহ্য

করেন নি। বায়রণের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক যেন তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কারের মতো—যা তিনি সকলের চোখের সামনে দেখিয়ে বেড়াতেন। কিন্তু অতবড় পরিবারের পক্ষে এরকম কেলেঙ্কারী সহ্য করা সম্ভব নয়।

সবচেয়ে বড় কথা বায়রণের মধ্যে উদাসীনতা এসে গেল। ক্যারোলিন যেন তাঁর দিনের সর্বক্ষণ তাঁর অস্তিত্ব আঁকড়ে ধরে আছে। কোন কবির পক্ষেই প্রণয়ের এই সর্বগ্রাসিতা সহ্য করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সৎবোন অগাস্টা ছাড়া কোন রমণীর সঙ্গেই বায়রণের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ক্যারোলিনের মা এবং শ্বাশুড়ি ক্যারোলিনের কেলেঙ্কারী নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং সমস্যা মেটাবার জন্য তাঁরা বায়রণকেই ধরলেন। অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশ, তখনও ক্যারোলিনের সঙ্গে বায়রণের শারীরিক সম্পর্ক চলছে এবং তার মা ও শ্বাশুড়ি এই নিয়ে আলোচনা করছেন। বিশেষত ক্যারোলিনের শ্বাশুড়ি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, রুচিসম্পন্না মহিলা, বায়রণের সঙ্গে তাঁর সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল, বায়রণ এক সময় খেদ করে বলেছিলেন, হ্যায়, যখন লেডি মেলবোর্ণের কম বয়েস ছিল তখন যদি ওঁর সঙ্গে দেখা হতো।

বায়রণ ক্রমশ ক্যারোলিনের প্রতি কঠোর হয়ে উঠতে লাগলেন। ততদিনে বায়রণ আরেকটি প্রায় প্রৌঢ়া কিন্তু বিষম যৌনলালসাময়ী নাগরী—লেডি অক্সফোর্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ক্যারোলিন তখন বায়রণের জন্য উন্মত্ত—চোখের জল, অনুনয়, নগ্ন শরীর কিছুই আর বায়রণকে ফেরাতে পারে না। লেডি মেলবোর্ণ প্রস্তাব করলেন যে, এখন কিছুদিন যদি ক্যারোলিন তাঁর মায়ের সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে গিয়ে থাকে তবে এই পাগলামি হয়তো কমবে। বায়রণ তখন ক্যারোলিনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ব্যাকুল, সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু ক্যারোলিন কিছুতেই যাবে না।

মেলবোর্ণদের প্রাসাদে একদিন মা তার স্বামী মিলে ক্যারোলিনকে ভৎর্সনা করতে লাগলেন। ক্যারোলিন কিছুতেই কোন কথা শুনতে চায় না, সে আয়ারল্যাণ্ড যাবে না। স্বামী উইলিয়ামের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল—সে গর্জে উঠলো, তবে তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারো।

চলে যাবো? চলে যাবো? ক্যারোলিন রাগে এবং কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে নিচে নেমে এলেন। খবর পেয়ে শ্বাশুড়ি তাড়াতাড়ি ওপরে ছুটে এলেন—তারপর সারা বাড়িতে খোঁজাখুঁজি—ক্যারোলিন নেই।

সেইদিন এক বন্ধু বায়রণের বাড়িতে এসে দেখলেন শোবার ঘরে বিছানায় ক্যারোলিন শুয়ে আছে, ছোকরা চাকরের মতো পোষাক পাশে খোলা, বায়রণ বিব্রত। দুজনে মিলে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বন্ধু কোনক্রমে ক্যারোলিনকে পোষাক পরালেন—তারপর অনুনয়, বিনয়, ক্রোধ—না, ক্যারোলিন যাবে না। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত রাজী হল ক্যারোলিন, কিন্তু যাবার আগে বায়রণের সঙ্গে আর একবার দেখা করতে দিতে হবে।

তাই ঠিক হলো, কিন্তু এখন ক্যারোলিন কোথায় যাবে? এই পোষাকে। ঠিক হল বন্ধুটির বাড়িতে গিয়ে ক্যারো-

লিন পোষাক বদলে নেবে তারপর এক আত্মীয়র বাড়িতে চলে যাবে। কিন্তু বায়রণকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—আর তোমার ঘরে আমরা দুজনে কিছুক্ষণ থাকবো!' —ক্যারোলিন আব্দার করলো।

—অসম্ভব! আমার বাড়িতে তা হবে না।

—কেন হবে না? আর একবার দাও শুধু!

—না, আমার বাড়িতে সে রকম পরিবেশ নেই যে এরকম কান্ড চলতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ক্যারোলিন রাজী হলো—কিন্তু ঘোড়ার গাড়িতে বায়রণ তার সঙ্গে যাবে—আর বন্ধুটি যাবে আলাদা এই সর্তে!

ক্যারোলিনকে কিছুদূর পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবার পরই ক্যারোলিনের মা আর শ্বাশুড়ি এসে হাজির হলেন। এতবড় সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা এ রকম ভাবে কোন ভাড়াটে বাড়িতে আর আসেন নি। 'বায়রণ, তুমি আমাদের সম্মান বাঁচাও।' অনুরোধ করলেন দুই মহিলা।

এ ধরনের ঘোরালো ব্যাপারের মধ্যে জড়াবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না বায়রনের, বিশেষত ক্যারোলিনের প্রতি তাঁর প্রেম অন্তর্হিত হয়েছে। বায়রণ তাঁদের ক্যারোলিন যেখানে আছে সেখানকার ঠিকানা বলে দিলেন।

আয়ারল্যান্ডে গিয়েও ক্যারোলিন শান্ত হলেন না, অনবরত চিঠি লিখতে লাগলেন—সে চিঠিগুলো কান্নায় ভরা, প্রিয় আমায় দয়া করো, দয়া করো! কিন্তু বায়রণ তখন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে গেছেন—তাছাড়া লেডি অক্সফোর্ডের সঙ্গে তখন প্রবল ভোগে মগ্ন। সেই প্রাণপ্রতিমা ক্যারোলিনকে একদা নিষ্ঠুর ভাষায় উত্তর দিলেন :

'লেডি ক্যারোলিন, আমি আর আপনার প্রেমিক নই, আমাকে এই কথা জানাতে বাধ্য করলেন। আরও জেনে রাখুন, আমি এখন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত। আমার উপদেশ যদি শুনতে চান, তবে আপনার হাস্যকর অহংকার কমাবার চেষ্টা করুন।'

ক্যারোলিন অনুরোধ করলেন, একবার, আর একবার কি দেখা করবে না? বায়রণ সমর্থনের অযোগ্য নৃশংসতার সঙ্গে জবাব দিলেন, পারি দেখা করতে, কিন্তু সেখানে তৃতীয় একজন উপস্থিত থাকবে—আর সে আমার বর্তমান প্রেমিকা!

—তোমার একগুচ্ছ চুল আমাকে দাও স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে! ক্যারোলিন কাতর অনুরোধ জানালেন। বায়রণ তাঁর রক্ষিতার একগুচ্ছ চুল পাঠালেন তাকে।

এবার ক্যারোলিনের জেগে উঠলো প্রতিহিংসা। এরপর থেকে ক্যারোলিন ল্যাম্ব হয়ে উঠলেন বায়রণের ঘোর শত্রু। সুযোগ পেলে তোমাকে আমি ধ্বংস করবো, খুন করবো, ক্যারোলিন জানালেন।

আমায় ধ্বংস করবে? বায়রণ জানালেন তোমাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি নিজেই তা করে ফেলেছি। আমাকে শেষ করবে? তাতে তুমি আমারই পরিশ্রম বাঁচিয়ে দেবে।

বায়রণের এই রকম নিষ্ঠুরতার একটা কারণ হয়তো এই যে, তিনি চাননি, ক্যারোলিন তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করুক। তা হলে পুরুষ হিসেবে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে ক্যারোলিনকে। তাঁর মতো

অস্থির কবির পক্ষে এ কাজ অসম্ভব।

ক্যারোলিন প্রাণপনে বায়রণের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াতে লাগলেন। লেডি মেলবোর্ণের চিঠিতে বায়রন জানতে পারলেন যে ক্যারোলিন এক অদ্ভুতকাণ্ড করেছে। তাঁদের বাগান বাড়ির পার্কে এক সন্ধেবেলা ক্যারোলিন কতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে এনে সাদা পোষাক পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন—একটা ছোট মেয়ে ছোকরা চাকরের পোষাকে সাজানো। মাঝখানে একটা বায়রনের ছবি। তারপর সেই ছবিতে আগুন লাগিয়ে দিলেন—সেই আগুনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিলেন তাকে লেখা বায়রণের চিঠির কপি, (প্রাণে ধরে আসল চিঠিগুলো পোড়াতে পারেন নি) একটা সোনার আংটি, এক ছড়া চেন—যা বায়রণ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, এক খণ্ড চাইল্ড হ্যারল্ড। ছোট ছেলেমেয়েরা কিছুই না বুঝতে পেরে ক্যারোলিনের নির্দেশমতো ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো —ছোকরা চাকরের পোষাক পরা মেয়েটি ক্যারোলিনের লেখা একটা দুঃখ এবং ঘৃণার কবিতা আবৃত্তি করলো।

ঘটনা দেখলে মনে হয় ক্যারোলিনের মধ্যে পাগলামির লক্ষণ এসেছে। আসলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ক্যারোলিনের এই প্রচণ্ড ঘৃণা তাঁর তীব্র ভালোবাসারই অভিব্যক্তি। ক্যারোলিন বায়রণের চিঠি জাল করে, অন্যের কাছ থেকে ছবি চুরি করে বায়রণকে ভয় দেখাতে লাগলেন। ক্রমশ বায়রণ বিষাক্ত হয়ে উঠলেন, ক্যারোলিনের নাম শুনলেই জ্বলে উঠতেন। এর মধ্যেও কিন্তু ক্যারোলিন বারবার অনুরোধময় চিঠি লিখতে লাগলেন কবিকে আর একবার দেখা পাবার জন্য। এক সময় তিনি শুনলেন যে ক্যারোলিন আবার লণ্ডনে এসেছেন। এবার তাঁকে লণ্ডন ছাড়তে হবে, বায়রণ ভাবলেন।

দু' একবার অবশ্য বায়রণের সঙ্গে দেখা হয়েছে ক্যারোলিনের—কিন্তু সে দেখা না হলেই বুঝি ভালো হতো। এ কবিকে দেখছেন ক্যারোলিন, মনে পড়লো ১৮১২ সালের সেই স্বপ্নের মতো দিন-গুলোর কথা, সকালে গোলাপগুচ্ছ হাতে নিয়ে কবি আসতেন তার বাড়িতে—যে কোন পার্টিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরুষ যে লর্ড বায়রণ—সে ছিল তাঁরই প্রিয়তম। তুমি যখন যে ভাবে যেখানে যেতে পারো কিংবা যেতে চাও আমি তোমার সঙ্গে যাবো—বায়রণ তাঁকে লিখেছিলেন। আজ চোখে সেই মেয়ের সন্ধান নেই, আজ বায়রণ তাঁকে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বায়রণের সঙ্গে শেষবার দেখা হল লেডি হীথ্‌কোটের নাচ ঘরে। যেমন নাটকীয় তেমনি করুণ সেই শেষ দেখা। হয়তো বায়রণ জানতেন না যে সেই আসরে ক্যারোলিন আসবে।

ক্যারোলিন খুব সুন্দর নাচতে পারতেন কিন্তু বায়রণ তাঁর ভালোবাসার দিনগুলিতে ক্যারোলিনকে নাচতে বারণ করেছিলেন। ক্যারোলিন তারপর আর কখনো নাচেন নি। বায়রণ নাচ পছন্দ করতেন না—ওয়ালট্‌জ নাচের বিরুদ্ধে তিনি একটা বই পর্যন্ত লিখেছিলেন। বায়রণের নিজের একটা পা একটু খোঁড়া ছিল সেইজন্য কোন নাচের আসরে তাঁর নিজের অংশগ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। নাচের উপর তাই অত রাগ।

লেডি হীথকোটের বাড়ির অনুষ্ঠানে গৃহস্বামিনী ক্যারোলিনকেই অনুরোধ করলেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য। আস্তে আস্তে ক্যারোলিন এসে দাঁড়ালেন বায়রণের সামনে, বিষণ্ণ ভাঙাভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আশা করি এখন আর আমার নাচতে কোনো বাধা নেই?'

'—না, নিশ্চয়ই না, লোহামেশানো গলায় বায়রণ বললেন, একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে নাচো, সকলের চেয়ে তুমিই সব সময় ভালো পারতে। আমি বসে বসে দেখে আনন্দ পাবো।

নাচ আরম্ভ করলেন ক্যারোলিন। ক্রমশ নাচের গতি উন্মাদ হয়ে উঠলো—সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে লাগলো তার চোখের সামনে—ঘুরতে লাগলো তার আকাঙ্ক্ষা, যৌবন, প্রেম।

হঠাৎ এক সময় হাঁপাতে হাঁপাতে 'ওঃ বায়রণ!' বলে চিৎকার করে ক্যারোলিন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ক্যারোলিন বায়রণের গা ঘেঁষে এসে একটা ছুরির মত জিনিষ দেখিয়েছিলেন—কেলেঙ্কারী এড়াবার জন্য বায়রণ তাড়াতাড়ি তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এখন ক্যারোলিনের কি হল দেখবার জন্যে লেডি হীথকোট এসে বায়রণের পাশের ঘরে দ্রুত গেলেন। টেবিলের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল ক্যারোলিন—তার হাতে একটা ছুরি। লেডি হীথকোট মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলেন ভয়ে। বায়রণ তখনও নির্মম এবং কঠিন। ক্যারোলিনের ছুরি ধরা হাতের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'মারো প্রিয়তমা, মারো, কিন্তু তুমি যদি রোমানদের মতো ব্যবহার করতে চাও—তবে ভেবে রেখো কোন্‌দিকে তোমার ছুরিটা তুলবে। তোমার নিজের বুকের দিকে ছুরি তোলো, আমার দিকে নয়, কারণ সেখানে তুমি ইতিমধ্যেই অনেক আঘাত করেছ!'

একটা তীক্ষ্ন শব্দ করে ক্যারোলিন ছুরি হাতে ছুটে গেলেন দরজার দিকে—লেডি হীথকোট তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দেখা গেল ক্যারোলিনের সমস্ত পোষাক রক্তে রক্তে লাল।

সেই বাড়ির প্রতিটি নিমন্ত্রিত পুরুষ মহিলা এই কাণ্ড দেখেছিলেন—মুহূর্তে এই নাটকীয় কাণ্ড ছড়িয়ে গেল লণ্ডন শহরে—কাগজে কাগজে এই নিয়ে অসংযত ঠাট্টা বিদ্রূপ বেরুতে লাগল। ক্যারোলিন অবশ্য পরে বলেছিলেন সেদিন ওরকম কিছুই হয়নি—একটা ভাঙা গেলাসে লেগে তার হাত কেটে গিয়েছিল মাত্র।

বায়রণের সঙ্গে ক্যারোলিনের সেই শেষ দেখা। ক্যারোলিনের বুকের হাহাকার অবশ্য তখনও বায়রণকে ঘিরে ছিল। একদিন বায়রণ নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর টেবিলের ওপর একখানা বই খোলা—তার প্রথম পাতায় ক্যারোলিনের হাতের লেখা 'আমাকে মনে রেখো।' টাটকা কালির দাগ তখনো শুকোয়নি—একটু আগেই ক্যারোলিন একা চোরের মত ঢুকে লিখে গেছে। কিন্তু বায়রণের মনে তখন তাঁর জন্য একটু আকর্ষণও নেই। সঙ্গে সঙ্গে বায়রণ সেই লেখার তলায় কয়েক লাইন কবিতা লিখলেন। সেই লেখার অনেকটা এই রকম : তোমাকে মনে রাখবো? তোমার মতো কুৎসিত এবং

বিশ্বাসঘাতিনী মহিলাকে চিরকাল ঘৃণা এবং ধিক্কারে মনে রাখবো!—ক্যারোলিনের পরম সৌভাগ্য যে মৃত্যুর আগে তাঁকে এই কবিতা দেখতে হয়নি।

এরপর ক্যারোলিন তিনখানা বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে একখানা উপন্যাস 'গ্লেনারভন'—তাঁর আত্মজীবনীর মতই। এ উপন্যাস পড়লে ক্যারোলিন, তাঁর স্বামী উইলিয়াম ল্যাম্ব এবং বায়রণকে স্পষ্ট চেনা যায়। বায়রণের লেখা অনেক চিঠি এর মধ্যে হুবহু ব্যবহার করা ছিল। এই বই পড়ে ক্যারোলিন সম্বন্ধে বায়রণ বলেছিলেন, ভগবান ওকে যেন পরবর্তী জগতেও অভিশপ্ত করেন কারণ ও নিজেই নিজেকে এ জগতে অভিশপ্ত করেছে! বায়রণের এমন নির্দয়তা কেউ ক্ষমার চোখে দেখে নি।

ক্রমে ক্রমে বহু পরিবর্তন হয়ে গেল। বায়রণের বিবাহ। সংবোনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক—ইংলণ্ডের জনসাধারণ ক্ষেপে গেল বায়রণের বিরুদ্ধে, রাজদণ্ডের ভয়ে বায়রণ চিরকালের জন্য চলে গেলেন ইংল্যাণ্ড ছেড়ে—বিবাগী ভ্রাম্যমানের মত ঘুরতে ঘুরতে আরও নানা রমনীর শরীরের অমৃত এবং বিষ পান করে উন্মত্তের মতো কবিতা লিখতে লিখতে একসময় গ্রীসের বিপ্লবে যোগদান করতে গিয়ে হঠাৎ মৃত্যু। মৃত্যুর পর বায়রণের মৃতদেহ লণ্ডনে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেটা ১৮২৪ সাল।

বায়রণের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ক্যারোলিন অদ্ভুত শান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবার তিনি সম্ভ্রান্ত—লেডি ক্যারোলিন, লর্ড মেলবোর্ণের বউ। কিন্তু তখনও ক্যারোলিনের জীবন স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতো। যেন সব সময় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। বায়রণের ভালোবাসা ছিল যেমন প্রচণ্ড—ঘৃণাও ছিল তেমনি তীব্র। বায়রণের কবি চরিত্রই ছিল এমন পরস্পর বিরোধিতায় ভরা যে সাধারণভাবে তাঁর ব্যবহারের যুক্তি খুঁজতে যাওয়া ভুল।

একদিন লেডি ক্যারোলিন ঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যাচ্ছেন—সামনে সামনে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন স্বামী উইলিয়াম ল্যাম্ব। এমন সময় উইলিয়াম দেখলেন যে একটা শোভাযাত্রা চলেছে—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে উইলিয়াম একজনকে জিজ্ঞেস করলেন কিসের শোভাযাত্রা। উত্তর শুনতে পেলেন কবি লর্ড বায়রণ মারা গেছেন—তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উইলিয়াম ক্যারোলিনকে তখনই এ খবরটা জানাতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

পরে ক্যারোলিন যখন এ খবর শুনলেন তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এই আঘাতেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং বছর চারেক পরেই বায়রণহীন পৃথিবী থেকে তাঁর শেষ নিশ্বাস টেনে নেন।

তাঁর মৃত্যুর পর খবরের কাগজের শোক সংবাদের মধ্যে এই কথাগুলো ছিল "শেষবার ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাবার আগে লর্ড বায়রণ তাঁকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন।" শুধু এইটুকু মাত্র।

স্রেফ কথা বলার আর্টের উপর জনপ্রিয়
হবার অনন্ত রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে

# নিষ্ঠুর নিঃশব্দ

গোবিন্দ গোস্বামী

আপনার আচার-ব্যবহারের চেয়েও কথা বলার ভঙ্গীর ওপর বারো আনাই নির্ভর করছে আপনি কি ধরনের লোক। স্রেফ কথা বলার আর্টের ওপরই জনপ্রিয় হবার অনন্ত রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে।

আপনি এন্তার গাঁটের পয়সা খরচ করছেন—বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য সব রকম চেষ্টা করেই হাল ছেড়ে দিয়ে কঠিন মন্তব্য করে বসলেন, 'দুনিয়াটাই নিমকহারাম।' আসলে ব্যাপারটা কি তাই? নুন খেয়ে গুণ গাইবার লোক পৃথিবীতে এখনও বিস্তর রয়েছে। চাই কি আপনার নুন না খেয়েও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন এরকম ভদ্রলোকও আপনি হামেশা পেতে পারেন, সে ক্ষেত্রে আপনার একটি মাত্র আর্টই জেনে রাখা দরকার, আর সেটি হল কথা বলা।

একদিনেই আপনি যেমন বিশ্বনিন্দুক কিংবা ঔন্নাসিক উপাধি পেতে পারেন না, তেমনি রাতারাতিই আপনাকে কেউ নির্বিবাদী অথবা বিনয়ের অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে ধরে নেবে না। যা-ই আপনি হন না কেন, আপনার অজান্তে যে কথার ফুলঝুরি আপনি চারিদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছেন, সেই আলোকেই আপনার হৃদয়ের অন্ধকার দিকটা ক্রমশ আলোকিত হচ্ছে। আর সেই আলোকের সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে বল্মীকের স্তূপ পড়ার মতো ধীরে ধীরে আপনার সম্পর্কে সমাজের রায় বেরিয়ে গেল। এত নিষ্ঠুর নিঃশব্দে এই কাজটি শেষ হবে যে, কোনো পক্ষ থেকেই আর সংশোধনের আওয়াজ তোলা সম্ভব হবে না

আপনার সম্পর্কে যদি পেছন থেকে মন্তব্য করতে শোনা যায়, 'ভদ্রলোকের তুলনা হয় না।' তাতে যেমন আপনার আনন্দে আত্মহারা হবার উপক্রম হয়, তেমনি, 'লোকটা অচ্ছা ধড়িবাজ' কানে এলে হয়তো কান্নাই পেয়ে যাবে। অথচ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করুন, ওই দুই তরফের কেউই আপনার প্রত্যক্ষ আচার ব্যবহারের সংগে জড়িত নয়। নিছক কথাবার্তার মধ্য দিয়েই এ ধারণার জন্ম।

একেবারে চুপচাপ থাকলে যেমন দাম্ভিক, অহংকারী আখ্যা পেতে হয়, তেমনি অযথা বকর বকর করলেও কথার বাচস্পতি, বাক্যবাগীশ ব্যাকরণে বিপর্যস্ত হতে হবে। এর কোনোটা নিয়েই আপনি মহিলাদের অন্তরের অন্দরমহলে কখনোই ছাড়পত্র পাবেন না। ওঁদের মনের মণিকোঠার চাবি হাতড়াতে হলে আপনাকে না হ্রস্ব না দীর্ঘ পন্থাই অবলম্বন করতে করতে হবে। যে প্রসঙ্গই হোক তাতে আপনি বেশ ভেবে চিন্তে মিষ্টি করে উত্তর দেবেন, কিন্তু সাবধান, তাতে যেন আপনার নিজস্ব মতামত না থাকে। মতামত দেওয়া মানেই আপনি সেখানে গোষ্ঠী তৈরী করে ফেললেন; আর তার মানেই অন্তঃপুরে আপনি হয়ে গেলেন কুরুক্ষেত্রের কর্ণ। পক্ষান্তরে কোনো গুরুগম্ভীর সভায় ভদ্রলোকেদের মাঝখানে আপনাকে আপনার নিজস্ব বক্তব্যটি রাখতেই হবে। আবার আপনার মন্তব্য যদি যথেষ্ট সারগর্ভ না হয় তাতে খেলো হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। গুণীজনের আসরে আজকাল মৌন থাকাকে আক্ষরিক অর্থেই প্রবাদের মূর্খ বলে ধরে নেওয়া হয়। মেলামেশা বন্ধ করলে আপনি অসামাজিক হবেন। মেপে মেপেও আপনার আচরণ প্রমাণ করতে যাবেন না, 'ভারি প্র্যাকটিকাল ভদ্রলোক' এমনি ধরনের কৌতুকাবহ বিদ্রূপের কণ্টকে বিভূষিত হবেন। কেউ বিশ্বাস করে কানে কানে কিছু বললে তা যেন ফাঁস করতে যাবেন না।

হঠাৎ আপনার সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফট করে বলে বসলেন, 'কি যাচ্ছেতাই লিখছিস আজকাল।' উত্তর এলো, 'তোর মোটা মাথায় কি আছে বলতো?' অথচ কেউই বুঝতে পারলেন না এই কথার মধ্য দিয়েই আপনাদের বন্ধুত্বের জগদ্দল পাথরে একটি অতি সূক্ষ্ম চির খেয়ে গেল। অথচ আপনি কিন্তু একটু ভেবে বললেই আপনার মনের সত্য কথাটা সামান্য ঘুরিয়ে বলতে পারতেন, 'তোর লেখায় ভাই আজকাল তেমন ধার নেই।' তেমনি আপনার বন্ধুর কাছ থেকেও জবাব আসতো, 'কথাটা আমিও অনেক দিন থেকে ভাবছি।' কথার মারপ্যাঁচেই লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারা যায়।

পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে এই যে ঝগড়াঝাটি, তার সূচনাওতো ওই বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে। কথা বলার আর্ট আমরা ঠিকমতো রপ্ত করতে পারি নি বলেই তো নানান রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। কথা কাটাকাটি করতে করতেই হাতাহাতি আরম্ভ করে দিই। একটু ভেবে চিন্তে কথার উত্তর দিলে, যে ঘটনার জের অনেক আগেই জলের মতো সহজ করে দেওয়া যেতো, তাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে সময়ের আগুন নিক্ষেপ করে আপনি তাতে ঘিয়ের মতো উত্তেজক কথার রসদ জুগিয়ে দাবানল তৈরি করলেন। আপনার পায়ে হয়তো অন্য কারোর একটু জুতোর আঁচড় লাগলো, সে ব্যথা ভুলতে না পেরে আপনি মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে বাড়ি ফিরলেন। চললো থানা-পুলিস। মাঝখানে যে লক্ষ কথার কণ্টক বাণ নিক্ষেপিত হয়েছে তা দিয়ে হয়তো আর একটা কল্কি পুরাণ লেখা যেতো।

'এই যে ভালো আছেন তো?' 'আচ্ছা, আবার দেখা হবে!' প্রথম আলাপ আর শেষ বিদায় আপনি অনায়াসেই প্রত্যেককে এভাবে জানাতে পারেন। অথচ

সব সময় এই অতি সাধারণ সৌজন্য বোধটুকুও আমরা অনেককে দেখাই না। যাকে ভালে লাগে তাকে নিয়ে আপনি হয়তো বেশি রকম মাতামাতি করছেন, যেটা সেই ভদ্রলোকের কাছে অসহ্য লাগছে; আবার মনে মনে একজনকে অপছন্দ করে আপনি দেখেও না-দেখার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছেন, অথচ তিনি আপনার কাছ থেকে সামান্য একটু কুশল জিজ্ঞাসা আশা করেছিলেন। এমনি করেই আমরা বন্ধুর কাছে আতঙ্কের হয়ে দাঁড়াই আর দূরে যাকে ঠেলে রাখতে চাই তাকে শত্রুতে পরিণত করি। সবাইকে হয়তো খুশি করা যায় না, কিন্তু অজাতশত্রু হতে বাধা কোথায়? আপনি যাকে পছন্দ করেন না, তার প্রতি দুর্ব্যবহার মুখে প্রকাশ পাওয়া গভীর বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সেখানে আপনি অবশ্যই মুখে মিষ্টি হবেন। জানবেন, হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ছেড়ে দিলে আর ফেরানো যায় না।

মুখকে একটু সামলে চালাতেই 'দুর্মুখ' বদনাম থেকে অনায়াসেই রেহাই পাওয়া। যখন তখন ফস করে বেফাঁস কথা মুখ থেকে না-ই বা ফসকালেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো কখন কি ভাবে কেমন কথা বলবেন তা নির্ভর করছে স্থান কাল পাত্রের ওপর। পার্কে, খেলার মাঠে অথবা চ[redacted] বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যখন আড্ডা দেন, তখন আপনি মুখের বাঁধন আলগা করতে পারেন বৈকি! অপরিচিত পরিবেশে আপনার আকস্মিক উপস্থিতি অনিবার্য হলে আপনি আপনার একান্ত জরুরী কথাটি ছাড়া আর কিছুই বলবেন না। গোপনীয় কথার মধ্যে নাক গলিয়ে মুখ খোলাটাও নিতান্তই আদপ বিরুদ্ধ। আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সব সময়ই স্বাভাবিক কথা বলবেন। বেশি কথা বললে সেখানে আপনার খিটখিটে মেজাজ আর কম কথা বললে রাশভারি গোছের সার্টিফিকেট পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। শিশু আর মেয়েদের কাছ থেকে যতো প্রশ্ন শুনবেন তার বেশি জবাব দিন। সমবয়সীদের সঙ্গে সমতা রাখুন আর বয়স্কদের বেলায় প্রশ্নের অনুপাতে জবাব সংক্ষিপ্ত করুন। কথা বলতে বলতে কখনোই উত্তেজিত হবেন না, গলাবাজি আর গালভরা বক্তৃতা দিয়ে আর যা কিছুই জয় করা যাক না কেন, হৃদয় কখনোই সেখানে সাড়া দেবে না। স্পষ্ট কথায়ও কষ্ট আছে, ঐ শুনুন ঠোঁট কাটা বলছে সবাই।

সব শেষে আর একটা কথা স্মরণ রাখুন। সব পরিস্থিতিতেই কথার ছন্দ যেন এক রকম না হয়। হতাশায় ভেঙে পড়া আপনার বন্ধুকে যেভাবে আপনি সান্ত্বনা দেবেন, সেই ভঙ্গীতেই আপনি কখনোই আপনার বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করবেন না; আবার আপনার বান্ধবীর একটি কথার কথায় হাজার কথা যোগ করার মতো আনন্দের স্মৃতি নিয়ে মবাইল কোর্টের আসামী হয়ে কথার খৈ ফোটাতে যাবেন না জজের দরোজায়! নিঃশব্দে সেখানে আপনাকে কথা সারতে হবে।

নিখুঁত অপরাধ—অর্থাৎ পারফেক্ট ক্রাইম লাখে হয় একটা

# ফুটবল-এ অস্ত্রোপচারের রহস্য

**বীরু চট্টোপাধ্যায়**

অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, খুনখারাবির ইতিহাসে, নিখুঁত অপরাধ অর্থাৎ "পারফেকট্ ক্রাইম" হয় লাখে একটা। সচরাচর অপরাধীরা কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পেছনে রেখে যায়, যার ফলে কোন না কোন সময়ে তাদের ধরা পড়তেই হয়। কিন্তু যে সত্য ঘটনামূলক কাহিনীটি আজ বলতে যাচ্ছি সেটি কিন্তু এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ একে অনায়াসে "পারফেকট্ ক্রাইম" পর্যায়ে ফেলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন কোল্ট-এর জন্ম হয় নিউ ইয়র্কের এক ক্রোড়পতির ঘরে। এর ছোট ভাই সামুয়েল ছিল কিছুটা পাগলা ধরনের যুবক।

দিনরাত্রি কি করে একটি রিভলবিং বুলেট-চেম্বার-সহ পিস্তল তৈরী করা যায় সেই গবেষণাতেই ব্যস্ত থাকতো।

অন্য পরিচয়ে আবার জন কোল্ট ছিল অভিজাত সমাজের একজন অতি জনপ্রিয় যুবক। দীর্ঘদেহ সুন্দর চেহারার জন-সমাজের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল তার শিক্ষায় দীক্ষায়, কায়িক মনোবৃত্তিতে এবং সর্বোপরি সুমধুর বক্তা হিসেবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা ধরনের রচনাও প্রকাশিত হত তার। সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিকরা তার বন্ধু ছিলেন, যেমন এডগার এ্যালেন পো, জেমস্ কুপার, হাওয়ার্ড পেইন, পামার পুটনাম, লুইস ক্লার্ক প্রভৃতি।

দ্রুত ও বিচিত্র ঘটনার সূত্রপাত হল যেদিন কোল্ট ফ্যামিলীতে ক্যারোলীন নামে পরমা সুন্দরী এক যুবতী সেলাই কার্যের জন্য নিযুক্ত হল। জনের দৃষ্টি পড়লো তার উপর—অচিরেই গভীর প্রেম উপজিল মনে। দৃশ্যপট মুহূর্তে বদলে গেল। অভিভাবকদের নজরে যেতে তারা মাথায় হাত দিলেন। একে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায় তো ফ্যামিলী-প্রেস্টিজে একটি প্রচণ্ড ঘা খেতে হবে। সমাজের সবচেয়ে অভি-জাত ঘরের ছেলে—একটা সাধারণ 'কমনার' মীসট্রেস বিয়ে করে কুলে কালি দেবে? তাকে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হল—নারী কিংবা সম্পত্তি অর্থাৎ সীমাহীন অর্থের উত্তরাধিকার ছাড়তে হবে। তার আগেই অবশ্য ক্যারোলীনকে পোঁটলা-পুঁটলী সমেত চাকরী থেকে বরখাস্ত করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সমাজ, সংসার এবং মায়ের ঐকান্তিক বাসনা সব কিছুকে মিথ্যা বলে বাইশ-তেইশ বছরের তরুণপ্রেমিক জন কোল্ট-কিন্তু নারীকেই বরণ করে নিলে—তুচ্ছ হয়ে গেল তার কাছে সম্পত্তির মূল্য ও পারিবারিক মর্যাদা।

ক্যারোলীনকে নিয়ে উঠলো এসে ছোট্ট একটি ভাড়া বাড়িতে, প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়। ক্যারোলীন সেলাই-ফোঁড়াই এর কাজ করে নিরলস ভাবে। অন্যদিকে জন লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত। ক্যারোলীনের সামান্য রোজগারেই গ্রাসাচ্ছাদন চলতে থাকে দুজনের।

দুর্ভাগ্যক্রমে জনের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা আদৌ ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদকরা যদিও জনকে খুবই পছন্দ করতো কিন্তু তার লেখাগুলোর সদ্গতি করতে তারা অসমর্থ। শেষে বিখ্যাত পাব-লিশার পামার পুটনাম একদিন জনকে উপদেশছলেই বললে, এক কাজ কর না কেন জন! তোমার এ্যাকাউন্টেন্সী সম্বন্ধে যখন গভীর জ্ঞান—তুমি এ্যাকাউন্টস নিয়ে একটা টেক্সট্ বই লেখনা কেন—আমি সানন্দে সে বই ছাপবো।

শুনে জন কোল্ট অপরিসীম জ্বলে ওঠে। বলে কি। তার সাহিত্য-প্রতিভাকে বুককিপিং ম্যানুয়াল লিখে গলাটিপে মারতে হবে? কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো—ক্রোধ এলো নিস্তেজ হয়ে। কেন না চোখের সামনে দেখছে অহোরাত্র ক্যারোলীন মাথা গুঁজে পড়ে সেলাই এর পর সেলাই করে স্বাস্থ্য এবং চোখের দফা প্রায় রফা করে আনছে। এ দৃশ্য তো আর সহ্য করা যায় না। যাকে নিয়ে গৃহত্যাগ, তাকেই কি সে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিতে পারে? অসম্ভব! ঐ হিসেব-নিকেশের বই—ই লিখবে। এও কিন্তু স্থির করলো—পাবলিশার পুটনামের কাছে

সে যাবে না। নিজেই প্রকাশ করবে বই, যাতে সমস্ত লাভই নিজের থাকে।

ছোট ভাই স্যামুয়েলকে জানালো এই

কিছুদিনের মধ্যে জন কোল্ড সর্বাধুনিক অডিট প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি মূল্যবান বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে বিরাশী সিক্কার ঘুষি মারে মুদ্রকের মুখে

সংকল্প। কারণ মূলধন তো চাই। স্যামুয়েলও খুশী হল দেখে যে তার কল্পনাপ্রবণ দাদার অবশেষে বস্তুতান্ত্রিক সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। সে টাকা দিতে রাজী হয়ে গেল—এক কথায়। নতুন এক প্রকাশনী গড়ে উঠলো। বই-এর মুদ্রক হিসেবে নিল স্যামুয়েল অ্যাডামসকে। ইনি এক বিখ্যাত ছাপাখানার মালিক।

পাতা লিখে অ্যাডামস্‌এর ছাপাখানা ভরে তুললো বলা যায়।

১৮৪১ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর। মুদ্রক অ্যাডামস কিছু পাওনা টাকার তাগিদায় এসে উপস্থিত হল জন কোল্ডের অফিস ঘরে। বেলা তখন তিনটে থেকে চারটের মধ্যে কোন এক সময়। অ্যাডামস যে টাকার বিল দিলে জন সরাসরি তা অস্বীকার

করে বললে এমন কোন টাকা তার পাওনা নেই।

আপনি হিসেব-নিকেশ সম্বন্ধে এত বড় বই লিখেও কিনা আমার হিসেবটার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন? অ্যাডামসের স্বরে ক্রোধ দেখা দিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তুমুল তর্ক বিতর্ক ও বাগ-বিতণ্ডা চলতে লাগলো। মুদ্রক বলে তার পাওনা ৭১-১৫ ডলার, অপর পক্ষে জন তার থেকে ৫৫-৮০ ডলার বাদ দিতে চায়। কোন সুরাহা হল না। এরপর কথা ছেড়ে বুঝি শুরু হল ঘুষোঘুষি। পরে জন কোল্টের জবানীতে জানা যায়—অ্যাডামস তাকে 'মিথ্যাবাদী' বলায় খুন চড়ে যায় তার, সঙ্গে সঙ্গে সে বিরাশী-সিক্কার এক ঘুষি মারে মুদ্রকের মুখে। সেও ছেড়ে কথা কয় না—উভয়ত ধ্বস্তা-ধ্বস্তি আরম্ভ হয়ে যায়। জন কোল্টকে নাকি অ্যাডামস দেয়ালে চেপে ধরে। পাশেই ছিল টেবিল। তার উপরে ছিল একটি হাতুড়ি। সেটি তুলে নিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত হানে অ্যাডামসের মাথায়। মুদ্রকও নাকি তার নেকটাই এমন চেপে ধরেছিল যে জনের প্রায় মূর্চ্ছিত ভাব দেখা দেয়।

যাইহোক চেতনা ফিরে এলে জন দেখলো অ্যাডামসের দেহটা নিচে পড়ে আছে আর তা থেকে বইছে রক্ত। জনের ভয় হল। হয়ত বা কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে একতলার দোকানে রক্ত পড়তে শুরু করবে। রক্ত থামাবার উদ্দেশ্যে সে বাকি নেকটাই দিয়ে অ্যাডামসের গলা বড় আঁটুনীতে বেঁধে দেয়। তাতেও রক্তক্ষরণ থামছে না দেখে একটা দড়ি দিয়ে পুনরায় কষে বাঁধে অ্যাডামসের গলা।

বলাবাহুল্য অ্যাডামসের আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। যেটা হতে পারতো একটা সাধারণ মারপিটের ব্যাপার সেটা হয়ে দাঁড়ালো এক ভয়াবহ খুনের ঘটনা।

ব্যাপার যখন হয়েই গেছে তখন এর যথাযথ বিহিত করা দরকার। জন কাজে লেগে গেল। বড় একটা কাঠের বাক্স লুকিয়ে নিয়ে এল উপরে। তারপর অ্যাডামসের দেহটাকে প্রায় দোভাঁজ করে ঢোকালো তার মধ্যে। বাজার থেকে প্রচুর লবন ও চুণ কিনে এনে মৃতদেহ সমেত বাক্সটি ভর্তি করলো। ঠিক করলো 'ডাল-মেসিয়া' জাহাজ পরদিন যখন নিউ অরলিয়েন্স অভিমুখে যাবে—তাতে পার্শেল হিসেবে ভুয়া ঠিকানায় বুক করে দেবে বাক্সটি।

এরপরেই কিন্তু সব কিছু ভেস্তে গেল। ঠেলাওয়ালার সাহায্যে যথাসময়েই মৃতদেহ সমেত বাক্সটি "ডালমেসিয়া" জাহাজে বুক করে দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্য, জাহাজটির ছাড়বার তারিখ পেছিয়ে গেল সাত-সাতটি দিন। আর গরমে বাক্সের মধ্যে মৃতদেহটি শুরু করলো পচতে।

অপরদিকে অ্যাডামসের নিরুদ্দেশের খবর পত্রিকা মারফৎ প্রচারিত হতে তদা-নীন্তন নিউইয়র্কের মেয়র—যিনি একা-ধারে পুলিশ চীফও ছিলেন—তদন্ত শুরু করলেন ভীষণ ভাবে। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় ঠেলাওয়ালাকে পাওয়া গেল—যে ঐ দুর্গন্ধবহ কাঠের বাক্সটি জাহাজে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। আর বাক্স খুলে পাওয়া গেল গলিতপ্রায় শব। সনাক্তকরণও দুঃসাধ্য—এমন বিকৃত হয়ে গেছে মুখ চোখ—নুন এবং চুণ তাদের কাজ ভাল-ভাবেই করেছে ইতিমধ্যে। মৃতের হাতের

নখের তলায় ছাপাখানার কালির দাগ দেখে সন্দেহ হল এ নিশ্চয়ই কোন ছাপাখানার লোক।

পরবর্তী ঘটনা সহজ এবং সরল। অ্যাডাম্‌সের সেদিনকার গতিবিধি খোঁজ করতে করতে মেয়র এসে উপস্থিত হলেন জন কোল্টের অফিসঘরে। সেখানে ধোয়া-মোছা ঘরেও মেঝের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের সন্দেহজনক দাগ পাওয়া গেল। অনতি-বিলম্বেই স্বীকারোক্তি দেয় জন কোল্ট।

জনএর বিচার, খুনের মামলার ইতি-হাসে সর্বাধিক প্রচারিত এক কাহিনী। বিচারপতির রায় বেরল—সেই রোমহর্ষক লাইনটি 'ইউ উইল বি হ্যাংগ্‌ড্‌ বাই দি নেক টিল্‌ ইউ ডাই..। অর্থাৎ ফাঁসী কাষ্ঠে মৃত্যু দণ্ড। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবার তারিখ পড়লো ১৮৪২ সনের ১৮ই নভেম্বর। শেষরাত্রি চারটেয় সময়।

যে মুহূর্ত থেকে জন কোল্টের ইহ-লীলা সাঙ্গ হবার বাণী উচ্চারিত হল—সেই মুহূর্ত থেকে তার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে নিল তার ক্রোড়পতি ফ্যামিলী। টম্বস কারাগারে তার জীবনের শেষ কটা দিন অতি আয়াসে কাটাবার ব্যবস্থার জন্য দুহাতে টাকা খরচ করতে থাকলো তার অভিভাবকরা।

মৃত্যুর সেল হল যেন রাজপ্রাসাদের একটি সুসজ্জিত ঘর।

ক্যারোলীনকেও যথারীতি ক্ষমা করা হল। সে প্রত্যহ এসে দেখা দিয়ে যেত জন কোল্টকে। লৌহগরাদ বেষ্টিত সিল্কের পুরু পর্দাঢাকা সেলের মধ্যে তারা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা কয়েক ঘন্টা নিভৃত কুজনে কাটিয়ে যেত। সবাই অবাক হয়ে গেল দেখে যে মৃত্যুর দিন যতই এগিয়ে আসছে জন কোল্টের আনন্দ যেন ততই বেড়ে চলেছে। ওকে দেখে মনে হতে লাগলো যেন ফাঁসীর বদলে ওর মুক্তিই হবে।

মৃত্যুর দুদিন পূর্বে জন কোল্ট শেরিফ মন্‌মথ্‌ হার্টকে ডেকে পাঠালো সেলে, উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, আমি ১৮ তারিখ সকালে ক্যারোলিনকে বিয়ে করতে চাই। বিশেষ কোন ব্যবস্থার দরকার নেই। আমার এই সেলেই চলবে।

শেরিফ শুনে গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফাঁসী-সেলে বিবাহ হতে পারবে না এমন কোন আইন নেই। শেরিফ সানন্দেই অনুমতি দিলেন এ প্রস্তাবে।

বেলা ১১—৩০ মিঃ সময় চারদিকে ঢাকা একটি ঘোড়াগাড়িতে ক্যারোলীন এসে পৌঁছলো—আবহাওয়ার দুর্যোগের জন্যেই গাড়িটি ঢাকা ছিল। তারপর কারাগারের খিড়কী দরজা দিয়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেল।

এই অদ্ভুত বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন স্যামুয়েল কোল্ট, লেখক হাওয়ার্ড পেইন, জর্জ মেরিট এবং শেরিফ হার্ট।

কারাগারের বাইরে বিপুল জনতার সমাবেশ। সকলের কণ্ঠেই হাহাকার ধ্বনি। প্রহরীরা ভীড় সামলাতে হিমসিম। 'বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে' খবরটি বলা মাত্র আবার সমবেত জনতা হাহাকার করে উঠলো সমস্বরে। যে দরজা থেকে বুলেটিন বের হচ্ছিল সেদিকে জনতার ভীড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে চলে যায়। কিছুক্ষণ অন্তরই বিভিন্ন সংবাদ আসতে লাগলো বুলেটিং মারফৎ 'অতিথিরা বিদায় নিয়েছেন'···'সেলের দরজা সিল্কের পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে'····'বর-কনে 'স্যাম্পেনের অর্ডার দিয়েছে'। ভেতর

থেকে হঠাৎ একটা বিচিত্র শব্দ ভেসে আসে। কী ওটা? ফাঁসীমঞ্চকে পরীক্ষা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বেলা একটার সময় শেরিফ হার্ট ফাঁসী সেলে গিয়ে ক্যারোলীনকে জানালেন যে তাদের বিবাহ এবং মধুচন্দ্রিকা যাপনের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে। সুতরাং, প্লিজ! তারপর তিনি ক্যারোলীনকে সেল থেকে বের করে খিড়কীর দরজা দিয়ে খালি একটি রাস্তায় নিয়ে এলেন। তুলে দিলেন গাড়িতে।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে। তিনি রেভারেণ্ড এ্যাণ্টনকে, যিনি ওদের বিবাহ দিয়েছেন, আসামীর শেষ পার্থিব প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে বললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কারাগারের বাঁ পাশে একটি কাঠের ঘর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। কি করে এবং কেমন ভাবে যে প্রস্তরময় কারাগারের উপরে পাগোডা সদৃশ্য কাঠের ঘরটিতে আগুন লাগলো—সে রহস্যের সমাধান আজও হয় নি।

তিনটে তিরিশ মিনিট। দেখতে দেখতে প্রচুর ধোঁয়া এসে কারাগারের প্রতিটি ঘর আচ্ছন্ন করে ফেলে। কয়েদীরা আতঙ্কে ছুটোছুটি করে, চিৎকার করে। হাতের কাছে যে যা পায় বালতি ঘটি মগ তাই দিয়ে লোহার গরাদের দরজায় একসঙ্গে আঘাত করে। কোরাসে এমন চিৎকার জুড়ে দেয় যে প্রহরীরা অনেকে পালায় ওই কারাগার থেকে। বাদবাকিদের অনেকে এদিক ওদিক ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করতে লাগল। দুজন প্রহরী এর মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ায় তাদের ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

এই রকম নারকীয় গোলমালের মধ্যে বেলা তিনটে পঁয়ত্রিশ মিনিটে টলতে টলতে রেভারেণ্ড এ্যাণ্টন এসে শেরিফকে চরম দুঃসংবাদটি দিলেন, মিণ্টার কোল্ট মারা গেছেন। তার অসাড় বুকের মধ্যে বিরাট একটি ছোরা বিঁধে আছে। নিজের চোখে দেখে এসেছেন তিনি।

সেলের দিকে না গিয়ে শেরিফ ছুটলেন ডাক্তারের উদ্দেশে যে এসে পরীক্ষা করে বুঝতে পারবে কোল্ট আদৌ মরেছে কিনা।

বেলা সাতটার সময় দ্রুত করোনার কোর্ট বসলো। জুরীরা রায় দিলেন, কোল্ট ফাঁসীমঞ্চ আর আইনকে ফাঁকি দিয়ে সুইসাইড্ করেছে। খালাস করা হল মৃতদেহ। সৎকার হল অবশ্য গোপনেই। দেশের সংবাদপত্র অবশ্য এ ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

ছোরাটা কোথা থেকে এলো একটি সংবাদ পত্রের সক্রোধ জিজ্ঞাসা এ ইঙ্গিতও দিলে যে বিবাহবাসরে উপস্থিত অতিথিবর্গকে কি সন্দেহ করা অন্যায় হবে? অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

দেশের সংবাদ পত্রে কিন্তু এ ঘটনায় অন্য এক প্রভাবশালী দৈনিক ঘোষণা করলে, যত দিন না এই নাটকীয় আত্মহত্যার প্রকৃত সমাধান, মেয়র, গভর্নর এবং দেশের প্রেসিডেণ্ট করছেন ততদিন জনসাধারণের মনে কোন ক্রমেই শান্তি ফিরে আসবে না।

কিন্তু কেউই একথা তুললো না যে ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহটি কি প্রকৃতই জন কোল্টের ছিল না অন্য কোন লোকের?

এটাই হচ্ছে নিখুঁত অপরাধ অর্থাৎ 'পারফেক্ট ক্রাইমে'র একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

চীফ অফ পুলিস মিঃ ওয়েলি বলেন,

যাঁরা ওয়াকিবহাল এরকম লোকের মুখেই আমি শুনেছি যে, জন কোল্ট 'সুইসাইড' আদপেই করেনি। যে লাশ পাওয়া গেছে সেটি একটি সাজানো লাশ। গোলমালের সুযোগ নিয়ে জন কোল্ট পালায়।

এক পক্ষ বলেছে যে প্রচুর পরিমাণ বকশিসের গুণে সেলের চাবি ইত্যাদি সংগ্রহ করা বা প্রহরীদের হাত করা আদৌ কঠিন ছিল না কোল্টের পক্ষে। যারা অচেতন প্রহরীদ্বয়কে বাইরে নিয়ে গেছে—তারাই অনায়াসে সাজানো মৃতদেহ একটা সেলের মধ্যে এনে রেখে যেতে পারে।

এখানেই শেষ হল না কাহিনী। এর একটি অদ্ভুত উপসংহারও দেখা দিল—কয়েক বছর পর।

১৮৫০ সালে। বিখ্যাত রহস্যকাহিনী লেখক ও অ্যালামীর বন্ধু এডগার এ্যালেন পো দস্তখৎবিহীন কিছু পাণ্ডুলিপি পেলেন, যেটা টেক্সাসের কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে তাঁর নামে পাঠানো হয়েছে। আশ্চর্য, পাণ্ডুলিপিগুলি হুবহু জন কোল্টের নিজের হাতের লেখা। পো একথাটি 'দি নিকার বোকার' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ক্লার্ককে বললেন। উত্তরে সম্পাদক জানালেন, তিনিও জনের নিজের হাতের লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি ইতিমধ্যে পেয়েছেন। তাঁরা উভয়েই বুঝলেন এবং একমত হলেন যে এইভাবেই জন কোল্ট তাদের জানাতে চাইছে যে সে আজও জীবিত আছে এবং আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনের চেষ্টায় রয়েছে।

এর দুবছর পর ১৮৫২ সালে কোল্টের জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ এভারেট একদা ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা ক্লারা উপত্যকা দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখোমুখি হলেন অবিকল জন কোল্টের মত একজনের সঙ্গে।

আরে জন না? আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন মিঃ এভারেট।

মুহূর্তের জন্যে চুপ থেকে সেই লোকটি বললো মৃদু হেসে, আমার নাম ডন কার্লোস্ জুয়ান ক্রুটর। আসুন আমার বাড়িতে।

এভারেটের কথায় জানা যায়, তিনি নাকি ওদের বাড়ি গিয়ে ক্যারোলীনকেও দেখেছেন। ক্যারোলীন নাকি তখন আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

কোল্ট-কেস্-এর রোমন্থ-অনুরাগী ভক্তরা এভারেটের কাহিনীকে আমল দেয় না। তাদের মতে ওটা মোটেই সত্য নয়। তারা বিশ্বাস করে, জন কোল্ট প্রকৃতই আত্মহত্যা করেছে এবং ছোরাটি ক্যারোলীনই পোষাকের তলায় করে নিয়ে এসেছিল কারাগারে।

এ সম্বন্ধে নিউইয়র্কের পুলিস-কমিশনারের মন্তব্যটিই চমৎকার। তিনি বলেছেন, এর দ্বারাই তো বোঝা যায় যে এ ঘটনাটি একটি 'পারফেক্ট-ক্রাইম'। কোন লোকই সুনিশ্চিত নয় যে এ ক্ষেত্রে কোন রকম অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা।

[মানসী

চিত্রকলায় বস্তুকেন্দ্রিক সৃষ্টি আজ প্রায় মৃত বললেই হয়

# ছবির মৃত্যু

বিশ্বনাথ রায়

আর্টকে হত্যা করার অধিকার আমাদের নেই। আর্টকে জীবনের আয়নায় প্রতিফলিত করে সঞ্জীবিত করাই হচ্ছে প্রকৃত আর্টিস্টের লক্ষণ। প্রতিফলন দরকার কেননা পরিচ্ছন্নতা দরকার। পরিশোধিত ও বিশুদ্ধ সৃষ্টিই সভ্যতার ধ্বজাধারী। যেমন তামাকের ধোঁয়া হুঁকোর জলে জঞ্জালকে ফেলে রেখে বিশুদ্ধ ধোঁয়া পরিবেশন করে। জীবনের উদ্দেশ্য—এই প্রাণ চঞ্চল আর্টকে সম্যক উপলব্ধির পর্যায়ে নামিয়ে আনা। আমাদের বুদ্ধি ও বৃত্তির কাঠামোকে এই আর্টে সাজিয়ে তোলাই নিত্যকার উদ্দেশ্য।

সৃষ্টি দু'রকমের—(১) ব্যক্তিগত (২) বস্তুগত। ইংরাজীতে বলা যেতে পারে : (১) সাবজেকটিভ্ (২) অবজেকটিভ্। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ থাকাই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র জিনিস। সুতরাং এই সৃষ্টি বিভিন্ন এবং বহুরূপী হতে বাধ্য যদি সেই সৃষ্টি ব্যক্তিগত হয়। কিন্তু যারাই ছবি আঁকে তারাই আর্টিস্ট নয় কিম্বা আর্ট বোঝে তাও নয়। তাদেরকে বরঞ্চ একটা টুল অথবা অস্ত্র বলা যেতে পারে। কিন্তু যদি এই টুল অথবা অস্ত্র তার শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে তাহলে সে প্রকৃতই আর্টিস্ট। কিন্তু এই আর্টিস্ট সৃষ্টি করেই বোধহয় আনন্দ পায় না, তার এপ্রিসিয়েশান কিম্বা মূল্যায়ন না পাওয়া পর্যন্ত সে মৃতের সামিল। ব্যক্তিগত সৃষ্টিতে ভেরিয়েশান্ এর পরিমাণ বহুধাবিভক্ত অথবা মাল্‌টি-ডাইমেনশানাল। পটের ওপর কতকগুলো বিচিত্র টেরা বেঁকা লাইন টেনে অনেক অর্থ করা যায়। বিজ্ঞানীর চোখে সেটা লেখ (গ্রাফ্) হতে পারে. বায়ুরোগাক্রান্তের কাছে চলার পথের প্রতিবন্ধক হতে পারে। আর্টের বিচারকের কাছে গোলমেলে ঠেকতে পারে। তার বিচারকৃত

রায় সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে একটা হত-ভম্বচিত্তে তাকে অড্ স্যাম্পল্ বলে ধরতে পারে। কিম্বা বিকৃতভাবে, চটকদার রংএর সাহায্যে সোজা লাইনে আঁকা নারীদেহ জৈবিক আকর্ষণ না আনতে পারলেও—ব্যক্তিগত বিকৃতরুচির প্রকাশ তো বটেই।

ব্যক্তিগত রুচির বিকৃত প্রকাশ আজকের দিনের সৃষ্ট আর্টের এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে নতুন যৌবনে হতবাক বালক তার অপরিপক্ক, যুক্তিহীন, বর্ণহীন উপলব্ধিকে বেঁকাটেরা অক্ষরে কোনও রকমে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে রাতারাতি লেখক হবার চেষ্টা করার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করছে না। এটা বর্তমান, অশান্ত জীবন এবং জীবনে আস্থাহীনতার লক্ষণকে পুরোপুরি বহন করছে। মানুষ যেমন এককালে সমাজকে সৃষ্টি করেছিল, তেমনই আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ মানুষকে সৃষ্টি করেছে। সমাজের এই পাল্টা আক্রমণ-যন্ত্রের আধিপত্য মানুষের সুস্থানুভূতির ওপর। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যক্তিগত শক্তির চরমতম প্রকাশ—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজ পুনর্গঠন—প্রায় সবদিকেই দেখা যায় প্রতিভাবানদের স্ফুরণ। বিংশ শতাব্দী যুদ্ধের শতাব্দী কিম্বা যুদ্ধাতঙ্কের। আদর্শের আবিষ্কার এক শতাব্দীতে আর সেই আদর্শের প্রকৃত রূপায়ন আর এক শতাব্দীতে। প্রকৃত রূপায়নের বেলায় দ্বন্দ্ব আর সংঘাত নেমে আসল সংহারের মূর্তিতে। যুদ্ধ শুধুমাত্র অস্ত্রের ব্যবহার নয়, উচ্চাদর্শের ব্যবহারের সংঘাতই যুদ্ধ। আদর্শকে স্থায়ী করতে গিয়ে, যুক্তির আদর্শকে অবলম্বন। যার পরিণাম স্পিনোজার 'সাবস্টেন্স', কিম্বা কাণ্টের 'এ প্রায়রি' অথবা রাসেলের 'গোল্ডেন মিন্'। মার্ক্স কিম্বা ডিউই ধরলেন, বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সূত্র যাকে যান্ত্রিকদর্শন কিম্বা উৎপাদন-দর্শন বলা যায়। এককথায় পর্বত হতে চায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। আকাশের দূরত্বকে মাপা যাবে রকেটে—সেটা সভ্যতার পরিচায়ক নয়। একে যন্ত্রবিজ্ঞানের উৎকর্ষতা বলাই শ্রেয়। আবিষ্কারের ধারা চিরদিনের জন্য অব্যাহত থাকবে। কিন্তু সভ্যতার আর্ট আলাদা। এটা সমাজ মনোবিজ্ঞানের কথায় ব্যবহার-উত্তেজকের সম্যক উপলব্ধির কার্যকারণ (বি-এফ্ এস্, ও) অর্থাৎ বাহ্যিক ব্যবহারের অপরদিক, বলে ধরা হয়।

আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রকেই ধরা যাক। যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখার শুরু হয়েছিল গেটে কিম্বা ডস্টয়ভস্কির ভয়ংকরী কলম থেকে তার আধুনিকতম পরিণতি জয়েসের ইউলিসিস। মধ্যের সময়ে আমরা পেয়েছি এমিএলস্ জারনাল। এমিএলস্ জারনাল যদিও ডায়েরী সাহিত্য তবুও অন্তর্মুখী লেখকের সুস্থানুভূতিগুলি দীর্ঘভাবে পরিবেশিত। গেটের সাফারিংস অফ্ এ ইয়ং ওয়েরদার প্রায় ঐ একই ধরনের তবুও গেটের বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। কাফ্কার লেখার ধারার ইঙ্গিত হেনরী মিলারের লেখায়। তারপর স্রোতে মিশল টমাস্ মান, পল ভালেরি, প্রাউস্ট কিম্বা কার্ল ক্রউস্—এদের রচনার মাধ্যম এই ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্য যেখানে উত্তমপুরুষই (আমি) প্রধান চরিত্র কিম্বা পর্যবেক্ষণকারী অথবা বক্তা সেখানে ব্যক্তিগত ভাবভালবাসার প্রকারটাই বেশী ফুটে উঠেছে। এই ধরনের লেখা উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি বরাবর সৃষ্টি করে যেতে

পারে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে যায়। কেননা এখানে পাঠকের আইডেন্টি-ফিকেশান হবার ভাগ খুবই কম। সাহিত্য সৃষ্টি মানে যদি রেকর্ডিং অফ্ রানডম ফিলিং হয় তাহলে সে সাহিত্য ক্ষণিকের চটকদার সাহিত্য হতে পারে কিন্তু আপেক্ষিক মূল্য তার কমে যেতে বাধ্য। মানবমনের অন্যতম দিকই হচ্ছে এই যে সে তখনই অপরের কথা শুনতে পারে। যতক্ষণ সেটা তার নিজের মত করে লাগবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের অবদান অবশ্যই মূল্যবান কিন্তু তার আপেক্ষিক মূল্য কোথায়?

ঠিক তেমনই হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিত্রকলা সৃষ্টি। আগেকার দিনে পোর্ট্রেট চিত্র বেশি আঁকা হত যার গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর—মোনালিসা কিম্বা ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন্। কিন্তু ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ছবি আঁকার শুরু গগ্যার কাল থেকে। যারপর ম্যাটিসি কিম্বা পিকাসো এবং রুসো (স্লিপিং জিপ্সি) দেখাতে চাইলেন যে ব্যক্তির ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই আর্ট। যদিও কয়েকটি ছবি যেমন—(১) ক্লি—কন্‌কোয়েস্ট অফ্ দি মাউনটেন, ট্রাই-টারিং মেসিং. (২) ঘনড্রিয়াঁ—ব্রডওয়ে বুগি-উগি। (৩) মডিগ্‌ল্যানি—গার্লউইথ্ ব্রেই-ডর্স (৪) স্যালভাডোর দালি-ল্যান্ডস্কেপ দি পারসিসটেন্স অফ্ মেমারি, এমন ভাব ফুটিয়ে তুলেছে যেটা সৃষ্টি হিসাবে সত্যই বিস্ময়কর। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদক্ষেপ এবং নানাপ্রকার রং, তুলি ইত্যাদির পারিপার্শ্বিক সাহায্য আজকের ছবি আঁকাকে অনেকটা তরল করে তুলেছে। তার ওপর সবচেয়ে বড় জিনিস ক্যামেরায় রঙিন ছবি তোলার ব্যাপারে। যদি হুবহু ভাবে প্রকৃতিকে ধরা গেল তাহলে ন্যাচারাল আর্ট-এর মূল্য থাকল কোথায়? তার ওপর পিকাসো, ম্যাটিসি, দালি, ক্লি এবং পরিশেষে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজে!

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তাই। শক্তির রূপান্তর-ই আজকের জগতের বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য, যেমন জলঃশক্তি কিম্বা আণবিক শক্তি। মানবমনের বেলাতেও তাই। যন্ত্রের ক্ষেত্রেও মানুষের ব্যবহারিক চিত্রকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন রবট্ আর নামকরণ করা হচ্ছে হিউম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সাইবারনেটিকস্।

এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর্ট সৃষ্টি অনেকটা যৌন অথবা জৈবিক। ফ্রয়েডের মতে এর উৎপত্তি মানুষের অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং তার বিকৃত বহিঃপ্রকাশ থেকে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সৃষ্টিকে শুধু মাত্র একটা সৃষ্টিই বলা যায় কিন্তু ভাব সমৃদ্ধ সৃষ্টি অথবা মূল আর্জ বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অপরদিকে যদি বস্তুকেন্দ্রিক সৃষ্টির দিকগুলো ধরা যায় তাহলে রূপান্তর নিশ্চয় দেখা যাবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তলস্তয়, শেকসপীয়র কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্র যদি এর উদ্গাতা হন তাহলে আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি পাস্তারন্যাক্, বার্নার্ডশ কিম্বা রবীন্দ্রনাথ তার চরমতম অভিব্যক্তি। বস্তুকেন্দ্রিক সৃষ্টি অনেকটা সমাজোপযোগী। যদিও বস্তুকেন্দ্রিক সাহিত্যে মাঝে মাঝে অশ্লীলতার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় তবুও উত্তমপুরুষ সেখানে দ্রষ্টামাত্র। বস্তুকেন্দ্রিক লেখাকে ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে। যেমন ব্রিজ ওভার রিভার

ড্রিগা। আমি ঘটনাকে বলছি না, বরং ঘটনা আমাকে বলছে আমি ঘটনার প্রবাহ স্রোতের মধ্যে একটি ঢেউ। স্থায়িত্ব এবং গঠন সাময়িক। কিন্তু অস্তিত্ব প্রধান এবং প্রবাহ স্রোতে অংশ গ্রহণকারী ঘটনার স্রোত আমার অস্তিত্বকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রবাহকে কেন্দ্র করে আমি রইলাম না কিন্তু আমার অস্তিত্বের স্বীকৃতি রয়ে গেল। বস্তুকেন্দ্রিক আর্ট সৃষ্টির মূল কথাই বোধ হয় তাই। পুরাতনের পটভূমিকায় নতুনের সমাদর। বস্তুকেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টিও বোধহয় তাই। ব্যক্তিগত ভাবধারণার প্রকাশ সীমাবদ্ধ। সেখানে ভাবধারণার মূল্যায়ন সিনথেসিসের আয়োজন এবং প্রয়োজনে। সাহিত্য সৃষ্টি এখানে রেকর্ডিং অফ্ সিনথেসাইজড্ ফিলিং অথবা পরিশ্রুত কিম্বা পরিশোধিত আর্ট।

চিত্রকলায় বস্তুকেন্দ্রিক সৃষ্টি আজ প্রায় মৃত বললেই হয়। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে যদিও বলা হয় ক্যামেরার লেন্সটাই সত্যিকারের আর্টিস্ট, তবুও ক্যানভাসের ওপর রং ভরা রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে নতুন ধরনের ন্যাচারাল আর্ট সৃষ্টি করা হচ্ছে। অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই মনোবিজ্ঞানীরা রসাক্-এর ইঙ্কব্লট্ টেস্ট ব্যবহার করে আসছেন। একটা কাগজকে মাঝবরাবর ভাঁজ করে সেই ভাঁজের ভেতরদিকে যদি কয়েক ফোঁটা কালি দিয়ে, পুনরায় ভাঁজ করে চাপ দেওয়া যায় তাথেকে একটি বাইল্যাটারাল ছবি পাওয়া যায়। এই ধরনের ছবিকে কি বলা যেতে পারে? ন্যাচারাল অথবা মডার্ণ? বস্তুকেন্দ্রিক বলা সৃষ্টি আর কিছুদিন পরে ওল্ডফাসিল হয়ে যাবে। আজকের আর্ট অর্থাৎ মডার্ণ আর্ট হুবহু চিত্রায়নের দিক ছেড়ে স্পষ্ট রেখা এবং উজ্জ্বল রং এর পারিপাটীতেই সীমায়িত হয়ে যাচ্ছে। সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতি হারিয়ে ভিন্ন প্রকৃতির পন্থাবলম্বন করা হয়েছে। সংগীতের ভাব হারিয়ে যাচ্ছে যন্ত্রের চিৎকারে। প্রাকৃতিক পটভূমিকার প্রয়োজন হারিয়ে যাচ্ছে বেটোভেন, মোজার্ট, মীরা কিম্বা তানসেন লঘু সংগীতের আড়ালে। ক্লাসিক রচনাকে না বুঝে সমাদর করা কিম্বা বাহবা দেওয়া বর্তমানে একটি প্রচলিত ধারা হয়েছে কিন্তু বুঝি এবং শুনি লঘু বিষয় সীমায়িত কিম্বা সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে।

আর্টের অপমৃত্যু সেইখানেই যেখানে আর্টের সমাদর আছে, কিন্তু বিকৃত কিম্বা রুচিহীনতার প্রাবল্যতা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত। যদি লাইফ্ ইজ্ এমন আর্ট হয় তাহলে সেই জীবনের উপলব্ধি (কগ্নিশান্), ক্রিয়া (এ্যাফেকশান) এবং প্রকাশকে (কোনেশান্) এলিমেণ্টস্ অফ আর্ট বলা উচিৎ। এই এলিমেণ্টগুলোর সংমিশ্রনে যে কমপাউণ্ড, সেই-ই জীবনের আর্ট। লাইফ ইজ এন আর্ট আবার আর্ট ইজ এ লাইফ। জীবনের চলার ছন্দ আর্টের অনুভূতির প্রকাশ, দুঃস্থ কিম্বা সুস্থজীবন, উভয়ই বহন করে আসছে আর্টের দুটি চরম দিক। দুঃস্থ কিম্বা সুস্থ থেকে দুঃস্থ, উভয়ই ঘটনার প্রবাহ স্রোতের উত্থান কিম্বা পতন। চেতনা অবচেতন কোথাও অচেতন। আর্টের প্রবাহ অচেতনা থেকে চেতনার প্রবাহ।

জীবনের বহিঃপ্রকাশ কতকটা অভিনয় গত ব্যবহারে। আমাদের কোথাও কোথাও অভিনয় করতে হয়। কখনও

জীবনকে টিকিয়ে রাখার খাতিরে কোথাও শুধুমাত্র অবসর সময় বিনোদনের জন্য— আনন্দ বর্ধনের জন্য, সেখানে কথা আসে স্বভাবতই। বাংলাদেশের অভিনয় জগতে কিছুদিন আগেও যে মহামারী, দুর্ভিক্ষ ছিল তার অবসান ঘটেছে আজ সখের কিম্বা আয়ের অভিনয়, এর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সামগ্রীক গণচেতনার অভাবই মূল কারন। আর্ট সচেতনতা (যে কথা আগেই বলা হয়েছে) তখনই আসবে যখন ক্রান্তি, জীবনের সংগে সৃষ্টির মিল খুজে পাবে সৃষ্টির মাধ্যমে। তবে অনেক সময় আমাদের অন্ধদৃষ্টি ঐ উপলব্ধি থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুতরাং দায়িত্ব সেই তাদের হাতেই যারা আর্ট সৃষ্টি করে চলেছেন এবং সেই সৃষ্টির দ্বারা এই অন্ধকার উদ্যানে আলোক সম্পাত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা যদি এমন আর্টের সৃষ্টি না করতে পারেন যার সংগে এ্যাকসানস অফ লাইফ অর্থাৎ এলিমেন্টস অফ আর্ট এর যোগাযোগ নেই, তাহলে আর্ট সচেতন মানব সমাজ গঠন করা যাবে না। তখন আর্ট মানে স্কুল আনন্দের পরিথাই হবে। সেই আর্ট পর মুহূর্তে কালের চক্রে ভেসে যাবে, স্থান কিম্বা কালের দ্বারা তার প্রকৃত মূল্যায়ন অথবা তার আপেক্ষিক মূল্য বহুলাংশে কমে যাবে। এখানে পরিবর্তনশীল রুচির প্রশ্নও আসে। কিন্তু যে রুচি পরিবর্তনশীল ক্ষণিকের বুদবুদের মত যার আয়ু তার আর্টগত মূল্য কতটুকু? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন রুচির মাধ্যম নিজস্ব প্রচারের এক মাধ্যম বিশেষ। অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও আর এক উদ্দেশ্য তথাৎ একজিবিশানইজম্। একে ক্যাড এবং ক্রেজ বলা হয়। আমাদের জৈবিক সত্তার প্রকাশ কিছুটা এই ক্যাড কিম্বা কিম্বা ক্রেজের মাধ্যমে। বর্তমান দিনে প্রায় সবকিছুর এই ক্যাড্ এবং ক্রেজের স্রোতেই ভাসছে। যার ফলে আর্ট, অত্যাধিক পরিবর্তনশীল হয়ে উঠেছে ক্যাড, এবং ক্রেজের স্রষ্টা ফ্যানটাসির প্রাবল্যে। ফ্যানটাসির রূপায়ন আর্ট নয় কেননা ফ্যানটাসি অযৌক্তিক, জীবনের সংগে প্রত্যক্ষ ভাবে, এ্যাকসানস অফ লাইফের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। যে আর্ট ফ্যানটাসির আশ্রিত সে আর্ট অপমৃত্যুর বিষয়। এ্যাকসানস অফ লাইফ-কে এলিমেন্টস অফ আর্ট করে তুলতে হবে এবং তার সামগ্রীক রূপায়ন দ্বারা আর্টকে এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে হবে। তখনই আর্টের মুক্তি কিম্বা উজ্জীবন।

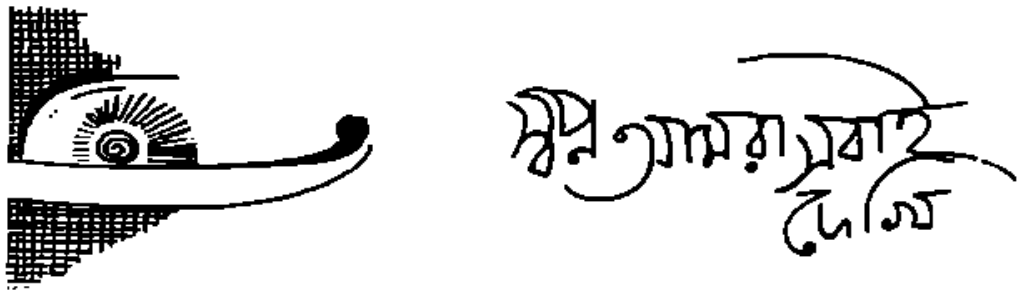

শান্তি ঠাকুর

বলুন তো স্বপ্ন আমরা দেখি না শুধু অনুভবই করি? প্রশ্নটা কিন্তু সত্যই ভেবে দেখবার মত।

দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহ অনুভূতির দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কের পটে ফিল্মের মতই ছবি হয়ে যায়। কোন উত্তেজনাবশে নিদ্রা যখন অর্ধচেতন অবস্থায় আসে তখনই সেই ফিল্ম আবার চলতে আরম্ভ করে। একেই বলি আমরা স্বপ্ন। জাগ্রত অবস্থায় যে সব ঘটনা মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে থাকে—স্বপ্নে তারাই আমাদের গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়ে মারে। প্রেমিক দেখে প্রেমিকাকে—ব্যবসাদার দেখে লাভ-লোকসান—ছাত্র দেখে পাশ ফেল—আরও কত সব অনাসৃষ্টি।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের যে সব অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পূর্ণ হয় না, তারই তৃপ্তি সাধনের জন্য আমরা স্বপ্ন দেখি। ফ্রয়েড আরও বলেছেন—আমরা স্বপ্নে যা দেখি, কল্পনাপ্রসূত ইচ্ছা ছাড়া সেগুলি আর কিছুই নয়। তাইতো আমরা গাছে গোলাপ ফুটতে দেখি। জীবনের সংঘর্ষ দেখা দেয় বাঘের সঙ্গে লড়াইরূপে। স্বপ্ন কল্পনাগুলিকে সময় সময় এমন উদ্ভট করে তোলে যার কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ সকলের মূলে রয়েছে সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

স্বপ্ন সম্বন্ধে লোকপরম্পরায় এবং ব্যক্তিগত অনুভব থেকে কতগুলি সাধারণ ধারণারও সৃষ্টি হয়েছে।

১। কিছু লোক একেবারেই স্বপ্ন দেখে না
২। স্বপ্ন মানসিক শারীরিক অথবা ভাবনাগত অব্যবস্থার দ্যোতক
৩। স্বপ্নে সমস্ত জিনিস এক-মুহূর্তের মধ্যেই আমরা দেখে ফেলি
৪। পার্শ্বপরিবর্তন স্বপ্ন দেখার সূচক
৫। স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা বেশী স্বপ্ন দেখে

চিন্তাশীল এবং ভাবুক প্রকৃতির ব্যক্তিরা অধিকতর স্বপ্ন দেখে।

বর্তমান বিজ্ঞান কিন্তু এমন কতগুলি বিষয়ের সন্ধান দিয়েছে যাতে উপরোক্ত কথাগুলি সম্পূর্ণরূপে আর মেনে নেয়া চলে না। আজ একথা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাত্রিতে কিছু সময় অন্তর কিছু না কিছু স্বপ্ন দেখে থাকে। অবশ্য এ সব স্বপ্নের কথা জাগ্রত অবস্থায় স্মরণ করা যায় না। যে ব্যক্তি আট ঘণ্টা ঘুমোয় সে প্রায় দেড় ঘণ্টা স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন মানসিক, শারীরিক অথবা ভাবনাগত অব্যবস্থার পরিণাম নয়। তবে এগুলির প্রভাব যে কিছু স্বপ্নে আছে এ কথা স্বীকার্য।

স্বপ্নের ভিতর প্রতিটি কাজ ঠিক ততক্ষণই সময় নেয়, যতক্ষণ সময় জাগ্রত অবস্থায় প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিকগণ বহু অধ্যয়ন অনুসন্ধানের পর বিভিন্ন জাতি, বৃত্তি, দেশ এবং স্ত্রী-পুরুষের-গতিবিধি বিষয়ে গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করে তবে এ সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবৈজ্ঞানিকগণ এবং চিকিৎসকগণ একযোগে গবেষণাগারে সূক্ষ্ম যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে। যখনই কেউ স্বপ্ন দেখে, তখন তার এক প্রকার গতি উৎপন্ন হয়। চোখের মণির গতি যন্ত্রের গতিতে প্রকাশ পায়। যখন চোখ খুব বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন লোকটিকে জাগিয়ে জানতে পারা যায় যে সে সত্যই স্বপ্ন দেখছিল।

এ বিষয়ে আর একটি মজার-খবর হল যে চোখের মণির গতি ঠিক স্বপ্নের বিষয়-বস্তুর গতির অনুরূপ। যদি আপনি স্বপ্ন দেখেন যে একদল মেয়ে গোল হয়ে নাচছে তাহলে আপনার চোখের তারাও গোল হয়ে ঘুরবে। আর যদি স্বপ্ন দেখেন মাঠে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা দেখছেন তবে বলের সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখের তারাটিও ওঠানামা করবে।

ঘুমের গভীরতা সব সময় ঠিক এক-রকম থাকে না। নিদ্রা ধীরে ধীরে মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে। কিছুক্ষণের জন্য অত্যন্ত গভীর হয়ে আবার হাল্কা হয়ে আসে। গভীর ঘুমে স্বপ্ন দেখা যায় না—বরং বলা যেতে পারে কাঁচাঘুমেই স্বপ্নের মেলা বসে।

কখন কখন এমনও হয় যে বাহ্য ঘটনা স্বপ্নের সঙ্গে এক হয়ে দেখা দেয়। মনে করুন কেউ স্বপ্ন দেখছে একটি মেয়ে উল নিয়ে বুনছে—একটু বাদে লোকটির ইচ্ছা হল তাকে বাহুবদ্ধ করবে। যেই উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি শিকল নাড়ার শব্দ শুনে মেয়েটি চলে গেল দরজা খুলতে। লোকটি জেগে উঠে দেখে তার টাইমপিস ঘড়িটার এলার্ম পড়ছে। এখানে এলার্ম বাজবার পূর্বেই লোকটির মস্তিষ্ক সুষুপ্তি থেকে জাগ্রত অবস্থার দিকে আসছিল।

স্বপ্ন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। আগামী দিনে আরও হয়ত অনেক নূতন কথা জানতে পারা যাবে।

কাব্যে সাহিত্যে শুকতারা অনেককাল

আগে থেকেই স্থানগ্রহণ করেছে

# মেঘে ঢাকা শুকতারা

**হিরণ্ময়প্রিয়**

রাত্রের অন্ধকারে আকাশে অসংখ্য তারকা,—কত তারা বিজ্ঞান এখনো বলতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা নিপুণ শিল্পীর মতো আকাশের চাঁদোয়ায় যেন এগুলো বসিয়েছেন। কিন্তু তবু আকাশের কোলে শুকতারা যেন ভিন্ন অন্য সব থেকে, জ্বল জ্বল করছে, নিজের স্বাতন্ত্র্যে যেন দীপ্ত। কাব্যে সাহিত্যে শুকতারা অনেক কাল আগে থেকে স্থান গ্রহণ করেছে আর এ যুগের বিজ্ঞানী তাকে দেখেছেন এক নতুন দৃষ্টিতে, দেখতে দেখতে শুকতারা তাদের ওপর মোহ বিস্তার করেছে।

আকাশের মধ্যে চন্দ্রসূর্য ছাড়া শুকতারা সবচেয়ে উজ্জ্বল, এর চারধারে মেঘের আবরণ বলেই নাকি এর এতো রূপ। আকাশ বিজ্ঞানের এর নাম শুক্রগ্রহ, পৃথিবীর অন্যতম প্রতিবেশী। পৃথিবীর মতোই এ এক গ্রহ, সূর্যের চারধারে ঘুরে আসতে লাগে ২২৫ দিন। এর কোন উপগ্রহ নেই।

সম্প্রতি আমেরিকার স্বর্ণ ও রৌপ্য আচ্ছাদিত মহাকাশযান-মেরিনার-২ এই রহস্যময় মেঘাচ্ছন্ন গ্রহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীকে সরবরাহ করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া এর আগে একটি যন্ত্র পাঠিয়েছিলো কিন্তু মহাশূন্যে সেটি কোথায় যে মিলিয়ে গেছে তার হদিশ পাওয়া যায় না।

মেরিনার-২ যন্ত্রটি ২৭শে আগষ্ট মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সাফল্য মহাকাশবিজ্ঞানে। ৪৬৬ পাউন্ড বা ২০১ কিলোগ্রাম ওজনের যন্ত্রের ভেতরে রয়েছে ইলেকট্রনের মগজ যা একসঙ্গেই অনেক কাজ করতে পারে, অনেক খবর সংগ্রহ করতে হবে। শুক্রগ্রহের কাছাকাছি যাওয়ার সময় যেসব খবর আহরণ করছে সেগুলো আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীতে। মেরিনার-২ যন্ত্রটি চওড়ায় সাড়ে ষোলো ফুট আর উচুঁতে বারো ফুট, দুপাশে দুটো পাখনা আছে। মহাকাশে চলার সময় সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে থাকে।

এই প্রথম কোন কৃত্রিম উপগ্রহ গ্রহের এত কাছাকাছি (সেও একুশ হাজার মাইল) যেতে পারলো। ঘন্টায় এ ১৫ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে এবং শুক্রগ্রহের সান্নিধ্যে একে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ মাইল।

সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চারধারে যেসব গ্রহেরা আবর্তন করে তাদের দুভাগে ভাগ করা যায় বড় ও ছোট। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, প্লুটো এসব ছোট, ব্যাস ৮০০০ মাইলের বেশী নয়। তাছাড়া চেহারারও কিছুটা মিল আছে। শুক-তারাকে ভালো করে দূরবীণ দিয়ে দেখলে হলদে ও কমলা রংয়ের রেখা নজরে পড়ে। তাছাড়া এ মেঘাচ্ছন্ন সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এসব নানা কারণে শুকতারার দেশে মানুষের যাত্রার প্রচেষ্টা।

পৃথিবীর সব কাছে মঙ্গল গ্রহ, যার সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল সবচেয়ে বেশী, এবং যেখানে জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেকেই আশা পোষণ করেন। কিন্তু মহাকাশযানে মঙ্গল গ্রহের চেয়ে শুক্র গ্রহে যাওয়াই বেশী সহজ। তবু মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে যতটুকু আমরা জানি,

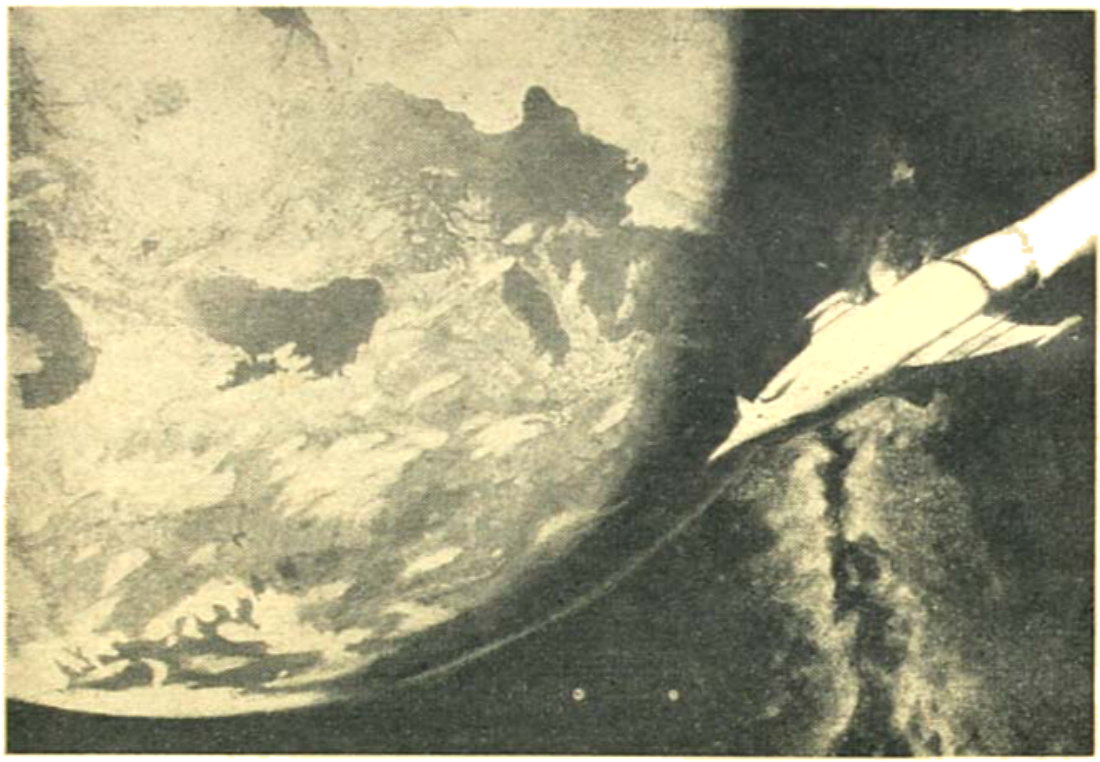

শুক্রগ্রহ সম্পর্কে ততটুকু জানি না। পৃথিবীর যখন কাছে আসে তখন-এর দূরত্ব হয় দুকোটি, পঞ্চাশ লক্ষ মাইল। পৃথিবীর সঙ্গে এর মিলও কম নেই। পৃথিবীর চেয়ে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ ছোট কিন্তু সূর্যের কাছে বলে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী—প্রায় ৬০০ ডিগ্রী ফারেন-হাইট। এই তাপমাত্রায় জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা যতখানি তার চেয়ে অনেক কম তাপ পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে। অনেকের তাই অভিমত যে শুক্রগ্রহের মেরু অঞ্চলের

আবহাওয়া হয়
সহনীয় হতে পারে।
রাশিয়ার বিজ্ঞানী শ্রীমতী

তাতে এত উষ্ণতা আসবে কোথা থেকে?
সম্প্রতি শুক্রগ্রহের মেঘপুঞ্জ থেকে
নানারকম শব্দতরঙ্গ পৃথিবীর দিকে

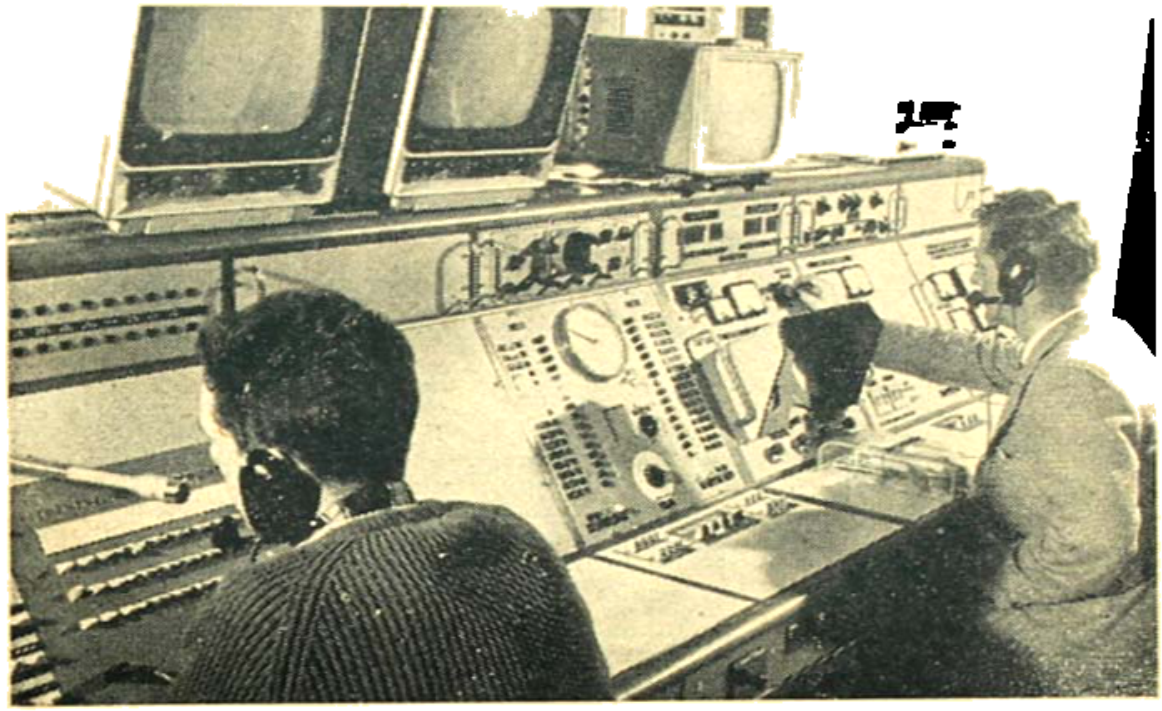

মহাকাশের গ্রহ উপগ্রহ থেকে সংকেত ও সংবাদের গ্রাহক যন্ত্র

কুতেরেভা কিন্তু বলেন যে এই শুকতারার দেশেও জীবের অস্তিত্ব সম্ভব। তিনি বলেন যে জীবনযাত্রা বলতে আমরা যা বুঝি তা হয়তো নেই কিন্তু গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের দেখা পাওয়া অসম্ভব নয়।

শুক্রগ্রহ যে রুপোলী শুকতারা তার কারণ এই মেঘ। কিন্তু এ মেঘ জল দিয়ে তৈরী নয়, এ মেঘে তাই কখনো বর্ষণও হয় না। এ মেঘ কার্বনডাই অকসাইড ও অন্যান্য ভারী গ্যাসের সমষ্টি। অনেকে আবার বলেন যে ধুলো বালি ও নানান ভস্মের সমন্বয়ে এ মেঘের সৃষ্টি কিন্তু ভেসে আসায় বৈজ্ঞানিকেরা গভীরভাবে এই গ্রহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকেন। শুক্রগ্রহে যদি মানুষের অস্তিত্ব থাকে তাহলে তারা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত হবে এটা বৈজ্ঞানিক সত্য কিন্তু সত্যি হলে তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, চিন্তাধারা ইত্যাদি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যোগা-যোগ সাধন করতো।

চাঁদের পাহাড় আর মঙ্গলগ্রহের খাল সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল। কিন্তু শুক্রগ্রহের খানিকটা দেখা যায় না অর্থাৎ সোজা কথায় যেদিকে রাত্রি সেদিকে মাঝে

মাঝে ঈষৎ বেগুনী রংয়ের আভা দেখা যায়, তার কারণ এখনো আবিষ্কার হয় নি। কেউ কেউ বলেন আশে পাশের তারার আলো শুক্রগ্রহের মেঘপুঞ্জে প্রতিফলিত হয়। এ সম্বন্ধে আরো অনেক মতামত আছে। মার্কিন বিজ্ঞানী সাইমন নিউকম্ব বলেছিলেন যে এ নয়নের ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়, প্রতিফলনের ব্যাপার হলে রাত্রে এ ভালো ভাবে দেখা যেতো কিন্তু রাত্রিকালে ঐ রঙীন আভা দেখা যায় না। পার্সিভাল লোয়েল নামে আরেক ভদ্রলোক বলেন যে অন্ধকার জায়গাগুলো বরফাচ্ছন্ন এখানে আলো প্রতিফলিত হয়।

শুক্রগ্রহ সূর্যের অনেক কাছে সুতরাং বেশী আলো যায়, তাছাড়া পৃথিবীর কাছে বলে সেই আলো প্রতিফলিত হতে আমরা দেখে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে বুধগ্রহ তো পৃথিবীর আরো কাছে, তাহলে? এর অর্থ শুক্রগ্রহ সূর্যের আলোর ৫৯ ভাগ প্রতিফলিত করে, এখানে চাঁদ করে মাত্র ৭ ভাগ।

পার্সিভাল লোয়েল সাহেব গ্রহের গায়ে কতকগুলি সূক্ষ্ম রেখা পর্যবেক্ষণ করেন, রেখাগুলি একটি জ্যামিতিক প্যাটার্নে বিভক্ত। এগুলো আসলে ঘনবায়ুর তরংগ। দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ আর অনাধারে রাত্রির দিকের ঠাণ্ডা—এই দুই তাপমাত্রার তারতম্যের জন্যে বায়ু চলাচল করে। অবশ্য আধুনিক আকাশবিজ্ঞানীরা এ ধরনের কোন রেখার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

যদি শুকতারার দেশে বাসস্থান করা যায় তাহলে মোটেই সুখের হবে না। শুধু খাওয়া দাওয়া জীবন ধারণের নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যও নয়নবিমোহন হবে না। গভীর নীল আকাশ, দিগন্তে সূর্যাস্ত, চাঁদের আলো এসবও কোনদিন দেখা যাবে না।

শুক্র ও পৃথিবী প্রতি ৫৮৪ দিনে পরস্পরের কাছাকাছি আসে অর্থাৎ শুক্রগ্রহে প্রতি উনিশ মাস অন্তর যাতায়াত করা যেতে পারে কিন্তু তবু দুই গ্রহের কক্ষপথ এক সমতলে থাকে না। অন্তত চারবার দুজনে এক কক্ষপথে এসে পড়ে প্রতি ২৪০ বৎসর অন্তর। আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দে এ ঘটনা আবার ঘটবে। সেই বৎসর মানুষ হয়তো শুক্রগ্রহ অভিমুখে পাড়ি দেবে।

আণবিক শক্তিচালিত রকেটের সাহায্যে শুক্রগ্রহযাত্রার এক মার্কিন পরিকল্পনা কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিলো। রকেটটি লম্বায় হবে ১৫০ ফুট আর ব্যাস ২৫ থেকে ৩০ ফুট। রকেটে দুটো পাখনা থাকবে যা ওঠানামার সময় বিশেষ সাহায্য করবে। কিন্তু রকেটে করে শূন্যে পাড়ি দিতে হলে খাবারদাবার জ্বালানী ইত্যাদি নিয়ে ওজনে রকেট অত্যন্ত ভারী হয়ে যাবে। সুতরাং একবারে গ্রহান্তরে যাত্রা একেবারেই অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার মাইল ওপরে একটি স্পেস্ স্টেশন করা হবে সেখানে রকেট বা মহাকাশযান প্রয়োজনমত জ্বালানী নিয়ে আবার পাড়ি দিবে গ্রহের কাছাকাছি আবার একটি স্টেশনে এসে থেমে যাবে সেখান থেকে অন্য একটি যানে একেবারে গ্রহের ভেতর।

মেঘের অন্তরালে শুকতারার দেশেও হয়তো একদিন এমনি ভাবে মানুষ গিয়ে পৌঁছবে, রূপকথাও সত্যি হবে।

# একজনও আরেকজন

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এতক্ষণ কাংরাচ্ছিলো এখন সেই ক্ষমতাও অন্তর্হিত বিষম ঠাণ্ডায় এখন একেবারে ঝিম মেরে আছে সন্দেটা। মস্ত তোরণটার তলায় দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলো সে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, আর তারই ঝাপসা শাদা সফেন রেখার ভিতর ছায়া নেমে এলো কেবল। আকাশ আর গোধূলি-বেলার কোনো কিছুই ভাবছে না সে, মাথার ভিতরটা একেবারেই ফাঁকা; যেন যেখানে তার ভেতরে স্নায়ু এবং ঘিলু থাকতো, এখন সেখানটায় শূন্যে একটা গহ্বর কেবল কালো হা করে পড়ে আছে। শুধু বৃষ্টির আবছায়ার দিকে তাকিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো কখন বৃষ্টিটা ধরে আসে। কতক্ষণ হয়ে গেলো—একা সে দাঁড়িয়ে আছে এমনি, বৃষ্টির ছাট থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তোরণের মস্ত থামের আড়ালে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, একা একটুখানি।

বিশাল সেই তোরণের তলায় সে ছাড়া আর-কেউই নেই মস্ত চওড়া থামটার উপর কোনো এককালে গালার পলিশ ছিলো এখন জায়গায় চটে উঠে গেছে, কালো- দাগ বেরিয়ে পড়েছে রকম ভাঙ্গে

বিশাল সেই তোরণের তলায় সে ছাড়া আর-কেউই নেই মস্ত চওড়া থামটার উপর কোনো এককালে গালার পলিশ ছিলো এখন জায়গায় চটে উঠে গেছে, কালো- দাগ বেরিয়ে পড়েছে রকম ভাঙ্গে একশ হয়ে থামটার পাশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো—এখন তার কালো পালক-গুলি কী-রকম যেন রেয়া-ওঠা আর

গুটিশুটিমারা—বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আরেকটা শব্দ সেই নিঃঝুমকে অনেকক্ষণ থেকে বাড়িয়ে তুলছে গম্ভীর, গুমগুমে গলায় কতগুলি ব্যাঙ ডাকছে সেই থেকে।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কাছে তোরণটা; কাল সকালে উৎসব শুরু হবে; উচিত ছিলো নিদেন আরো কয়েকজন লোক এই তোরণের তলায় এসে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে—এই দৃশ্যটা তার চোখে পড়া। কিন্তু কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু সে দাঁড়িয়ে আছে একা, হতবাক—ওই দাঁড়কাকটি ছাড়া আশপাশে আর-কোনো চিহ্নই নেই জীবনের।

গত কয়েক বছর ধরে ভুবনেশ্বর ও তার আশপাশের অঞ্চল একের পর এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নাজেহাল ও বেশামাল হয়েছে প্রথমে এলো যবনদের তীব্র ও প্রচণ্ড আক্রমণ, নিরস্ত্র ও শান্তি-প্রিয় বাসিন্দাদের কাতর মুহ্যমান ও বিমূঢ় করে তা চলে গেলো। তার পরেই এলো ভূমিকম্প, একবার উঠলো ঝড় আর ঘূর্ণিবাত্যা, অগ্নিকাণ্ড হলো পর-পর কয়েকবার, এমনকি দুর্ভিক্ষও তার সুযোগ এবং দাবি একতিলও ছাড়লো না। প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ভুবনেশ্বর—যেন অচিরেই তার অবসান অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। জনরব দেবদেবীদের প্রতিমা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক জিনিশ স্তূপাকারে পড়ে আছে রাস্তায় জ্বালানি কাঠ হিশেবে ব্যবহার করার জন্য—সোনারুপো লাক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় মূল্যবান অলংকার ও আবরণ সব তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই যখন অবস্থা তখন মন্দিরে যাবার পথে তোরণগুলির ভগ্নদশা যে মেরামত করা হবে না, তা তো বলাই বাহুল্য।

কোত্থেকে যেন একদল কাক ভিজে কুঁকড়ে উড়ে এলো সেখানে। দিনেরবেলায় এরা তোরণের মাথার উপর ঘুরে-ঘুরে চক্কর দেয়, পাক খায়, আর টেনে-টেনে ডেকে দিনের আলোকে পর্যন্ত বিভীষিকার ধারে-কাছে নিয়ে আসে। অস্ত সূর্যের পড়ন্ত আলোয় আস্ত আকাশটাই যখন লাল হয়ে ওঠে, তখন তারা যখন তোরণের উপর দিয়ে উড়ে যায়, মনে হয় যেন ঝাঁকে-ঝাঁকে তিলের দানা উড়ে চলেছে। আজ কিন্তু এতক্ষণ ওই একলা দাঁড়কাকটা ছাড়া আর-কোনো কাকই ছিলো না আকাশে, হয়তো বেলাশেষের আকাশে তারা ভেসে বেড়ায় না, হয়তো বর্ষার জন্য এতক্ষণ তারা অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়ে-ছিলো। এখন দেখা গেলো সিঁড়ির উপর থামের ধারে কার্নিশের উপরে কালো ফুটকির মতো একটা দুটো করে অনেক এসে বসে পড়লো। সিঁড়ি, থাম, কার্নিশ সব কিছুরই ভগ্নদশা; শ্যাওলা জমেছে এদিক-ওদিক, কোথাও বা ফাটলের মধ্য থেকে মাথা তুলেছে অশ্বত্থের চারা, কচি পাতাগুলি বৃষ্টির ছাঁটে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। লোকটা বসে পড়লো সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে, চত্বরের ঠিক পাশেই, মস্ত গভীর সেই কুয়োটার ধারে। গায়ে তার নীল জামা; চওড়া পাড়ের ধুতি পরেছে এমনভাবে যেন কাপড় পরাটা বস্তুত লজ্জাবশতই, নয়তো উলংগ সে ঘুরে বেড়াতো চারপাশে। সিঁড়ির উপর বসে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে সে বৃষ্টির দিকে।

বৃষ্টি কখন ধরে আসে, বসে-বসে তারই জন্য অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেলে সে কী করবে, তা সে

সঠিক জানে না। কোনো পরিকল্পনাই নেই তার, কোনো সংকল্প কিংবা দায়িত্ব নেই—আসলে কিছুই করার নেই সে কী করবে, কোথায় যাবে, কেমন করে যাবে কিছুই জানে মনের ভিতরটা গহ্বরের মতো এইসব

দাঁড়িয়ে পড়লো সে চক্ষের পলকে

একেবারে। এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বাড়িতে সে কাজ করতো কিছুকাল আগে, সম্প্রতি তাকে বরখাস্ত করে দেয়া হয়েছে। নগরের যা কিছু উন্নতি ঘটেছিলো একদা, এখন তা লক্ষ্যমান। যেন হঠাৎ আস্ত নগরটাই গরীব হয়ে গেছে। ফলে বহু-বছর কৃতিত্বের সঙ্গে প্রভুর সেবা করা সত্ত্বেও প্রভু বাধ্য হলেন তাকে বিদায় দিতে। আর শেষ যে-ভূমিকম্প হলো, তাতে দেখে তার ঘরবাড়িই যে শুধু ধূলিসাৎ হয়েছে তা নয়, পরিবার পরিজন পোষ্য সব ওই দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বৃষ্টি থেমে গেলে প্রশ্ন কেবল দীর্ঘ ও ক্ষীণ প্রতিধ্বনিই তোলে অকুণ্ঠভাবে, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, কিংবা কোনো ভাবেই সাহায্য করে না। আর তার এই বিমর্ষ ও অসহায় মেজাজকে এই মেঘলা আব-হাওয়া আরো গুরুভার ও বিধুর করে গেলো। বৃষ্টি যে আদৌ কোনোকালে থামবে, তা মনে হয় না। বেশ হয়, যদি প্লাবন ভাসিয়ে নেয় সব কিছু। কী করে যে জীবিকা নির্বাহ করবে, কী করে ক্ষুরিবৃত্তি করে চিরকাল ধরে বেঁচে থাকবে, এই ভাবনার অসীম পথের মধ্যে সে যেন

ক্রমে হারিয়ে গেলো। ঝাপসাভাবে সে কেবল একটানা বৃষ্টির শব্দ শুনে চললো।

হঠাৎ আরো জোরে হাওয়া এলো, বৃষ্টির প্রবলতাও বেড়ে গেলো। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তোরণের চারপাশে—আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তোরণের ঠিক ছাতের উপরটায় খণ্ডমার্কা কালো মেঘ ওৎ পেতে আছে—যেন সুযোগ পেলেই তুমুল শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়বে মাথার উপর।

উপায় বলতে কিছুই তার নেই; ভালো কি মন্দ, সৎ কি অসৎ, ন্যায় কি অন্যায়, এ-সব প্রশ্নই ওঠে না; পরিস্থিতি যে-রকম তাতে তাকে টিকে থাকতে হলে বাছাবাছি করলে চলবে না। যদি সৎপথে থাকার চেষ্টা করে, তাহলে অচিরেই তাকে উপবাসে জীর্ণ ও নির্জীব হয়ে নর্দমায় পড়ে পচতে হবে। অন্য সব বেওয়ারিশ লাশের মতো তার মৃতদেহও অচিরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে তোরণের আশপাশে ফেলে দিয়ে যাওয়া হবে। ঠিক পথের কুকুরের মতো মরে পড়ে থাকবে সে, আর শেয়াল ও শকুনকে খাদ্য জোগাবে। আর যদি সে চুরি করবে বলেই সংকল্প করে, যদি বিবেক নামক বিগ্রহটিকে বুক থেকে ছিঁড়ে খুবলে বের করে নিয়ে ওই বেওয়ারিশ লাশের মতো নর্দমার পাশে ফেলে দিতে পারে····হ্যাঁ, চুরিই করবে সে; সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে বিজ্ঞজনেরা অর্ধেক ত্যাগ করেন; সে তো কেবল একটি অবাঞ্ছিত জিনিসকেই উপড়ে ফেলতে চাচ্ছে, উটের পিঠে কুঁজের মতো যা কদাকার, যা শুধুই অহেতুক বেখাপ্পা ও নিষ্ক্রিয় করে রাখে মানুষকে।

ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিলো—কয়েকবার তাকে হাঁচতে হলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, কনকনে ঠাণ্ডা—পাঁজরার ভিতর চোখ ছুরির মতো হাওয়া বিঁধে যাচ্ছে বারে-বারে। চাঁদ উঠলে কুকুর যেমন করে অশরীরীদের অনুভব করে রক্তে, আর রাগ, ভয় ও ক্ষোভে অচ্ছন্ন হয়ে চাঁচায় একটানা—তেমনিভাবে তোরণের থামের গায়ে বুনো হাওয়া চীৎকার করে আছড়ে পড়ছে। ঝিল্লির শব্দ এখন আর নেই—কেবল মাঝে-মাঝে কতিপয় ব্যাঙের সম্মিলিত গলা ঐকতান-টিকে আবার শুরু করবার ইঙ্গিত জানাচ্ছে।

ঘাড় বাঁকিয়ে আশপাশে একবার সব অবলোকন করে নিলো; কামিজটাকে আরো টেনে নিয়ে এমনভাবে চিবুকে হাঁটু ঠেকিয়ে গুটিয়ে বসলো যেন নিজের বুকের গরমে আস্ত শরীরটাকে সে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করবে। যদি বৃষ্টি আর হাওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার উপযোগী কোনো কোণাখামচি পাওয়া যায়, তাহলে রাতটা সে এখানেই কাটিয়ে দেবে বলে ঠিক করলো। চওড়া একটা শান-বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে মিনারের ধারে। সেখানে মস্ত একটা চাতাল আছে—ছাতও আছে,—অনেকটা কোনো ঢাকা অলিন্দের মতো। কেউ থাকে না সেখানে; কেউ থাকবে না নিশ্চয়ই, যদি থাকে তো কেবল মৃতদেহ থাকবে কতিপয়। প্রথমে উঠে সাবধানে দেখলো যাতে কোষবন্ধ তরবারি পড়ে না যায়; খাপের মধ্যে ভালো করে তরবারিটি ঢুকিয়ে রেখে হাতলে হাত রেখে সিঁড়ি বেয়ে সে উঠতে লাগলো আস্তে-আস্তে।

কেবল কয়েক মুহূর্ত গেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখলো কী যেন নড়ে উঠলো সিঁড়ির উপর, কে যেন শাঁ করে সরে

গেলো একপাশে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চাইলো প্রথমে, তারপর রুদ্ধশ্বাসে কোনো শিকারি মার্জারের মতো স্তব্ধ, স্থির ও অনিবার্য পায়ে মিনারের সিঁড়ির দিকে আরেকটু এগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সমস্ত অস্তিত্বকে উৎকর্ণ করে সে তাকিয়ে থাকলো। মিনারের উপরে একটা জায়গায় একটা গোল ঘুলঘুলি মতো; ঝাপসা মেঘলা আলো আসছে সেখান দিয়ে; কেবল মৃতরাই আছে এখানে, এই সে ভেবেছিলো; কিন্তু আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখলো উপরের সেই চাতালের মতো জায়গাটায় কে যেন অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছে: ভিজে কাঠের ধোঁয়া, সোঁদা গন্ধ আর আগুনের লাল শিখা—সব যেন অতর্কিতে তার উপর একসঙ্গে লাফিয়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখলো ওই আগুনের পাশেই কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখলো ছাতের ধারে, দেয়ালের উপরে মাকড়শার জালের উপরে আগুনের দীপ্ত ছায়া লাফিয়ে-লাফিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে, আর একটা হলুদ, সকাতর ও কম্পিত আলোর নাচে মাকড়শাগুলি কেমন ভৌতিক আর অপার্থিব দেখাচ্ছে—যেন এই জায়গটা মুহূর্তে প্রেতলোক থেকে উঠে এসেছে। এই তোরণের উপরে আলো জ্বালালো কে? কী ধরনের লোক হতে পারে সে? কেমন লোক? এই ঝড়ের মধ্যে কে এখানে আশ্রয় নিতে পারে? অজ্ঞাত এক অশুভ কালোছায়া যেন ঘুরে গেলো তার উপর দিয়ে। যেন কোনো অচিন্তিত বিভীষিকা তাকে সজোরে এক ধাক্কা মেরে চলে গেলো।

সরীসৃপের মতো নিঃশব্দে ওই খাড়া সিঁড়িগুলি বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো সে। তারপর হামাগুড়ি দিতেই গলা বাড়িয়ে মিনারের ওই বাসিন্দাটির দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো।

জনরব যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ সে স্বচক্ষে দেখতে পেলো। সত্যি, বেওয়ারিশ কতগুলি লাশ পড়ে আছে চাতালে। আলো যেহেতু ক্ষীণ, এবং যেহেতু সে বুকে হাঁটছে বলে মেঝের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে রেখেছে, সেইজন্যে কটা লাশ পড়ে আছে, সে গুনতে পারলো না। শুধু দেখলো কতগুলি লাশ সম্পূর্ণ নগ্ন—অপাদ-মস্তক অনাবৃত, কোনো-কোনো লাশের গায়ে তখনো পোশাক রয়েছে। স্ত্রী-লোকের মৃতদেহও আছে কতগুলি; মেঝের উপর পড়ে আছে তারা—হা করে আছে কেউ-কেউ, কারো-কারো হাত পা ছড়িয়ে আছে, কারো মরা চোখ অপলকে তাকিয়ে আছে—মড়াগুলিকে যারা এখানে এনে ফেলে রেখে গেছে তারা মৃতের চোখের পাতা পর্যন্ত বুজিয়ে দেয় নি। যেন কতগুলি মাটির পুতুল পড়ে আছে এলো-মেলো। যে এই পুতুলগুলিকে বানিয়ে-ছিলো, সে যেন বিভীষিকা ভালোবাসে বলেই তার পুতুলগুলিকে ও-রকম বীভৎস, কদাকার ও নিষ্প্রাণ করে বানিয়েছে। তারা যে কোনো কালে বেঁচে ছিলো, প্রাণবন্ত ও স্পন্দমান ছিলো—তার কোনো চিহ্নই নেই, এমন ভীষণভাবে তারা স্তব্ধ ও নিঃসাড়। গ্রীবা, ঘাড়, কাঁধের হাড় কিংবা মাথার চুল সেই ঝাপসা আলোর মধ্যে যেন তীক্ষ্ণভাবে ফুটে বেরোচ্ছে, শরীরের বাকি অংশটুকু আদ্যোপান্ত ডুবে আছে ছায়ার ভিতরে। পচা ও গলমান সেই সব মড়ার তীব্র দুর্গন্ধ তাকে মুহূর্তে নাকে হাতচাপা দিতে বাধ্য করলো।

কিন্তু পরক্ষণেই কলের পুতুলের

মতো তার হাত ঝুলে পড়লো। দেখতে পেলো প্রেতের মতো একটা লোক ও-রকম একটা গলা মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। হাতে তার জ্বলন্ত এক টুকরো কাঠ, তারই ভুতুড়ে আলোয় দীপ্ত হয়েছে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ—আর ভূতের মতো সে তাকিয়ে আছে।

কৌতূহলের বদলে আতঙ্ক আর বিভীষিকা প্রথমটায় তাকে এতই আচ্ছন্ন করলে যে সে নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেলো। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো, ওই ভূতের মতো লোকটা মৃতের গলায় হাত রাখলো। তারপর যখন হাত তুলে আনলো, দেখা গেলো একটি কণ্ঠহার। জ্বলন্ত কাঠটির কাছে হারটিকে ধরে খুব ভালো করে তাকে দেখতে লাগলো লোকটা। আর সে তাকিয়ে দেখলো লোকটার চুল শণের মতো শাদা, ঝোপের মতো শাদা দাড়ি লোকটার মুখময়; ঘাড়ের কাছে মাংসের মধ্যে ঢিলে-ঢিলে ভাঁজ পড়েছে, চামড়া কুঁচকোনো ও শিথিল।

যেই বুঝলো লোকটা বুড়ো, অমনি ভয় কেটে ঘৃণায় তার আপাদমস্তক রী-রী করে উঠলো। ঘৃণা নয় শুধু, তাকেও ছাপিয়ে গেলো তার বোধ; যেন এক তীব্র অনীহা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—পাপের বিরুদ্ধে অনীহা, অশুভের বিরুদ্ধে অনীহা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনীহা। প্রচণ্ড বিরোধিতা যেন হঠাৎ বুকের ভেতর গর্জন করে উঠলো। এই মুহূর্তে যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করতো, কী চাও তুমি? অসৎ পথ অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে, না, সৎপথে থেকে অনাহারে উপবাসে তিলে-তিলে শুকিয়ে মরতে, তাহলে সে উত্তর দিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করতো না, তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট ও তীব্রস্বরে নির্ঘাৎ মৃত্যুকেই আরাধ্য ও অভিষ্ট বলে নির্বাচন করতো। বুড়োটা ততক্ষণে হাতের মশালটি মেঝেয় নামিয়ে রেখে দুই হাতে হারটিকে ধরে আছে। পাপের বিরুদ্ধে তার যে ঘৃণা, ঠিক ওই মশালটির মতোই তা বহ্নিমান ও দীপ্ত হয়ে উঠলো।

কোনো ঝড়ের রাতে এমনি কোনো পাণ্ডববর্জিত তেরেণে কোনো মৃতের গলা থেকে হার খুলে নেয়াটা দোষের কি না, তা সে বুঝতে পারলো না। তবু তার সমস্ত অন্তরাত্মা বললে, এটা অন্যায়, এটা খারাপ, এটা ঠিক নয়। অথচ এটা তার মাথায় একবারও ঢুকলো না যে একটু আগে সে নিজেই চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করার সংকল্প নিয়েছিলো।

তৎক্ষণাৎ যেন তার হাঁটুর জোড়ায় শক্তি ফিরে এলো; দাঁড়িয়ে পড়লো সে চক্কের পলকে, তারপর তলোয়ারটাকে খাপ থেকে খুলে প্রবল পায়ে সেই বুড়োর কাছে এগিয়ে গেলো। একটি দীর্ঘকায় লোকের ছায়া পাশে পড়তেই বুড়োটা চমকে লাফিয়ে উঠলো, ভয়ে তার চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে খিক-খিক করে ভৌতিক একটা হাসি হেসে উঠলো, তারপর আরেক লাফে সোজা সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে চলে গেলো।

তাকে পালাতে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'শয়তান! কোথায় পালাবি তুই?' বলে সেও লাফ দিয়ে ঠিক তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো। বুড়োটা তাকে ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সে কিছুতেই সরলো না, বরং তাকে

বাধা দিলো। বুড়োটা তখন ধাক্কা দিলে তাকে সজোরে, অমনি আচমকা তার হাত থেকে তরবারিটা ছিটকে পড়লো, আর নিজেকে সামলাতে না পেরে সে ওই মৃত-দেহগুলির মধ্যে পড়ে গেলো। কিন্তু পড়েই সে দুই হাতে বুড়োটার পা ধরে এমনভাবে হ্যাঁচকা টান দিলো যে সেও টাল সামলাতে না পেরে তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। তারপর ওই মড়গুলির মধ্যেই তাদের যুদ্ধ চললো; কিন্তু তার মতো টগবগে যুবকের সঙ্গে বুড়ো আর কতক্ষণ যুঝতে পারবে? বুড়োর কব্জি সে চেপে ধরলো শক্ত হাতে, তারপর মুচড়ে দিলো সজোরে, তারপর যন্ত্রণায় বুড়ো কাৎরে উঠতেই তাকে মেঝেয় চিৎ করে ফেলে বুকের উপর উঠে বসলো। তারপর বুড়োর চোখের সামনে ঝলসে উঠলো তরবারির তীক্ষ্ণ ও চকচকে ফলা। সে ভয়ে চোখ বুজলো। তারপরে ভয়ই আবার তাকে চোখ খুলতে বাধ্য করলো; কোটর-গত অক্ষিযুগল যেন বেরিয়ে এলো মৃত্যু-ভয়ে, শ্বাসকষ্ট শুরু হল প্রায়।

এই হতভাগা বুড়োর প্রাণ এখন তার দয়ার উপর নির্ভরশীল, এ-কথা ভাব-তেই তার টগবগে ক্রোধ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হলো। শুধু তা-ই নয়, কিছুটা তৃপ্তি ও গর্বও অনুভব করলো সে। শান্ত গলায় বললো, 'দ্যাখো, আমি নগর-কোতোয়ালির লোক নই। জগতের শান্তিরক্ষা ও দুষ্টের দমন আমার কাজ নয়। নিছকই একজন রাস্তার লোক আমি। তোমাকে আমি বাঁধবোও না, মারবোও না—শুধু আমাকে বলো এখানে তুমি কী করছিলে।'

যেন হাঁড়িকাঠে সমর্পিত সিঁদুর পরানো ছাগশিশু, এমনিভাবে বুড়ো বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। ঠোঁট কেঁপে উঠলো তার; কণ্ঠা ফুলে উঠেছে, হা করা মুখের মধ্য থেকে জিভ যেন বেরিয়ে আসছে। মনে হলো যেন ঢোক গিলছে, এমনিভাবে গলার শিরা ও কণ্ঠা আরো ফুলে গেলো, তারপরে সে যখন কথা বললো, তখন তা শোনালো দাঁড়কাকের কর্কশ ও একটানা চীৎকারের মতো, 'ন্যাকো? না ইচ্ছে করে বোকা সাজছো? কী করছিলাম, স্বচক্ষেই তো তা দেখেছো? মৃতদের সম্পত্তি চুরি করি আমি। হ্যাঁ, আমি চোর—দয়াহীন, মমতাহীন, নিষ্ঠুর এক তস্কর কেবল!'

তার উত্তর শুনে সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেললো সে। সে প্রেত নয়, কোনো রহস্যই নেই তার সম্বন্ধে; গায়ে জোর নেই বলে জীবিতের থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে না সে, তাই মৃত-রাই তার চৌর্যবৃত্তির ক্ষেত্র। এত বুড়ো যে জোরে ধাক্কা মারলেই মরে যাবে—বেঁচে থাকার জন্য এই পথ সে অবলম্বন করেছে। বুড়ো যেন তার মনোভাব বুঝতে পারলো, তাই স্তব্ধতাকে চিরে তার গলা কোনো ধাতুময় আওয়াজের মতো বেজে উঠলো: 'মৃতের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেয়াটা তোমার কাছে জঘন্য ও ঘৃণ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। যে মেয়েটির গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছি, সে বেশ্যা ছিলো—তা জানো? নিজের রূপ যৌবন ও লাবণ্যকে বিক্রি করে সে বেঁচে থাকতে চাইতো। ভুল করেনি সে—কেননা তা না করলে তাকে না-খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে

হ'তো। যদি সে জানতো, যে এইভাবে তার মৃত্যু হবে, আর তার মৃতদেহ থেকে তার অলংকার আমি ছিনিয়ে নেবো, তবু তা না-ক'রে তার কোনো উপায় ছিলো না। কেননা এর নাম হ'লো বেঁচে-থাকা; জীবনধারণ এত মর্মান্তিক এবং এমন তীব্র যে তার হাতে সব ন্যায় নীতি দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিঃসংশয়ে সমর্পণ ক'রে না-দিয়ে কোনো উপায় থাকে না।'

তরবারিটা খাপে ঢুকিয়ে ফেলে সে গভীর মনোযোগের সংগে বুড়োর কথা শুনছিলো। তারপরে বুড়ো থাকতেই অদ্ভুত এক সাহস জেগে উঠলো তার বুকে —এতক্ষণ বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে উদাসভাবে বসেছিলো তখন চেষ্টা করেও এই সাহস সে অর্জন করতে পারে নি। যেন তীব্র এক শক্তি তাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে অন্য-দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে; যখন সে বুড়োকে কব্জিতে এনে ফেলেছিলো ঠিক তার বিপরীত এক শক্তি যেন এখন তাকে জাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উপবাসে মৃত্যু না তস্করবৃত্তি—কোনটা কাঙ্ক্ষনীয়, এ-বিষয়ে এখন আর কোনো সংশয়ই তার নেই। নিজের সমস্যার মীমাংসায় সে এত-টাই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো যে বুড়ো কথা থামাতে সে তাকে ঠাট্টা না ক'রে পারলো না। 'ঠিক বলছো তো?' সে বলে উঠলো, 'তাহ'লে তোমার সর্বস্ব চুরি করে যদি আমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, তাহলে সেটাও তো তেমন দোষের হয় না। কেননা তা না-হলে আমাকেও যে উপোস করে মরতে হয়।' বলেই সে জোর করে বুড়োর গা থেকে নীল জামা, আর আঁটো কাপড় খুলে নিলো—ছিনিয়ে নিলো তার হাত থেকে হারটা, তারপর ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিলো। বুড়োটা যখন ধাক্কার চোটে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, তখন সে ছুটে তার পাশ দিয়ে নিচে নেমে গেলো, তারপর সোজা অন্ধ-কারে বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেলো মুহূর্তে। তার সব সমস্যার সমাধান এত সহজে হয়ে গেলো ফূর্তিতে আর উল্লাসে বৃষ্টি, অন্ধকার কি পথের পাশের কালো ঝোপ—কোনো কিছুতেই সে তোয়াক্কা করলে না। ফাঁকা সেই তোরণের বাঁধানো চাতাল থেকে তার ধাবমান পায়ের শব্দ একটু পরেই মিলিয়ে গেলো।

একটু পরে বুড়ো ক্ষতবিক্ষত শরীরে কোনো রকমে ধুঁকতে-ধুঁকতে উঠে বসলো। তারপর ঠাণ্ডায় তার গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠলো যেন—কোনো জামা নেই তার। যেন আদিকালের কোনো জংগলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে উলংগ—পৃথিবীর আদি মানবদের একজন। উপরে তারই জ্বালানো আগুনের কুণ্ডে শব্দ করে একটা বাঁশ ফেটে উঠলো—তারপর আগুনটা আবার দীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠলো। কোনো রকমে টলতে-টলতে ওই আগুনের ধারে এসে বসলো সে—এখন এখানে আগুন পুইয়ে শরীর গরম করা ছাড়া আর কোনো কিছুই তার করার নেই।

আগুনের পাশে বসে-বসে নগ্ন ঠাণ্ডা শরীর সেঁকতে-সেঁকতে সে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেখানে কেবল প্রচণ্ড, বিষণ্ণ, ভীষণ, অন্তহীন, অজ্ঞাত, অগম্য ও ঘন কালো অন্ধকার পুঞ্জ-পুঞ্জ হয়ে আদি-কাল থেকে জেগে আছে।

[গল্প-ভারতী

তামাকের জন্ম নিয়ে বহু কাহিনীর প্রচলন আছে

# তামাক

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

একটি সংবাদ পণ্ডিত নেহেরু তাঁর ধূমপানের বরাদ্দ আগের চেয়ে কমিয়ে দিয়েছেন। অন্য একটি ঐতিহাসিক উক্তি আহা, মৃত্যুর পূর্বে শেষ নিশ্বাসটুকু যদি তামাকের সংগে টানতে পারতাম ! জীবনের শেষ ইচ্ছাটি জানাতে গিয়ে কথাটি বলে-ছিলেন খ্যাতিমান ইংরেজ লেখক চার্লস ল্যাম্ব। প্রথম সংবাদ এবং দ্বিতীয় উক্তিটি ভিন্নধর্মী হলেও ধূমপানের আনন্দটিকে কোনও ধূমপানকারীই অস্বীকার করতে পারবেন না। ক্যান্সারের আশংকায় অনেকেই ধূমপানের পরিমাণ হ্রাস করলেও আমাদের দেশের আদিবাসীরা কিন্তু ল্যাম্ব-এর সংগে পুরোপুরি একমত। শুধু তাই নয়, তামাকের জন্যে যে কঠোর পরি-শ্রম করে, তাতে তামাক কেন আরো বড় কিছু সংগ্রহ করতে পারত তারা। আদি-বাসীরা বলে ঐশ্বর্য আমরা ত্যাগ করতে পারি, কারণ ঐশ্বর্য ছাড়াও জীবন ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু প্রাণ ধারণের সংগে ধূমপানের যেন নাড়ীর সম্পর্ক। মদ্যপান করার অভ্যাসটা ওদের দৈনন্দিন সূচীর একটা অংশ। তাও তারা ত্যাগ করতে পারে পাঁচ-দশ দিনের জন্যে; কিন্তু পাঁচ-দশ মিনিটের জন্যে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার মত অমংগলের কথা আদিবাসীরা কল্পনাও করতে পারে না। তামাক ওদের অত্যন্ত প্রিয়। আদিবাসীদের তামাক পাতা রাখার সুন্দর কাজ করা কাঠ, চামড়া অথবা বাঁশের আধার বা পাত্রগুলো দেখলেই তা অনুমান করা যায়। নাগা, মুরিয়া, কোন্ড প্রভৃতি আদিবাসীরা তামাক পাতা রাখার

অথবা সেবনের জন্যে যে সব আধার ব্যবহার করে সেগুলোর সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্য লক্ষ্য করলে তাদের ধূমপান প্রীতির গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

সংস্কারচ্ছন্ন মানুষের সমাজে তামাকের এত বড় স্থান পাওয়ার একটা প্রধান কারণ দক্ষিণ ভারতের একটি প্রচলিত গল্প। গল্পটির মর্ম ইন্দ্র একদিন ব্রহ্মার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, বলতে পারেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বস্তুটি কি? উত্তরে চতুরানন ব্রহ্মার চার মুখ থেকে হিন্দী, তেলেগু, কানড়ী এবং তামিল ভাষার চারটি শব্দ উচ্চারিত হ'ল। শব্দ চারটির উচ্চারণ ভিন্ন হলেও তাদের অর্থ একটিই —তামাক, তামাক, তামাক, তামাক। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের এই প্রশ্নোত্তরের সূত্র থেকেই দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের তামাকের ওপর এতখানি প্রীতি এবং শ্রদ্ধা।

তামাকের কেমন করে জন্ম হ'ল তা নিয়ে বহু কাহিনীর প্রচলন আছে। প্রচলিত কাহিনীর কয়েকটিতে যে উল্লেখ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে তামাকের আবিষ্কার হঠাৎ ঘটনাচক্রে। এ প্রসংগে উড়িষ্যার উপজাতিদের প্রচলিত একটি কাহিনী কোনও এক আদিবাসীর ঘরের একটি ছাগল নিয়মিত চরতে চরতে একদিন নিজের অজ্ঞাতে কিছু তামাক পাতা খেয়ে ফেলল। সন্ধেবেলা যখন সে ঘরে ফিরল তখন দেখা গেল তামাকের নেশা তাকে ধরেছে। শুধু তাই নয়, সেই রাত্রে ছাগলের দুধ পান করে তার স্বত্বাধিকারীর পরিবারের সকলেই নতুন একটা নেশার আমেজ অনুভব করল। এ থেকেই প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল, ভক্ষিত তামাকপাতাই এই নতুন নেশার কারণ।

জুয়াং উপজাতির একটি গল্প থেকে জানা যায় কেমন করে নৃতারত এক মাদলবাদক যুবক পরিশ্রান্ত হয়ে নাচতলার পাশে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতে তামাক গাছের ডাল চিবিয়ে অজানা এক সুন্দর আমেজে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কোন্ড আদিবাসীদের মতে রন্ধন বস্তুর সংগে তামাকের পাতা অসাবধানতার ফলে মিশে গিয়েছিল, তারপর থেকেই এটিকে নেশার দ্রব্য হিসেবে তারা ব্যবহার করে। যারা রন্ধিত খাদ্য গ্রহণ করেছিল তারাই নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। বহু আদিবাসী এখনও তামাককে জলীয় মাদক দ্রব্যের সমপর্যায়ে স্থান দিয়ে থাকে।

উপজাতিদের অন্যমতে দুঃখ-বেদনা বিনাশের ওষুধ হিসেবে মানুষের সমাজে তামাকের প্রথম প্রচলন। সাঁওতাল আদিবাসীরা একালেও দাঁতের দারুণ যন্ত্রণায় তামাক পাতার রস ব্যবহার করে। আধুনিক সমাজের উচ্চতলায় সিগারেট বা তামাকের ব্যবহার শুধুমাত্র বিলাসিতা নয়, এর একটা প্রয়োজনকেও স্বীকার করে নিয়েছে একালের মানুষ।

অবসর বিনোদন অথবা বিষাদ দূর করার জন্যেই যে তামাকের প্রয়োজন আছে তা নয়, আতিথ্যের অন্যতম অংগ হিসেবে তামাক-দ্রব্য স্থান পেয়েছে আধুনিক সমাজে। মুরিয়া উপজাতির একটি প্রচলিত কাহিনী থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে অতিথি সেবার প্রধানতম মাধ্যম হিসেবে চাল থেকে প্রস্তুত খাদ্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল প্রাচীনকালে। কিন্তু অকারণ ক্ষয়ে ভীত হলেন ধান অথবা চাল। অতিথি-

সেবায় নিজেকে ব্যবহার করার অবসান ঘটাবার জন্যে তামাক গাছের শরণাপন্ন হলেন তিনি। সেদিন থেকেই আতিথ্যের মাধ্যম হিসেবে স্থান নিল তামাক। অতিথি সেবায় তামাক-দ্রব্যের রেওয়াজ আজও বর্তমান।

উড়িষ্যার কোন্ড আদিবাসীদের একটি কাহিনীতেও উপরোক্ত গল্পের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এ কাহিনীতে আছে, ধান অথবা চাল, তার অতিরিক্ত ক্ষয়ের অনিবার্য পরিণতি অনুমান করে মানুষের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হবার চেষ্টা করল। অন্তর্ধানকালে তার পায়ের আঘাতে মাটিতে জন্ম হল তামাক গাছের। অবশেষে সেই গাছ তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আপন ফুলের গন্ধে বন প্রান্তর ভরিয়ে করজোড়ে ধান গাছের কাছে নিবেদন জানাল, "তুমি অন্তর্ধান কোরনা। আমাদের মাঝেই বসবাস কর। তোমাকে তুষ্ট করার জন্যে আমাদের পাতার স্বাদই মানুষ সর্বাগ্রে গ্রহণ করবে।"

তামাকের জন্ম প্রসংগে উপজাতিদের মধ্যে যে বিচিত্র কাহিনীটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তা হল অপমানিতা এক কুমারী রাজকন্যার কাহিনী। অনেক সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়েও অংগগত কয়েকটি ত্রুটির জন্যে কোন পুরুষ তাকে ভালবাসেনি। রাজার অক্লান্ত চেষ্টাতেও কন্যা পতস্থ হল না। শেষে দুঃখ-বেদনা-অপমানে আহত হয়ে একলাটি মারা গেল সেই রাজকন্যা। মৃত্যুর পর মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে রাজকন্যা নিবেদন জানাল : প্রভু, আমার জীবদ্দশায় কোনও পুরুষ আমাকে গ্রহণ করেনি। এখন মৃত্যুর পর আমাকে দিয়ে এমন কিছু প্রস্তুত করুন, যা ছাড়া পুরুষের চলবেনা।' কন্যার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন মহাপ্রভু। রাজকন্যার নতুন জন্ম হল তামাক গাছ রূপে। তামাক পুরুষের বড় প্রিয়। কাহিনীতে বিশ্বাসী গাড়াবা উপজাতীয় আদিবাসীরা তামাক প্রসংগে বলে থাকে তামাক এবং স্ত্রী আমাদের কাছে সমান সম্মানের। দুটি বস্তুকেই আমরা সমান ভালবাসি।

তামাক পাতার গঠন-বৈচিত্র্য অনেকটা গরুর কানের মত। একদল উপজাতির বিশ্বাস গরুর কান থেকেই তামাক পাতার আদি জন্ম। এদের মতে প্রাচীন কালে যখন লাঙল দিয়ে চাষ-আবাদ করার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন স্বভাবতই অধিক ফলনের জন্যে চাষীরা অবিশ্রাম পরিশ্রম করতে লাগল। কাহিনীর সূত্রানুসারে সেকালে একটি বলদ চারটি কানের অধিকারী ছিল। এদিকে মহাদেব ভাবলেন, কোনও বিশ্রামের ব্যবস্থা না রেখে গরুকে দিয়ে একটানা পরিশ্রম করানো তো মহা অন্যায়! এর একটা বিধানের জন্যে তিনি মর্ত্যে নেমে এসে প্রত্যেক গরুর দুটি করে কান কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। কর্তিত কানগুলি মাটির স্পর্শ পেয়ে তামাক পাতা রূপে নতুন জীবন পেল। সংগে সংগে তামাক সেবনের রীতিটিও মহাদেব মর্ত্যবাসীকে শিখিয়ে দিলেন। তারপর থেকে গরুদের বিশ্রামের ব্যবস্থাও হল, মানুষের নতুন একটা নেশা বিশ্রামকালীন সময়ের জন্যে জুটল।

সংস্কারচ্ছন্ন উপজাতিদের কাহিনীগুলিতে তামাকের মূল্যায়ন যে ভাবেই হোক না কেন, আধুনিক কালের বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষ সিগারেট অথবা তামাক-দ্রব্যকে সমাজের নিয়মিত প্রয়োজনে স্থান

দিলেও ধূমপানের অপকারিতার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছে। মারাত্মক রোগ ক্যান্সার আক্রমণের অনেক কারণ থাকলেও ধূমপানকে অন্যতম কারণ বলে হুঁসিয়ারি দিয়েছেন একালের বিজ্ঞানীরা। তামাক-দ্রবোর 'নিকোটিনের' বিষক্রিয়া শুধুমাত্র ক্যানসারকেই সাহায্য করে এমন নয়; হৃদ-যন্ত্র, শরীরের বিভিন্ন রক্তাধারা, পরিপাক-যন্ত্র, শিরা-উপশিরার নিয়মিত কার্যক্রম প্রভৃতিকেও ঘায়েল করে দিতে পারে ক্রমান্বয়ে। অনেক বিজ্ঞানীর বিশ্বাস অতিরিক্ত ধূমপান ক্ষয় রোগেরও সাহায্যকারী।

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে; যে সমস্ত নারী-পুরুষ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ধূমপানকারী। বিবাহিতা নারী অতিরিক্ত ধূমপান করলে নবজাত শিশুর ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে অনেক কম হওয়ার আশংকা অত্যন্ত বেশী—এমন কথাও ঘোষণা করেছেন আধুনিক কালের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা।

গ্রামে আজ মহাপ্রলয়। লোক সব ছুটা-ছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও আগুন লেগেছে নাকি? পাড়ায় চৌকিদার, এক প্রকাণ্ড লাঠি ঘাড়ে করিয়া, বিকট-রবে চেঁচাইতে চেঁচাইতে চলিয়াছে, —"সকলে বাড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ী শীঘ্র যাও,—আর বিলম্ব নাই।" কারু গঙ্গাযাত্রা হবে নাকি? মহেশমণ্ডল, চটীজুতা পায়ে দিয়া, মুড়িশেলাই চাদর কাঁধে ফেলিয়া, হনহন আসিতেছেন। চৌকিদার তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"আরে বড়-মোড়ল! আপনার এত দেরী কেন? ওদিকে যে সব ফুরিয়ে গেল। বাবু ভারি ব্যস্ত হয়েছেন।" মণ্ডল বলিলেন,—"এই আমি মাঝের পাড়ায় খবর দিয়ে, তাঁতিপাড়া যাচ্ছি—আড়াই প্রহরের এ দিকেত আর কর্ম্ম হবে না,—আমি কি আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি,—আমি তাঁতিপাড়ার নিমন্তণটা সেরে শীঘ্র বাবুর বাড়ি যাচ্ছি —তুই দক্ষিণপাড়া ডেকে আয়।" কি এ, বাবুর বাড়ি পিতৃশ্রাদ্ধ নয় ত?

# চিনিবাস চরিতামৃত

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

দশ মিনিটের মধ্যে রাস্তা দিয়া, দলে দলে লোক দৌড়িতে লাগিল। গ্রাম্যপথে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা দিল।

দেখিতে দেখিতে বাবুর বাড়ি লোকারণ্য হইল। বাড়িখানি অতি চমৎকার। বাহিরে একটি ভজন-কুঠারি—ছিটে-বেড়ার দেওয়াল। মেজে মাটির। তথাচ সেই ক্ষুদ্র জরাজীর্ণ, মৃত্তিকা-বাঁশ-খড়-কাঁথিসমন্বিত গৃহমধ্যে একটি টেবিল এবং একখানি চেয়ার বর্তমান। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম ও কাগজ। প্রায় চারিশত লোক একত্র; তাহারা কোথায় দাঁড়ায়, কোথায় বসে, তাহার কিছুই ঠিক হইল না। তথাচ গ্রামের সমস্ত লোক এখনও আসিয়া পৌঁছিল না বলিয়া, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

বাবুর গড়ন পাকসিটে; লম্বা ঢং; রংটা খাঁড়ি-মসুরির ডেলের মত; চুলগুলা কোঁকড়া-কোঁকড়া, চোখে চসমা। নাসিকার নিম্ন দিয়া গোঁফের রেখা ঈষৎ সমুদিত। দেহখানি বনাতের কোটে আবৃত। পায়ে ডবল-এ'টাকিন, হাতে রুমাল।

বাবু একলা-ঘরের যাদুমণি। আছে কেবল এক বুড়ী-মা—তা, সে হতভাগীর বেটী না-থাকারই মধ্যে। মাতার কর্তৃত্ব পুত্রের উপর একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বলা বাহুল্য, বাবু সর্বতোভাবে স্বাধীন।

বাবুর বাপের কৃষ্ণনগরে কাপড়ের দোকান ছিল। এই দোকানে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ থাকায়, তিনি কিছু সঙ্গতি করেন। প্রায় ষাট বিঘা নাখরাজ জমী খরিদ করেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজ-গ্রামখানি পত্তনি লয়েন। তিনি নিতান্ত মিতব্যয়ী ছিলেন;—লোকে বলে, এখনও বাবুর মায়ের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা আছে।

বাবু বহুকাল হইতে কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতেছেন। এবার এণ্ট্রেন্স পাস দিবার নিশ্চয় কথা ছিল।

এই গ্রামে এ পর্যন্ত 'ইংরেজী-পড়া' প্রবেশ করে নাই; বাবুই এ বিদ্যায় প্রথম ব্রতী। এত অল্প বয়সে, এত অধিক বিদ্যা উপার্জনের কথা শুনিয়া লোকে চমকিত হইল।

এই বাবুই আমাদের নায়ক—চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়। হঠাৎ চিনিবাস বাবুর ছিটেবেড়ার গৃহাভ্যন্তর হইতে, টং টং টং টং পেটা-ঘড়ি বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে "চুপ চুপ চুপ।" চিনিবাস দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, "তোমাদের জন্যই অদ্য আমার এ শ্রমস্বীকার। আমি গ্রাম্য-পথের দুর্দশা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি; রাত্রে চোকের জলে বুক ভাসিয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত নিষ্ঠুর, এপর্যন্ত একটি পয়সাও দেন নাই। অথচ প্রতি বৎসর আমরা সকলে গবর্ণমেণ্টকে পথকর দিয়া আসিতেছি। তোমরা নিতান্ত কাপুরুষ, তাই আজও এটি কা আদায় করিতে পার নাই। আমি ৫০০৲ টাকার জন্য রোডসেশ-কমিটীতে ইংরেজীতে এই দরখাস্ত লিখিতেছি। আপনারা ইহাতে সহি করিলেই টাকা পাইবেন।

"আর এক কথা। আপাতত এই পাঁচ শত টাকা আদায়ের জন্য কৃষ্ণনগর যাইয়া আমাকে তদ্বির করিতে হইবে—এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখাইতে হইবে, অতএব প্রথমে তদ্বিরের জন্য অন্তত ১০০৲ টাকা আবশ্যক। তোমরা অদ্য চাঁদা করিয়া এই টাকাটী তুলিয়া দিলেই কল্য আমি কৃষ্ণনগর যাত্রা করিব। এ টাকা দিলে, তোমাদের লাভ ভিন্ন লোকসান নাই; ৫০০৲

টাকা আদায় হইলে, তৎক্ষণাৎ সুদশুদ্ধ তোমাদের টাকা ফেরত দিব। বাকি ৩৭৫ টাকায় এ গ্রামে সুন্দর রাস্তাঘাট হইবে। অচিরেই শুভফল ফলিবে। তার পর, সেই দরখাস্তে নাম সহি করিবার ধুম পড়িয়া গেল। মহেশমণ্ডল প্রভৃতি দুই একটী

আর ঐ একশত টাকা পাইলে, আমি দেশে এরূপ রাজনৈতিক আগুন জ্বালিব, যাহা কখনই নিবিবে না। কল্য প্রাতেই আমাকে যাত্রা করিতে হইবে—অতএব আজ নাগাইদ সন্ধ্যা টাকা চাই।

"শেষ, তোমরা শ্রবণ কর ইংরাজী দরখাস্ত।" এই বলিয়া ইংরেজীভাষা অনভিজ্ঞ, গ্রামবাসীর নিকট চিনিবাস বাবু সেই দরখাস্ত উচ্চৈঃস্বরে পড়িলেন। মহেশমণ্ডল বলিল, অতি উত্তম লেখা হইয়াছে: ক্রমে সভাস্থ সকলেই বলাবলি করিল, বাবু যেরূপ তেজ কলমে লিখিয়াছেন, তাহাতে লোক ছাড়া পনর আনা উনিশ গণ্ডা লোক ঢেরা সই করিল। বেলা চারিটার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

বাবুর পাড়ার ব্রাহ্মণবংশীয়া কুলললনাগণ এমন সময় কলসী-কাঁখে নদীতে চলিল। মালতী, মোক্ষদা, মোহিনী, বৃন্দা, বিমলা, বগলা প্রভৃতি যুবতীগণ ধীরে ধীরে তালে তালে পা ফেলিয়া, গজেন্দ্রগমনকে লজ্জা দিয়া, পরস্পর মধুরালাপে বৈকালিক বায়ুকে আন্দোলিত করিয়া, নদী-সৈকতে উপনীত-প্রায় হইলেন। মালতী বলিলেন, "আহা, বেশ ছেলেটী!

সে দিনকার চিনিবাস. আজ ইংরেজীতে কথা কয়ে. লিখে. গ্রামের পথঘাট সব বাঁধিয়ে দিচ্ছে.—এমনি ছেলে হলেই মায়ের সুখ।"

বৃন্দা। তা বৈ কি দিদি—চিনিবাসের মা ত রত্নগর্ভা; ওবাড়ীর পরেশ. চিনিবাসের বয়সী—সে যদি আজ লেখাপড়া শিখতো—তা'হলে আর ভাবনা কি?

মোহিনী। আহা. হোক হোক.—বুড়ীর আর কেউ নেই—ঐ শিবরাত্রির সলতেটুকু ভরসা, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে. একশ বছরের হয়ে চিনিবাস বেঁচে থাকুক—

মেক্ষদা। চিনিবাস. দৈতিাকুলে পেহ্লাদ—

বগলা। চিনিবাসের সবই ভাল. তবে মেয়ে-ছেলে. বউঝীর উপর একটু খর নজর আছে—

মালতী। না, না, না,—সে কথা বলো-না, দুধের ছেলে,—সে দিন হ'তে দেখলুম—ওর সে সব কোন দোষ নাই—

বৃন্দা। হ্যাঁ বয়েস কচি বটে;—তবে কি না জান, ওরা সহরের ছেলে. পাঁচটা দেখেচে, শুনেচে—

বিমলা। ঠিক বলেছ, বুন! এখন কি আর দিন কাল সে রকম আছে? ইংরেজী পড়লে ছেলে-পিলের চোখ মুখ শিগগির ফোটে—চিনিবাসের মাথায় চেরা-সিঁথি দেখ নাই?

বগলা। তোমরা কি ভাই কিছুই শোন নাই? তাঁতিদের রামমণির জন্য এবার সে সোণার চিক গড়িয়ে এনেছে —সাবান. তাস. পমেটম.—সব দিয়েছে—

মালতী। রামমণি আধবয়সী মাগী. কালপেঁচী—সেদিন বিধবা হলো.—তাকে কি ও-সব দেওয়া সম্ভব?

বগলা। তা জানিনে ভাই —আমিত ও-সব কথা. কর্তার মুখে কাল শুনেছি—

এই কথা কহিতে কহিতে রমণীগণ নদীজলে অবতরণ করিলেন।

রামমণি গ্রামের রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক রমণী কি না. জানি না; তবে এটা ঠিক্, চিনিবাস প্রত্যহ সন্ধ্যার পর রামমণির বাটীর দিকে চাহিয়া ব্রহ্ম-সংগীত আলাপ করিতেন। এবার একখানি ব্রহ্ম-সংগীত পুস্তকও তিনি লইয়া আসিয়াছেন।

সেই দিন বৈকালে ওদিকে ১০০ টাকা চাঁদা আদায়রূপ রাজনৈতিক কাণ্ড চলিতে লাগিল,—এদিকে ঠিক্ সন্ধ্যার পরই চিনিবাস. ভাবমগ্ন মহাযোগীর ন্যায়. সামাজিক-মহাসাগরে ডুব দিলেন। সেই ভজন-কুঠারির দ্বারে খিল দিয়া, জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া, ঠিক্ রামমণির বাটীর দিকে চাহিয়া. বাবু আড়খেমটায় ব্রহ্ম-সংগীত আরম্ভ করিলেন।

এমন সময় গৃহদ্বারে দুপদাপ ধাক্কা পড়িতে লাগিল;—"খোল ব্যাটা বামুন দোয়ার. তোর মাথটা আমি আজ লেঠিয়ে ভেঙ্গে ফেলবো? আজ তোর বামনাই কেমন থাকে দেখবো?

চিনিবাস। ডাকাত পড়েছে. ঘরে ডাকাত পড়েছে। ওহে রামধন, শীগ্‌গীর এসো (ধাক্কা দাতার প্রতি) কেহে তুমি, কি চাও?

ধাক্কাকারী। আরে মোশাই. রেখে দিন বিট্‌লিমী—ভদ্দর লোক হয়ে, গেরস্তর মেয়েছেলের উপর জুলুম; আজ সন্ধ্যাবেলা থেকে ঘরে বসে আমার বাড়ীর দিকে চেয়ে. কেবল কাঁচা খেঁউড় হচ্ছে—

চিনিবাস। কেহে. তুমি নিতাই

তাঁতি—ওসব ভাই কিছু মনে করোনা. আমি কেবল ঈশ্বরের নাম করচি—

পুনরায় দ্বারে আঘাত সজোরে।

চিনিবাস তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"দেখ নিতাই, আমি ভীরু, কাপুরুষ নহি—আমি তোমার লাঠিতে ভয় করি না। আজ যদি আমার দ্বারে ইংরেজের লক্ষ রাজনৈতিক লাঠি একত্রিত হইত, তাহা হইলে আমি এখনি দ্বার খুলিয়া অকাতরে মাথা পাতিয়া দিতাম। কিন্তু তোমার ঐ সমাজনৈতিক একটি লাঠিতেই আমি সংকুচিত হই। কারণ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা বিবাদ করে না—"

দেখিতে দেখিতে বহু লোক জড় হইল। গ্রাম মহা আন্দোলনে আন্দোলিত হইল।

পর দিন অতি প্রত্যুষে, কাক ডাকিবার পূর্বে, অরুণোদয়ের পূর্বে, বোধ হয় শুকতারা উঠিবার পূর্বেই, গ্রামনিবাসিগণ চিনিবাসের কথা লইয়া পরস্পর আলাপ আরম্ভ করিল। দক্ষিণপাড়ায় কেহ বলিতেছে, চিনিবাসের দোষ; কেহ বলিতেছে, রামমণির দোষ; কেহ বলিতেছে, নিতাই তাঁতির দোষ। কাহার মতে, কাল রাত্রে চিনিবাস খুব মার খেয়েছিল; কেহ প্রতিবাদ করিলেন, চিনিবাসের কেশাগ্রভাগও কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেহবা ঐ কথা অনুমোদন করিয়া বলিলেন—"তা'ত ঠিক্; চিনিবাসের গায়ে আঁচরটি লাগে নাই—কিন্তু নিতাই তাঁতিই আচ্ছা মার্ খেয়েছে।" যখন নিতাই তাঁতিরই মার্ খাওয়া সাব্যস্ত হইল, তখন একজন বলিল, "নিতাই পিঠে, ঘাড়ে, চুণে-হলুদ দিয়ে শুয়ে আছে।"

ব্রাহ্মণপাড়ায় গভীর বিচার আরম্ভ হয়েছে। হলধর স্মৃতিভূষণ বলিলেন,—"আমি কি সাধ করে ইংরেজী পড়িতে নিষেধ করি? ছেলেপিলে, সহর যেয়ে ইংরেজী পড়্লেই খারাপ হয়ে যায়। চিনিবাস দিবা ছেলেটি ছিল, আর দুমাস যদি আমার কাছে মুগ্ধবোধ পড়িত, তা হলে ব্যাকরণ একেবারে কণ্ঠস্থ হতো। ছোঁড়ার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ—যা একবার বলিতাম, তা আর কখন ভুলিত না—হুঁ! আজ্ কি না একটা তাঁতির মেয়ের সংগে তার অপবাদ হলো!

নীলাম্বর তর্করত্ন বলিলেন,—"ঘটনা কি যথার্থ? চিনিবাসকে অতি সুবোধ শান্ত ছেলে বলেই ত আমরা জানি; এই ছেলে-বয়সে তার পেটে এত কুবুদ্ধি ঢুক্‌বে কি? আমার বোধ হয় ইহা রটানে কথা।"

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ অপরাপর ব্যক্তিগণ ঈষৎ বিষণ্ণ হইলেন। যে কাণ্ড লইয়া তাঁহারা অদ্য প্রভাত হইতে এত আমোদ করিতেছিলেন,—তাহা যদি মিছে হয়, তাহা হ'লেত তাঁহারা একেবারে দাঁড়িয়ে মাটী! কি নিয়ে তাঁরা দিন কাটান এবং কোন্ সুখেই বা তাঁরা ঘরে ফিরে যান? রামমণি যদি সতী হয়, আর চিনিবাস যদি সৎ হয়,—তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রামবাসীর দুর্ভাবনায় অদ্য অন্ন রোচে কি না সন্দেহ! তর্করত্ন মহাশয় গ্রামবাসীর সুখে কণ্টক এবং অন্নে হন্তারক হইলেন বলিয়া সভাস্থ সকলেই তাঁহার উপর চটিয়া উঠিলেন। এক জন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে, চোখ্ দুটা কপালে তুলে, তর্করত্নকে রুক্ষ সম্বোধনে বলিল, "চাটুয্যে মোশাই! তোমার একি খারাপ স্বভাব? না জেনে, না শুনে, দুম করে একটা কথা

কওয়া ভালো কি? চিনিবাসের সঙ্গে রামমণির ঘটনা কার না জানা আছে?—ছি!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠিক্ কথাইত! যা রটে, তা বটে—

নীলাম্বর তর্করত্ন বলিলেন,—"আপনারা হঠাৎ রাগ করেন কেন? কোন বিষয় বলিতে হ'লে, তার আগে-পিছে ভেবে বলিতে হয়, হঠাৎ লোকের অপবাদ দেওয়া ভাল কি?—"

এই কথা তাঁহার মুখোচ্চারিত হইতে না হইতেই, সভায় একটা গোল উঠিল,—"তুমি কোথাকার পাগল? কোথাকার পাগল?" এমন সময় বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। তিনি চিনিবাসের প্রাণের বন্ধু; বয়স ত্রিশের কম নহে; গ্রামময়, চিনিবাসকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া বেড়ানই তাঁহার অদাকার কার্য্য। তিনি গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "কিসের গোল?—এত রাগের লক্ষণ কেন?"

তর্করত্ন বলিলেন, "এই দেখ, বাঁড়ুয্যে, সকলেই আমার উপর মারমুখী—আমি বল্‌চি, বিচার করে, চিনিবাসকে ফাঁসি দেও—"

বিধু। ঠিক্ কথা!—চিনিবাসের দোষ কি? গ্রামে আর একটা এমন ছোকরা জন্মালে গ্রামে আজ্ মিউনিসিপালিটী হতো!—তার অতি সাধু অন্তঃকরণ, অতি নিষ্পাপ শরীর; যাঁরা চিনিবাসের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি স্বচক্ষে কিছু দেখেছেন? (সম্মুখস্থ ব্যক্তির গায়ে হাত দিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি ঠিক্ বলো, উপরে চন্দ্রসূর্য, নীচে অগ্নি, নিজের চোখে তুমি দেখেচো কি না?" সম্মুখস্থ ব্যক্তি একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ঠিক্ নিজের দেখি নাই বটে, কিন্তু যা শুনেছি, তাতে ঠিক্ বলেই বোধ হয়—"

বিধু। শোনা-কথা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, আদালতে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। বিশেষ, একটি ভদ্রলোকের ছেলের নামে এমন কলঙ্ক কি শোনা-কথায় রটাতে আছে? চোখে দেখ,—ধর, তার পর পঁচিশ পয়জার মার, ঘার পেতে লইব!" সভাস্থ সকলের হার হয়-হয় দেখিয়া, একজন বলিলেন,—"বাঁড়ুয্যে যা বল্‌ক,—আমরা শুনেছি তা দেখার চেয়ে বাড়া;—রামমণি অমন ১৬৲ টাকা জোড়া শান্তিপুরে সাড়ী পেলে কোথা? পেড়েরই বা বাহার কি?—"

বিধুবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আপনি বড় মূর্খ দেখিতেছি। কেন মিছা আপনারা পরের ছেলের উপর দোষ দেন? আপনি কি দোকানদারের খাতা দেখে এসেছেন, শান্তিপুরে কাপড়খানির দাম ঠিক্ ১৬৲ টাকা! আর যদি ১৬৲ টাকাই হয়, তা হলে কি রামমণি চিনিবাসের ঘটনা অবশ্য সম্ভব? আপনি কি রামমণির হস্তে চিনিবাসকে ঐ কাপড় অর্পণ করিতে দেখিয়াছেন? যদিই দেখিয়া থাকেন, তা হইলেই কি সুপ্রমাণ হইল, উভয়ের মধ্যে কোন অসৎ সম্বন্ধ আছে? তর্কের খাতিরে মনে করুন আপনি স্বচক্ষে, সুস্থ অবস্থায় দেখিয়াছে, চিনিবাস, রামমণির কোমল করপদ্ম ধরিয়া, ঐ বস্ত্র অর্পণ করিয়াছেন। তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে, চিনিবাসের অভিসন্ধি মন্দ? আপনি ত এমনও মনে করিতে পারেন, অনাথা বিধবা ভগিনীর দুঃখে

গত হও—তৎক্ষণাৎ তোমার পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইবে। দাঁড়াইয়া কেন? শীঘ্র যাও—

শ্রীদাম। (যোড়হাতে) কোথা যাবো হুজুর?—

চিনিবাস। (স্বগত) অহো! কি বুদ্ধিশূন্যতা! আমি কি প্রকৃতই তবে বুঝাইতে অক্ষম হইলাম? তবে একবার সহচর রামকানাইকে ডাকি। (প্রকাশ্যে) দ্বারবান! দরোজা বন্দ করো—

আজ্ঞানুক্রমে দ্বারবান ফটক বন্দ করিল।

রামকানাই এখন কুসংস্কারাবচ্ছিন্ন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, চিনিবাসের কাছে গোপনে সমাজনীতিশাস্ত্রে আখড়া দিতেছেন। পাছে রামকানাইকে লোকে দেখে, এই জন্য ফটকের খিল বন্দ হইল। অবোধ মুচি এ তত্ত্ব বুঝে নাই।

রামকানাই কার্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, পরামর্শ মতে মুচিকে বলিল, "ওরে বেটা শোন—

মুচির তখন দুই চক্ষে দশধারা বহিতেছে।

কানাই। যদি কাঁদবি, এই এক ঘুষিতে তোর নাক ভেঙ্গে ফেলবো—

মুচি "বাপরে, মেরে ফেল্লেরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

চিনিবাস ক্রোধপরবশ হইয়া বলিলেন, "জল্‌দি, চাবুক লেয়াও; চাবুক লাগায়কে হাম ওস্কো সিধা করেংগে"—

চাবুকের নাম শুনিয়া সেই জরাজীর্ণ মুচি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল,—"দোহাই হুজুর, মাপ করুন, এমন কাজ আর কখনো করবো না—"

কানাই। ফের বল। করবো না—

শ্রীদাম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) করবো না—

কানাই। এই শোন—পাড়ায় পাড়ায় ঢেঁটরা দিতে পারবি—

শ্রীদাম। (চোখের জল মুছিয়া) আজ্ঞে হেঁ, তা খুব পারি,—ছিরকাল ঐ কাজ করে আসচি, তা পারবো—

কানাই। কি বলিয়া ঢেঁটরা দিতে হবে জানিস,—

শ্রীদাম। না। হুজুর না বল্লে কি করে জানবো:—

কানাই। তবে এই কথা ঢেঁটরায় বলবি— 'কার্ক্কনগরীয় কুললনাগণের নিকট"—এই কথা বল, এইবেলা শিগ্‌গির মুখস্থ করে ফেল—

শ্রীদাম। (জোড়হাতে) হুজুর আবার বলুন, ভাল বুঝিতে পারি নাই।

কানাই। আঃ বড় জ্বালাতন করলি যে, ফের শোন,—"কার্ক্কনগরীয়—"

শ্রীদাম। আঁ, আঁ, কি বল্লেন—

চিনিবাস তখন একগাছা চাবুক হাতে লইয়া, শ্রীদামকে বেষ্টন করিয়া, ঘুরিতে লাগিলেন।

কানাই। বার বার এই বার শেষবার,—এবার না বলতে পাল্লে, তোর পিঠের চামড়া থাকবে না, বল, কার্ক্কনগরীয় কুল-ললনাগণের নিকট নিবেদন"—বল—বল---

শ্রীদাম। (সভয়ে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) কুরুণ্টেনুগুরে কুল্‌লুল্‌লুল্‌লু-লু—আজ্ঞে, আজ্ঞে— তারপর— বলচি এই যে!—

চিনিবাস। বদমাইস! নিশাচর। পাষণ্ড! বাদক-কুলকলঙ্ক। দেখিতেছি, তোর হৃদয়পদ্মে একটী ফোঁটাও বুদ্ধি-মধু নাই—এই পদাঘাতই তোর পক্ষে উপযুক্ত। এই বলিয়া বীরশ্রেষ্ঠ চীনবাসবাবু ক্ষীণাংগ মুচির বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিলেন।

নিদারুণ পদাঘাতে শ্রীরাম পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। তখন মাণিক-খানসামা নীচে নামিয়া, মুচির মাথায় আর এক লাথি মারিয়া বলিল, শ্যালা, যেমন কর্ম তেমনি ফল,— খবরদার! আর এ বাড়িতে আসিস না।"

এমন সময় স্বয়ং মাজিস্টর, নবীনবাবু, ঘোষাল মহাশয় এবং প্রায় কুড়িজন ভদ্রলোক চিনিবাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃষ-উৎসর্গ ব্যাপার! মহাসমারোহ কাণ্ড! প্রতিবেশীমণ্ডলী চমকিল।

স্বয়ং মাজিস্টর সেদিন প্রাতে চিনিবাস-গৃহের সর্বস্থান অন্বেষণ করিলেন। উপর, নীচে, ছাদ, পাইখানা তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেন, তথাচ নবীনবাবুর কন্যা কল্যাণীকে পাইলেন না। নবীনবাবুর মুখে আর কথা নাই, চারদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মাজিস্টর একটু বিরক্ত হইয়া নবীনবাবুকে বলিলেন,— "দেখুন, আপনি উকীল আপনার কথাতেই বিশ্বাস করিয়াই আমি ভদ্রলোকের ঘরে প্রবেশ করিলাম,—কিন্তু আপনার কন্যা ত নাই!"

নবীন। কাল রাত ৮টা পর্যন্ত আমার মেয়ে এখানে ছিলো, এ কথা আমি ঠিক জানি, বোধ হয় হঠাৎ কোথায় সরিয়ে ফেলেছে,—

মাজিস্টর। সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর নাতি রামধনই বা কোথায়?

নবীন। সকলেই কাল রাত্রে এখানে ছিল,—বোধ হয়, কোন রকম সন্ধান পেয়ে তারা এ বাড়ি থেকে পালাইয়াছে।

মাজিস্টর আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ সংবাদ তোমার পূর্বে রাখা উচিত ছিল, সুধু সুধু আমাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হয় নাই—আমার পরিশ্রমের মূল্য কত জান? চিনিবাসবাবু নির্দোষ হইতে পারেন!" এই কথা বলিয়া মাজিস্টর সদলে চলিয়া গেলেন।

ঘোষাল মহাশয়ের খবর নবীনবাবু জানিতেন না, কিন্তু ঘোষাল অদ্য সুযোগ পাইয়া গোলমালে চিনিবাসের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন।

মাজিস্টর বহুলোক সমভিব্যাহারে চিনিবাসের ঘরে প্রথম পা দিবামাত্র রামকানাই বাপকে সর্বপশ্চাতে দেখিয়া, অদূরবর্তী নিচু-তলায় গিয়া ধীরে ধীরে লুকাইল। মাজিস্টর কনেষ্টবলগণকে বাড়ি ঘেরিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং দ্রুতপদে উপরিতলায় উঠিয়া গেলেন।

এ দিকে ঘোষালমহাশয়, নিচুতলাপানে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। তিনি কানায়ের মুখটী দেখিতে পান নাই! কেবল পা দুটী দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল। পিতার চোখে কতক্ষণ ধুলা দিয়া রাখা যায়। তখন ঘোষাল পা পা করিয়া সেই দিকে চলিলেন। কানাই ভাবিল, বড়ই বিপদ! যেমন সে নিচু-তলা হইতে মুখ বাহির করিয়া বাপকে দেখিবে, অমনি ঘোষালমহাশয়, "তবে রে পাজি, ডকাত, বদমাইস্"—এই কথা বলিতে বলিতে দৌড়িয়া গিয়া, একেবারে বজ্রমুষ্টিতে পুত্রের হাত ধরিলেন। ক্রমে ক্রমে অধীর হইয়া, তিনি বেছুট গালাগালি দিতে লাগিলেন।

ঘোষাল, আপন মনে সেইরূপ বেছুট বকিতে বকিতে, পুত্রের হাত ধরিয়া, হড়্ হড় করিয়া সেই দিকপানেই টানিয়া আনিতে লাগিলেন। ঘোষালের সেই "কুরুচিপূর্ণ" কথা শুনিয়া এবং কুরুচিটা

সেই দিকেই আসিতেছে দেখিয়া, কুঞ্জমালা যেন ঈষৎ চমকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মুচিটা তখনও সেইরূপ চোন্দপোয়া হইয়া শুইয়া আছে। কুঞ্জমালা তখন ঘোষালকে উদ্দেশ করিয়া নাকিসুরে যেন ঈষৎ কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ গা পুরুষ! আপনি এত কুরুচি বলিতেছেন কেন। আমি যে ও-কথা শুনে এখনি মূর্চ্ছা যাব!"

ঘোষাল ক্রোধে দন্ত কিটিমিটি করিয়া বলিলেন,—"শুধু মূর্চ্ছা কেন, একেবারে মরে যাওনা যে, আপদ যায়?"

কুঞ্জমালা। (উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) অহহ! আ-মি ভ-গি-নী—ত-বে এ-ই আ-মি মূ-র্চ্ছি-ত হ-ই-লা-ম। (কুঞ্জমালার পতন ও মূর্চ্ছা)

শ্রীরাম মুচি এতক্ষন নীরব ছিল। ঘোষালমহাশয়কে দেখিতে পাইয়া তাহার একটু সাহস হইল। কুঞ্জমালা তাহার গা ঘেঁসিয়া ধড়াস্ করিয়া পতিত হইবামাত্র, মুচি বিকট চীৎকারে "বাপ্‌রে" বলিয়া বেগে উঠিয়া পড়িল।

ঘোষাল। একি এ? শ্রীরাম এখানে যে?

শ্রীরাম। আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল।

ঘোষাল। তুই যেমন পাগল, তেমনি তার ফল হয়েছে! তুই এখান থেকে একেবারে চলে যা না? তোকে কে কি বলে দেখি?

ঘোষালের উৎসাহপূর্ণ কথায় শ্রীরাম শরীরে বল পাইয়া দৌড়িল। ঘোষাল, পুত্রের হাত ধরিয়া, মহাদম্ভে চলিলেন। কাহারও তখন নিষেধ করিবার শক্তি ছিল না। কেবল মূর্চ্ছিতা কুমারী কুঞ্জমালা শুয়ে শুয়েই ঝিম আওয়াজে বলিলেন, "ভাই কানাই! তুমিও কি চলিলে? আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবে কে?"

মাজিষ্টরের খানাতল্লাসির পর, চিনি-বাস সহসা আর দ্বিতল হইতে নীচে নামিলেন না। কাজেই কুঞ্জমালা এবার আপনা-আপনিই মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িলেন। অবশেষে তিনি অদূরে মাণিক-খানসামাকে দেখিয়া তাহাকে ডাকিলেন; মাণিকের বুকপকেটস্থ সেই গোলাপফুলটি লইয়া মাথার খোঁপায় গুঁজিয়া হেলিয়া দুলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

বন্ধু-মনোমোহনকে ভুলিলে চলিবে না। তিনি বহু-পুরুষে উন্নতিশীল। তাঁহার ঝী-টী পর্যন্ত লিবারেল; খান-সামাটি র‍্যাডিকাল; আর স্বয়ং বাড়ির কর্তাটি উন্মাদ! কেবল শ্বশুরপ্রদত্ত গাভীটা কেন জাতীয়—লিবারেল, কি কনসারবেটিব, তাহা আজও ভাল ঠিক হইল না। মনোমোহনের বড় দুঃখ যে, অশিক্ষিত গাইটা আজও ফাউলকারির মর্ম বুঝিল না।

মনোমোহনের সংশিক্ষায় স্ত্রীটি আজও একটুও সভ্য হইয়া উঠেন নাই;—ইহাই তাঁহার চরম দুঃখ। স্ত্রীর নাম গিরিবালা। গিরিবালা বুদ্ধিমতী, চতুরা, গৃহকার্য্যতৎপরা স্বামীসেবানিরতা। মনোমোহন কেবল স্ত্রীর নিকট জব্দ। স্পষ্টবাদিনী স্ত্রীর কাছে বাবুর টুঁ শব্দ করিবার যো নাই। রাত্রি ৮টার সময় এক গা ঘামিয়া, দিবসের কার্য শেষ করিয়া, মনোমোহন ঘরে আসিলেন। গায়ের উপরি উপরি তিনটা পিরিহান; পায়ে ডবল গটকিন; পকেটে রুমাল।

গিরিবালা। জ্যৈষ্ঠমাসের এ গুমট গরমে গায়ে এতগুলো জামা কেন? সুধু

চাদর গায়ে দিয়ে বেড়াতে গেলেই ত হয়!

এই বলিয়া স্ত্রী সর্বাগ্রে পায়ের এণ্টাকিন খুলিয়া দিলেন।

পড়িলেন। এণ্টাকিন গেল, জামা গেল, অসময়ের ধন চসমাটুকু ছিল, শেষে তাহাও গেল। প্রায় ১৫ মিনিট কাল

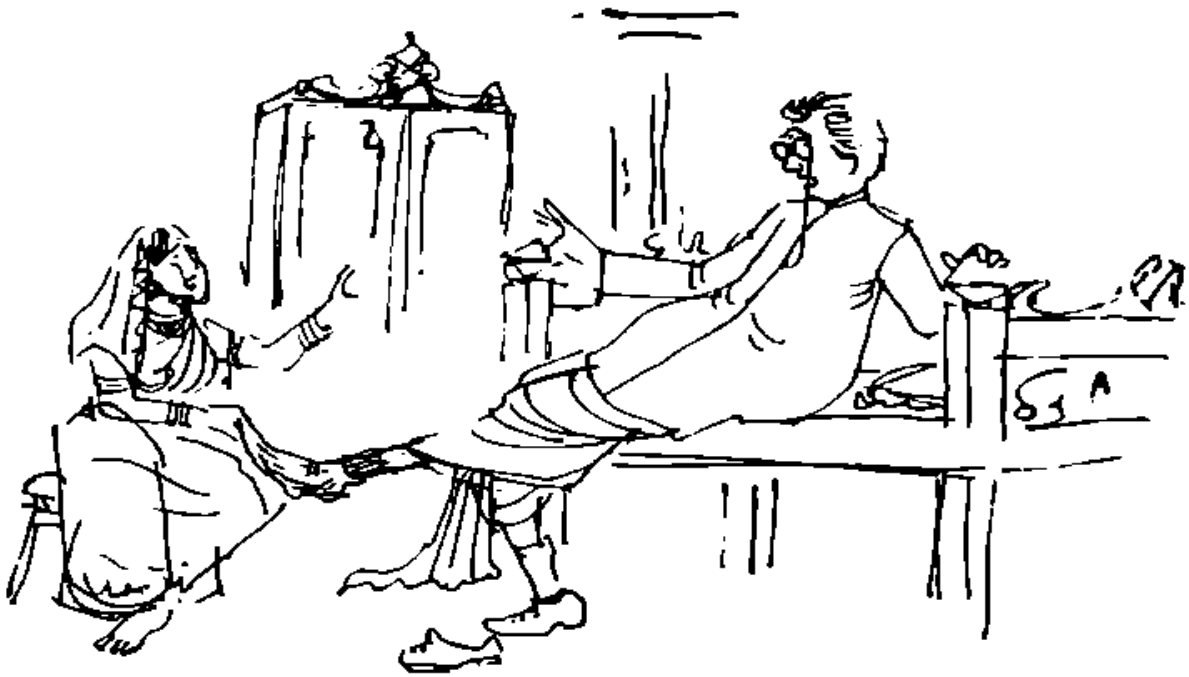

এ° এ° এণ্টাকিনটা খুলে ফেললে বটে!

মনোমোহন। এ° এ°— এণ্টাকিনটা খুলে ফেল্লে বটে!

গিরিবালা। এখনি যে সর্দিগরমি হয়েছিলো, জামাগুলো খোল বল্‌চি—

বাবু কি করেন, অগত্যা জামা খুলিয়া ফেলিলেন। স্ত্রী তখন একটা পাখা লইয়া, বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। একটু সুস্থ হইলে, স্ত্রী ধীরে ধীরে, অতর্কিত ভাবে স্বামীর নাক হইতে টুক ক'রে, চসমাটি তুলিয়া লইলেন।

মনোমোহন চসমা অভাবে দুর্বল হইয়া নীরবে থাকিয়া বাবু গম্ভীর এবং সকরুণ স্বরে বলিলেন—

"প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে! আমার একটি প্রস্তাব আছে,—তুমি আমার প্রস্তাব রক্ষা করিবে কি?"

গিরিবালা। ভাল করে বল না, কি কত্তে হবে? অমন সংস্কৃত ভাষায় কথা কেন?

মন। আমার ইচ্ছা যে, তুমি স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং ডাইভোর্স সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখ। চিনিবাসবাবু এজন্য আমাকে

বড়ই ধরিয়াছেন। ইহাতে দুইশত টাকা পুরস্কারও আছে—

গিরি। পোড়া কপাল আর কি: আরবারে তোমার কথা শুনে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবন্ধ লিখিলাম, আমার সবচেয়ে বেশি হলো, প্রাইজ পেলে কি না, তোমাদের সেই রামমণি! সেই বামুনশুকনী, কাল-পেঁচী! এবার তিনিই আবার পরীক্ষা করবেন!—হায় হায়! আমি হয়ে মরি নেই কেন?

মন। তুমি ত আর আমার একটি কথাও শোন না।

গিরিবালা এইবার সুযোগ পাইয়া, গম্ভীর অথচ বিনম্র ভাবে বলিলেন, "আমি ত তোমার সকল কথাই শুনি, কিন্তু তুমি আমার একটীও কথা শুন কি? একদিনও কি আমার কথা রেখেছ?"

মন। (যেন ঈষৎ চমকাইয়া) প্রিয়ে! তুমি বলো কি? তুমি কি জান না, আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি?

গিরি। বল তবে, আমার কথা শুনবে?

মন। শুনবো।

তখন মনোমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং ডাইভোর্স সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবে ত?"

গিরি। (হাসিয়া) লিখিব।

মন। তোমার কি কথা, শীঘ্র বলো না—

গিরি। ধনঞ্জয় বাচস্পতিকে তুমি চেন কি?

মন। চিনি বৈ কি? তবে চেহারা দেখি নাই কখনো,—সে'ত ডাকাত; আজ এক মাস তার হাজত হয়েছে—সে দিন চিনিবাসবাবুর ঘরে সে ডাকাতি করে অনেক জিনিস পত্র লুট করেছিলো—

গিরি। আমি সব শুনেছি—তার পুত্র রামধনকে চিনিবাস কোথায় লুকিয়েছে,—বৃদ্ধ, ছেলে খুঁজিতে যান; চিনিবাস তাকে মেরে, শেষে ডাকাত বলে ধরিয়ে দিলে—

মনোমোহন শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার আর মুখ হ'তে কথা সরিল না। একদৃষ্টে ফ্যাল-ফ্যাল ভাবে গিরিবালার পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিরি। পণ্ডিত-মহাশয়ের স্ত্রী আজ সমস্ত দিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন; সারাদিন তিনি চোখের জল ফেলেছেন; আজ একমাস তিনি তাহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন,—কেবল দুধ আর গংগাজল খেয়ে আছেন!

এই কথা বলিতে বলিতে গিরিবালারও চোখ দিয়া দু এক ফোঁটা জল পড়িল। মনোমোহন তখনও নীরব, গম্ভীর, চিন্তাময়, মুখ বিশুষ্কপ্রায়। তিনি তখন একবারমাত্র মুখ ফুটিয়া গিরিবালাকে বলিলেন, "আজ আমার বড় ঘুম পেয়েছে; মাথাটাও ধরেছে। আমি এখন ঘুমাব কি? কাল তোমার সব কথা শুনবো।"

গিরি। আজই কি, আর কালই কি—কোন দিনই আমার কথা তোমার শুনে কাজ নাই। তুমি আমার কথা কবে শুনেছ?

মন। (আমতা আমতা স্বরে) না না, —তা, বলচি কি? তা, বলি নাই!—তুমি বলিয়া যাও, আমি সব শুনবো—

গিরি। তুমি আমার পতি, আমার সাক্ষাৎ ভগবান, তোমার চরণে জোড়হাতে এই মিনতি কচ্চি, কাল তুমি এ মোক-

দ্দমায় চিনিবাসের হয়ে সাক্ষী দিতে যেও না।

মনোমোহন কোন কথা না কহিয়া, কেবল মুখটি লুকাইলেন।

শুনিলাম, তুমিই ঐ মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী। তুমি যদি সাক্ষী না দেও, তাহলে ব্রাহ্মণ খালাস পাবে।

মন। স্বয়ং চিনিবাসবাবু আমাকে বলেছেন; ডাকাতি সত্য। তাঁর কথা ত আর মিথ্যা হইবার নয়।

গিরি। দেখ, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কান্না দেখে, তাঁর অনাহারের কথা শুনে, আজ আমি এখনও জল পর্যন্ত খাই নাই। তোমার কাছ থেকে সু-খবর নিয়ে পাঠিয়ে দিলে, তবে ব্রাহ্মণী দুধ গঙ্গাজল খাবেন। তাঁর খাওয়া শুনলে, আমি তবে খাবো। তুমি আমাকে স্পর্শ করিয়া বল যে, মোকদ্দমায় সাক্ষী দিব না,—আর চুপ করিয়া থেকো না—বুড়ী যে ওদিকে না খেয়ে ভেবে ভেবে মরে গেল!

মনোমোহন আবার সেইরূপ হেঁট-মুখে নীরব হইয়া রহিলেন। নড়ন চড়ন নাই, চক্ষের পলকও বুঝি পড়ে নাই,—যেন কাঠের পুতুলবৎ তিনি অবস্থিত।

গিরি। এখনও যে চুপ করে রইলে? আমি যোড়হাতে বলচি, তুমি বল, "আমি সাক্ষী দিব না।"

এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, "মা! আবার সেই বুড়ি-বামণী এসেছে।" রাত্রি তখন দশটা। গিরিবালা শীঘ্র তাঁহাকে আনিতে গেলেন। ওদিকে একটা চিনি-চিনি পরিচিত-গলা, মনোমোহনকে ডাকিতে—লাগিল,—"বন্ধু, বন্ধু, ও বন্ধু! একবার শুন হে বন্ধু!"

গিরিবালা মধ্যপথ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, "খবরদার! তুমি সাড়া দিও না,—সেই পোড়ারমুখো, চিনিবাস এসেছে—খবরদার বলচি তুমি উঠ না,—"

গিরিবালা সেই বৃদ্ধা, জীর্ণা, অনশনা ব্রাহ্মণীর নিকট গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী পতিতা, স্থির-কলেবরা। তাঁহার বাম রগ দিয়া অবিরাম রক্তধারা বহিতেছে। মুখে কথা নাই, শরীর ঠাণ্ডা। গিরিবালা তাঁহার শিরোদেশে বসিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশ আরও চাপ চাপ রক্ত পড়িতে লাগিল। গিরিবালা এদিক ওদিক চাহিয়া অদূরে একটী রক্ত-মাখা ঢিল দেখিতে পাইলেন। ঢিলটী কুড়াইয়া আনিয়া দেখিলেন,—ইটের নয়, পাথরের। ভাবিলেন, বৃদ্ধাকে কেহ ঢিল মারিয়াছে না কি? আবার তিনি বৃদ্ধার গায়ে হাত দিলেন,—গা বরফবৎ হিম;—চক্ষের পলক নাই। তখন তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। স্বামী মনোমোহন নিকটে আসিলেন। গিরিবালা বলিলেন, "সর্বনাশ হইয়াছে, তুমি শিগ্‌গীর ডাক্তার ডাক।"

তখন মনোমোহন আবার সেইরূপ বেশ-ভূষা করিয়া, যেন অতি প্রফুল্লচিত্তে ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইলেন। যাইবার সময় গিরিবালা, স্বামীর সম্মুখে গিয়া, হাত ধরিয়া, আবার বলিলেন, "শিগ্‌গীর ফিরো।"

স্বামী গৃহের দ্বার পার হইবামাত্র, বাটীর বাহিরে অদূরে একটা হাসির বিকট রব উঠিল। গিরিবালা সে শব্দ কাণ খাড়া করিয়া শুনিলেন,—চিনিবাসের গলার আওয়াজ পাইলেন। ঝিকে তিনি বলিলেন,—"কি, দেখোত, এ রাত্রে কারা

অমন কচ্ছে?" ঝি, দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বাইরে কেউ নেই, একখানি গাড়ি গড়গড়িয়ে চলে গেল।

তখন গিরিবালার মনে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিল। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, চিনিবাসই কি বৃন্ধার রগে পাথর মারিয়াছে? স্বামীকে কি চিনিবাস গাড়িতে তুলিয়া লইয়া পলাইল?

রাত্রিশেষ যে, প্রাণবায়ু বাহির হইয়াছে, গিরিবালা তখনও বুঝেন নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে দুধ আর গঙ্গাজল, অল্প অল্প বৃন্ধার মুখে ঢালিতেছেন; কিন্তু তাহা উদরস্থ না হইয়া চেয়ল বহিয়া বাহিরে পড়িতেছে। ডাক্তার লইয়া স্বামীর আসিতে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, স্ত্রীর প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে এক ঘণ্টা অতীত হইল,—তথাচ মনোমোহন ফিরিল না। নিরাশায়, ভয়ে গিরিবালার বুক ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই কাল-রাত্রে তৃতীয় প্রহরে কৃষ্ণনগরবাসী নিদ্রিত। কেবল দুইটী ঘরে, বিশেষ কার্য্যানুরোধে, আজ জাগরণের পালা। গিরিবালা একাকিনী, মৃতদেহের কাছে বসিয়া ভাবিতেছেন, কাঁদিতেছেন, উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন,—স্বামীর পথপানে চাহিয়া আছেন। ওদিকে চিনিবাসের গৃহে আজ আনন্দময়ের আনন্দ-মহোৎসব চলিতেছে। দ্বিতলের হলে খোল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন হইতেছে। আজ স্বয়ং রামমণি যোগদান করিয়াছেন। বিমলা, কমলা, কুঞ্জমালা—সকলেই উপস্থিত। রামকানাইও পিতৃগৃহ হইতে তৃতীয়বার পলাইয়া আসিয়া আজ হাজির। ঐ যে রামধন, মনোমোহন, সকলকেই দেখিতেছেন! ক্রমে সকলে নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

শেষে ভাবে গদগদ হইয়া হঠাৎ কুঞ্জমালা মূর্চ্ছিত হইলেন। চিনিবাস বলিলেন, "ভ্রাতা কানাই! তুমি কুমারীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা কর।"

কানাই। তথাস্তু।

তৎক্ষণাৎ কুমারী কুঞ্জমালাকে গৃহান্তরে প্রবিষ্ট করান হইল। এই সঙ্গে সঙ্গীতও থামিল। চিনিবাস, বন্ধু-মনোমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! এই কানাই বালকটী রত্ন-বিশেষ! ইনি অতীব পবিত্রনেতা, সংসারতত্ত্ব-অভিজ্ঞ, কর্ম্মঠ, সাহসী এবং প্রতিজ্ঞা-প্রিয়। এ স্থান হইতে রামকানাই কতবার পিতা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ভাই-কানাই কিছুতেই দৃকপাত করেন নাই। ধর্ম্মের মহিমা উজ্জ্বলরূপে কীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি মম গৃহে তৃতীয়বার পদার্পণ করিয়াছেন।

মন। ইহা অতি সুন্দরী কথা! কোকিলকূজিত কোমলকমনীয়-কলকলায়িত-কণ্ঠ-কবিতাকুঞ্জ—(একটু ইতস্তত ভাব)

চিনিবাস। বেশ, বেশ—বলিয়া যাও, —অতি উত্তম কায়দা!

মন। কালের করাল কোদণ্ড কটকটায়িত কুটীর-কুট্টিমে কুলকামিনীর কেশ-কলাপ (ভাই চিনিবাস! আর যে পারি না।)

চিনিবাস। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার দোষ নাই, উহা বাঙ্গালীর ভাষার দোষ।

সেই জন্য শ্রীশ্রীমতী রামমণি দেবী আজ-কাল সংস্কৃতে কেবল কথা কহেন--

রামমণি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া সংস্কৃতে বলিলেন,—

যোধোবাণি পরিত্যজ্য অধোবাণি নিষেবতে।
ধোবাণি তস্য নশ্যন্তি অধোবং নষ্টমেবহিং॥

মন। সাক্ষীটা পরশ্ব দিলে কি চলিবে না? ১২ পৃষ্ঠা কাগজ আমি এত অল্প সময়ে মুখস্থ করিতে পারিব কি?

চিনিবাস। রামকানাই ত দিবা মুখস্থ করিয়াছে: তুমি অক্ষম হইবে কেন?

মন। সময় কৈ? প্রভাত হইয়া আসিল। দশটার সময় আদালতক্ষেত্রে উপনীত হইতে হইবে—ইহার মধ্যে এক-বার বাড়ি যাইতেও হইবে! বৃদ্ধা ব্রহ্মণীর কি দশা ঘটিল, তাহা একবার দেখা উচিত নয় কি? ভাই! তোমার হস্তের ঢিল ব্যর্থ যাইবে কি?

চিনিবাস। ভাই! তুমি বড়ই ভ্রমপথের পথিক। আমি ঢিল মারি নাই। নিরাকার ঈশ্বরই ঢিলটী মারিয়াছেন,—সকলি ঈশ্বরের আদেশ। তিনিই আমার হাত হইতে ঢিলটী লইয়া বৃদ্ধাকে আঘাত করিয়াছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র।

রামমণি। সত্যং সত্যং—তুয়ি হৃদি-কোষং যথা নিযোস্বিং তথা করামিং—

চিনিবাস। সাধুবীং! সাধুবীং!

মন। বটেং বটেং—

সভা ক্রমে সংস্কৃতময় হইয়া উঠিল। চিনিবাস তখন বন্ধু মনোমোহনের হাতে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ভাবি। তুমি আমার কথা রক্ষা কর। অদ্য মহাচিত্তের একটু লক্ষণ দেখাও। ধর্ম্মের জন্য গৌরাঙ্গ একদিনে সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। আর আজ তুমি ধর্ম্মের জন্য গৃহে গমন না করিয়া থাকিতে পারিবে না কি? স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা লইয়া যাহারা সং-সারজালে জড়িত, তাহাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি হয় না। তুমি! মোহমায়া পরিত্যাগ কর। কল্য দশটার সময় আদালতে গিয়া বাচস্পতি ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও—সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত হউক।"

মন। ভাই! তোমার আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করি না—তবে কি না, ঘরে স্ত্রী—

চিনিবাস। স্ত্রী কি? যে স্ত্রী, পতির স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাঘাত দেয়, সে স্ত্রীনামের উপযুক্ত নয়—তুমি এখনি তাহাকে ডাই-ভোর্স করিতে পার—

মন। না, না,—তা, নহে। আমি কালই সাক্ষ দিব। ঐ ১২ পৃষ্ঠা হাতের লেখা মুখস্থ করিতে অদ্য বড়ই কষ্ট হইবে।

চিনিবাস। ভগিনী বিনোদিনী মুখস্থ-বিষয়ে অদ্য রাত্রে আপনার সহায় হইতে পারেন—

তখন বিনোদিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "শেষরাত্রে জাগিয়া শিক্ষা দিতে হইলে, প্রথমত, আমার সেই লালবর্ণ জলীয় ঔষধ সেবন আবশ্যক—"

চিনিবাস। তাতে আপত্তি নাই—মাত্রা বেশী না হইলেই হইল,—ইহাতে শুদ্ধি-সাধিনী সভার নিয়ম ভঙ্গ করা হয় না।

কলিকালে ইংরেজরাজত্বে ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি। সুতরাং দায়রার বিচারে ধনঞ্জয় বাচস্পতির তিন বৎসর মেয়াদ হইল। মনোমোহন, রামকানাই, কুঞ্জমালা, চারিজন দ্বারবান্ এবং স্বয়ং চিনিবাস—

ইহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "হাঁ, আমরা ধনঞ্জয়কে ডাকাতি করিতে দেখিয়াছি।" পুত্র ননীগোপালও পিতা ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। পুত্রকে সাক্ষীর কাটরায় দেখিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। শেষে পুত্রের জোবানবন্দী শুনিয়া তিনি উচ্চরবে জজকে বলিলেন,—"আমি ডাকাতই বটি,—তবে এই এক অনুরোধ, কারাবাস দণ্ড না দিয়া একেবারে ফাঁসি দিন। আর আমার সাফায়ের সাক্ষী দিবার আবশ্যক নাই।—"

জুরীগণ একবাক্যে বলিলেন, "আসামী দোষী।" জজ রায় দিলেন, "আসামী বৃদ্ধ এবং অক্ষম; এবং ইহা তাহার প্রথম অপরাধ বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং তাহার তিন বৎসর সপরিশ্রম কারাবাস-দণ্ড-আজ্ঞা হইল।"

সেই দিন রাত্রে চিনিবাসের গৃহ আনন্দনিকেতন হইল। গৃহদ্বারে লাল কাপড়ে লেখা হইল,—"সত্যমেব জয়তে।" ছাদে ধ্বজা উড়িল, "ধর্ম্মের জয়।" কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।—

কলিকাতায় সেই লবঙ্গলতা পত্রিকায় প্রবন্ধ বাহির হইল,—আজ সত্যধর্ম্মের জন্য ননীগোপাল পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া পিতার তিন বৎসর কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা ঘটাইয়াছেন।

"ননীগোপাল বঙ্গের একটী উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। কুসংস্কার অন্ধকার ভেদ করিয়া তিনি আজকাল কেবল মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় দপ্ দপ্ দীপ্তিতেছেন। তিনি যেমন ন্যায়পরায়ণ, তেমনি কৃতকর্ম্মা। তাঁহারই গুণে কৃষ্ণনগরের ডাকাতদল কতকটা ম্লানমুখ হইয়াছে। উপস্থিত ডাকাত-ধরা কাণ্ডে সুযোগ্য পুলিস সাহেবকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

—শ্রীরমনীনাথ মিত্র।

ধনঞ্জয় বাচস্পতির জেলখানায় একমাসমধ্যে মৃত্যু ঘটিল।

পিতার মৃত্যুর পর, উপযুক্ত পুত্র ননীগোপাল একটা আনন্দভোজ দিলেন। কলিকাতার উইলসন হোটেল হইতে ৫০০৲ টাকার আহারীয় দ্রব্য কৃষ্ণনগরে গেল। বাচস্পতি ইহ-জীবনে যা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহার সমস্তই পুত্রকর্ত্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর-বিজয় সমাপ্ত হইল। চিনিবাস, রামধন, রামকানাই, ননীগোপাল, মনোমোহন, বিধুভূষণ, রামমণি, কল্যাণী, কুঞ্জমালা, বিনোদিনী, বামাসুন্দরী, বিমলা—সকলেই দিগ্বিজয় মানসে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ভবানীপুরে বাসা ভাড়া লওয়া হইল। শেয়ালদহ ষ্টেশনে অবতরণমাত্র কলিকাতার জনসাধারণ, অর্থাৎ ৭টী পুরুষ এবং ৫টী স্ত্রী—তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে ধ্বজা-পতাকা উড়াইয়া বাসায় লইয়া গেলেন। লবঙ্গলতা-পত্রে গ্রেট অক্ষরে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল, "১৫ই ভাদ্র শনিবার মহামহোপাধ্যায় পরম পণ্ডিত, তত্ত্বদর্শী, বিবেকী ঈশ্বরের প্রতিকৃতিস্বরূপ শ্রীযুক্ত চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার টাউন হলে 'সমাজসংস্করণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। জনসাধারণের আগমন প্রার্থনীয়।"

আজ ছয় দিন অতিবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। পুকুর, ডোবা, পথ, মাঠ, উঠান,

সমস্ত জলে একসা হইয়া তক্‌তক্‌ করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন পথ ঘাট ঈষৎ অন্ধকারময়! ধীর, গভীর স্বনে বায়ু বহিতেছে।

ঐ যে সম্মুখে একখানি কুঁড়ে ঘর—ছিটেবেড়ার দেওয়াল, কেশের ছাউনি, তালপত্তার আগড়, আর খুটী—ঘরের ভিতরে কাদা বলিলে অত্যুক্তি হয় না;—বৃষ্টির জল উপর দিয়া পড়ে, পাশ দিয়াও আসে, আর সম্ভবত নিম্নতল হইতেও জল উঠিতেছে। ঘরে আসবাব, সাজসরঞ্জাম কিছুই নাই; কয়েকটী পুরাণ ফাটা হাঁড়ি এক কোণে আছে, ঘরের উত্তরাংশে বাঁশের সীঙর উপর একখানি শতধা ছিন্ন, মলিন, কাপড় লুকাইতেছে; তাহার অদূরে গাম-ছাবৎ একটু ন্যাকড়ায় যেন কি একটা জিনিস বাঁধা রহিয়াছে। সেই সীঙর নীচে, ছিটেবেড়ার দেওয়ালের পাশেই একটী উনান জলে গলিয়া যেন দ্রব হইবার উপক্রম হইতেছে।

সেই ঘরের একমাত্র অধিকারিণী—একটী স্ত্রীলোক। বৃদ্ধা।

সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী, কুটীর মধ্যে একখানি কাঠের উপর বসিয়া তুলা পিঁজিতেছেন। তুলাগুলি যে কোথায় রাখেন, এমন স্থান একটুও নাই—ঘরের মেজেত কাদা। হঠাৎ একটু জোরে বায়ু বহায় কিছু তুলা আঁচল হইতে উড়িয়া গেল। বৃদ্ধা বড় বিব্রত হইলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দৌড়িয়া তুলা ধরিতে গেলেন; বৃদ্ধার পা পিছলিয়া গেল; ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া বৃদ্ধা গৃহমধ্যে পতিত হইলেন। আঁচলের তুলা ঘরময় ছড়াইয়া গেল।

বৃদ্ধা ভূলুণ্ঠিতা, তথাচ মূর্চ্ছিতা হইলেন না। কেবল তিনি ক্ষীণ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কম্পিতস্বরে বলিলেন, "বাবা চিনিবাস, তোর মা আর বেশী দিন বাঁচবে না—তোর একবার মুখটী দেখে মরবে"—এই কথা বলিতে বলিতে মায়ের চক্ষে জল আসিল।

একটী প্রতিবেশিনী বালিকা দৌড়িয়া আসিয়া,—"অ-বুড়ী, বুড়ী—তোর যে তুলো সব উড়ে গেল। এই নে, এত গুলো তুলো আমাদের ঘরে যেয়ে পড়েছিলো।"

এই কথা বলিয়া বালিকা কতকগুলো পেঁজা তুলা চিনিবাস-জননীর হাতে দিল। বালিকার বয়স তের; দুই বৎসর বিবাহ হইয়াছে; তাহার স্বামী কলি-কাতায় একটু মোটা মাহিনার চাকুরী করেন। বুড়ীর কুঁড়ের দশ হাত দূরে বালিকার পিতৃগৃহ।

চিনিবাস-জননীর দুঃখের সীমা নাই। আজ তিন দিন তাঁহার আহার হয় নাই; স্ত্রীলোকের বড় কঠিন প্রাণ, তাই তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন। কাল তিনি চাল ভিজাইয়াছিলেন,—কিন্তু তিনি চিবাবার মুখে দিয়া, আর খান নাই। গত পরশ্ব, শাক ও ভাত একত্র রন্ধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু উনান কিছুতেই জ্বল ধরিল না। আধফুটন্ত হওয়ার পর, একটা বেশি দমকে বৃষ্টি আসিল—এবং ছেঁদা চাল দিয়া জল পড়িয়া, একেবারে উনান নিবিয়া গেল। বৃদ্ধা ফুটন্ত ভাত একগ্রাস মুখে দিলেন, আর ভাতে হাত দিলেন না।

অদ্য তৃতীয় দিনে কিছুরই সংস্থান নাই,—একটু ন্যাকড়তে কেবল এক পোয়া খেঁসারির ডাল বাঁধা ছিল। আজ তাই তিনি ভোরে উঠিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছিলেন। তুলা ফুরাইয়া গেল,

অথচ এক পয়সার বৈ সুতা হইল না। সুতরাং আবার তুলা পিঁজিতে আরম্ভ করেন। বৃদ্ধার ইচ্ছা ছিল,—তিন পয়সার আন্দাজ সুতা কাটিয়া, পাড়ার তাঁতিদিগে বেচিয়া, মুদীর দোকান হইতে চাল নুন কিনিবেন। কিন্তু দুর্দান্ত পবন, তাঁহার এ সাধেও বাদ সাধিল।

পিতার মৃত্যুর পর, চিনিবাস যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার আজ কিছুই নাই। অসার সংসারে বিষয় বিভবকে অধিকতর অসার বোধে তিনি তালুক, লাখরাজ-জমী, বাড়িঘর পুকুর, বাগান, যা কিছু ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলেন। গ্রামে একঘর তাঁতি বড়মানুষ আছে, ঘরভীটা তাহারাই খরিদ করে। চিনিবাসের মা কৌশল্যাকে তাঁতিরা ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-কন্যার কান্না দেখিয়া, ব্রাহ্মণীকে তাঁতিরা ঐ ছিটেবেড়ার গোয়ালঘরটি প্রদান করে। কৌশল্যা ঐ কুটিরেই দুঃখকে সুখ করিয়া,—কেবল চিনিবাসের মঙ্গল-কামনায় বাস করিতেছিলেন। নিজের যা কিছু "ধুলো গুড়া" ছিল, তাহাই ভাঙ্গাইয়া চুরাইয়া দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন বিধুভূষণ বাঁড়ুয্যে গ্রামে আসিয়া কৌশল্যাকে বলিল,—"চিনিবাস বড় বিপদে পড়িয়াছেন; অন্তত নগদ হাজার টাকা না দিলে উদ্ধার নাই: ধনঞ্জয় বাচস্পতি তাঁহার বাটীতে ডাকাতি করায় তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন; ডাকাতির মোকদ্দমা উত্তমরূপ প্রমাণ না হ'লে চিনিবাসকে জেলে যেতে হবে,—এখন হাজার টাকা না দিলে চিনিবাস বাঁচে না, —এই তাঁর পত্র দেখ।"

এ কথা শুনিয়া কৌশল্যা কত কাঁদিলেন, কাটিলেন; বলিলেন, "হাজার টাকা আমি কোথা পাব?"

বিধুবাবু বলিলেন, "তবে চিনিবাস জেলে যাক।"

পুত্রের অশুভ সংবাদ পাইলে মায়ের মনের বেগ কি কখন থামে? বৃদ্ধার যা কিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল, সমস্তই বিধুর হাতে দিলেন—মোট হইল ১২৩৷৷৵৹ টাকা মাত্র। এক ছড়া দু-নর সোনার মালা সাড়ে ছয় ভরির ছিল—তাহাই ১০০৲ টাকায় বিক্রীত হইল। নগদ, ১৪৲ টাকা বৈ ছিল না; একখানি তক্তাপোষ, একটি ঘড়া, দু-খানি থাল এবং একটি সেকেলে বাক্স বেচিয়া ৯৷৷৵৹ হইল,—সুতরাং একুনে ১২৩৷৷৵ লইয়া বিধুবাবু চিনিবাসের নিকট যাত্রা করেন।

হাজার টাকার পরিবর্তে ১২৩৷৷৵ টাকা পাইয়া চিনিবাস একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন।

ক্রমে চিনিবাসবাবু সংহারমূর্তি ধারণ করিলেন। প্রলয়কালীন রুদ্রমূর্তিবৎ তাহার অঙ্গ দিয়া মহা-অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল।

প্রলয়-কালের সেই ভীষণমূর্তি দেখিয়া চিনিবাসের নিকট আর কেহই স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। রামকানাই, রামধন, ননীগোপাল ভয়ে চক্ষু মুদিলেন। রামমণি ধনী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া, চিনিবাসের মাথায় হাত দিয়া সংস্কৃতে বলিলেন—"শান্তং, শান্তং, শান্তং—ক্রোধং সংহরং প্রভোং।" অমনি পৃথিবী ঠাণ্ডা হইল। সমস্তই জলবৎ তরলং হইয়া গেল। তখন ঈশ্বর উপসনার পর, রামমণির সুপরামর্শে মহাত্মা চিনিবাস কৌশল্যা-ডাইনীকে এইরূপ পত্র লিখিয়া ডাকে

পাঠাইলেন: —"অয়ি! মায়াবিনি, দুষ্ট চরিত্রে, কুলকলংক-কারিণি! কুলসংসারবিনাশিনি! তোর মুখ দেখিলেও পাপ হয়। তোকে জননী সম্বোধন করিতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। আমি এক হাজার টাকা মাত্র দাবী করিয়াছিলাম,—কিন্তু কি জন্য সে টাকার আট ভাগের এক ভাগও দিলি না? অদ্যই ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতাম, কিন্তু কোন গরীয়সী মহিলার অনুরোধে তাহা ঘটিল না। তোর বড়ই অদৃষ্ট-জোর। অদ্য হইতে আমার প্রতিজ্ঞা তোর মুখও দেখিব না, আর তুই যে গ্রামে থাকিবি সে গ্রামেও পদার্পণ করিব না।—"

তোমারই একান্ত অনুগত—
শ্রীচিনিবাস।

এই পত্র যথাসময়ে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। বৃদ্ধার যদি কালেভদ্রে চিঠি আসিত, তাহা হইলে, সেই বালিকা পত্র পড়িয়া শুনাইত। বালিকা চিনিবাসকে চিনিত: সুতরাং ঐ পত্রের কথা গোপন রাখিয়া বালিকা বলিল, "ও বুড়ী! তোর ছেলে আছে ভাল; শীঘ্র বাড়ি আসবে লিখেচে: এইবার তোকে কলিকাতায় নিয়ে যেয়ে, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করাবে বলেছে।"

কৌশল্যা। "দিদিমণি! তেমন অদেষ্ট আমি করে আসিনি! বৃদ্ধার চোখে জল আসিল।

এইরূপ চোখের জলে আষাঢ় গেল, শ্রাবণ গেল, ভাদ্র আসিল; চিনিবাস তথাচ বাটী আগমন করিলেন না।

ওদিকে চিনিবাসের মাতা পুত্রকে ১২৩৷৷৵ টাকা পাঠানোর পর, একরকম, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। ভাত খাবার একটি থোরা ছিল, ক্রমে সেটিও তিনি বাঁধা দিলেন। শেষ সম্বল রহিল—একটি পিতলের ঘটী। এত দুঃখেও, বৃদ্ধা কাহারও প্রদত্ত অন্ন খান নাই।

বালিকার মায়ের নাম জগৎতারিণী। তিনি কতদিন বৃদ্ধাকে আহারের জন্য কত সাধ্যসাধনা করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি একদিনও তাঁহার গৃহে খাইতে স্বীকৃত হন নাই। তবে বালিকা মধ্যে মধ্যে মায়ের নিকট হইতে সাময়িক ফল মূল লইয়া আসিলে, বৃদ্ধা তাহা গ্রহণ করিতেন। শ্রাবণ মাসে বড় কষ্ট হইল। দিন আর যায় না। বৃদ্ধা সেই পিতলের ঘটীটি বাঁধা দিলেন। তুলা কিনিলেন। তুলা কাটিয়া গ্রামের তাঁতিবাড়ি বেচিয়া প্রত্যহ যে, দু তিনটি পয়সা পাইতেন, তাহাতেই কোন রকমে তাঁহার দিনপাত হইত। কিন্তু ভাদ্র মাসের সপ্তাহকাল ব্যাপী-অতিবৃষ্টিতে চিনিবাস-জননী ত্রিভুবন আঁধার দেখিলেন। এইত ব্যাপার। পূর্ব্ব ঘটনা ঐরূপ।

এদিকে কলিকাতায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। পথে পথে বিবিধ রঙ্গের ময়ূরপুচ্ছবৎ প্লাকার্ড। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে।

টাউনহলে

# মহাসভা—বিরাট বক্তৃতা

নিষ্কাম ধর্ম্ম

শ্রীচিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবার সন্ধ্যার পর

অতি সুললিত স্বরে

সুমধুর বক্তৃতা

করিবেন।

অদ্ভুত দৃশ্য! অদ্ভুত দৃশ্য! অদ্ভুত দৃশ্য!

এ সুবিধা কখন ছাড়িবেন না।

আসুন, আসুন, আসুন।

# শিক্ষিতা মহিলাগণের সঙ্গীত

এ সুবিধা কখন ছাড়িবেন না।

আসুন, আসুন, আসুন।

বিষয়

## "সমাজ-সংস্কার"

লবঙ্গলতা পত্রিকার ঐ ভাবেরই একটি "বিশেষ দ্রষ্টব্য" প্রকাশিত হইল। তবেই ইহাতে বেশির ভাগ এই লেখা ছিল, —"চারিটার মধ্যেই নরনারী সমাগমে টাউনহল পূর্ণ হইয়া যাইবে; যাঁহারা বিফল-মনোরথ না হইতে চান, তাঁহারা যেন চারিটার পূর্বেই আসিয়া স্থান অধিকার করিয়া লয়েন।"

তখন 'কেশবচন্দ্র সেন জীবিত ছিলেন। চিনিবাসের দলস্থ কয়েকটি বিজ্ঞ লোক তাঁহার নিকট গিয়া ধরিয়া বসিলেন, —অদ্যকার মহাসভায় আপনাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া গমন না করিলে, সমস্তই বৃথা," কেশব-বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সামাজিক কার্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি

আছে. কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ; সুতরাং যাইতে অক্ষম।"

বিজ্ঞলোকগণ তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিলেন। তিনি বলিলেন "বাপু! এ বয়সে আর আমাকে টানাটানি কর কেন? আমি ওসব কাজ অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি। আমাকে মাপ কর—দেশে অনেক বড় বড় লোক আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া যাও।"

ক্রমশ তাঁহারা শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ীর ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন। সেই সুধীর সৎ-প্রকৃতি রামতনুবাবু তাঁহাদের প্রস্তাব শুনিয়া বিব্রত হইলেন। তিনি অতি কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আমারত কোথাও যাবার যো নাই; ডাক্তার পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

"আপনাদের কথায় আমার যাবার বড় ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু এ কথা আমি একবার ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি যদি বলেন তবে নিশ্চয়ই যাব।"

এখানে অর্দ্ধ-আশা পাইয়া তাঁহারা কৃষ্ণদাস পালের নিকট গেলেন। কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় বলিলেন,—"আপনাদের সভায় বিষয় আমি কিছুই অবগত নহি; কি কি বিষয়ে আন্দোলন হইবে, তাহাও জানি না—সুতরাং এমত স্থলে আমার যোগদান করা অসম্ভব। অচ্ছা, তবে আপনারা সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত করুন,— আমি সমাজরূপে বুঝিতে পারিলে, অবশ্যই যোগ দিব। সৎকার্যে কে না সহানুভূতি দেখাইবে?"

তখন চিনিবাসের দল, নিরাশা-নীরে নিমগ্ন হইয়া চিনিবাস-সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো! নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সভায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না; আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।"

তখন চিনিবাস চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্গিরিলেন,—

অতি বৃদ্ধ, অতি বিজ্ঞ, সেকেলে প্রবীণ,
বালাভোলা বাহাদুরে, বিগত-যৌবন,—
বসা-চোখ,—কেরা চায়, হেন নরে আজ?
কুলে কালী কৃষ্ণদাস, সামাজিক কথা
কি বুঝিবে? সভাস্থলে ভ্যা ভ্যা গঙ্গারাম!
বিদ্যার সাগর বটে সেটা নামে;—কামে
কিন্তু চটী জুতা সার, ছিছি শিরে টীকি!
চুলে ধরকাটা প্রেমচাঁদ হায়!
থানের চাদর যার সম্বল সতত।
কেশব কেবল কথা, কাজে রাজী নয়;
বহুদিন আশালতা শুকায়েছে ওর।
লাহিড়ীর তরে সভা নহে লালায়িত,—
শোন-ফুলবনময় চুল যার শিরে।
আষাঢ়ের মেঘ মত গভীর গর্জ্জনে,
উচ্চকণ্ঠে ডাকি আমি বলি শতবার,
কাহারে না ডরি আমি; ডমরুর রবে
ভীত নয় কাল ফণি,—দীপ্ত দিনমণি
এবে; সভাতা আলোকে, আলোকিত মহী!
বেঁচে থাক ছাত্রবৃন্দ চিরজীবী হয়ে।

সেনাপতির উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সকলে কোমর বাঁধিলেন। পঞ্চকন্যা যথাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা হইয়া ঝলবতীবৎ ঝল ঝল করিতে লাগিলেন। তীর, তারা, উল্কা, বায়ুর মত চিনিবাস বেগে, সদলে, টাউনহলে আসিয়া পৌঁছিয়াই, আগমন বার্ত্তা ঘোষণার জন্য স্বয়ং ভেঁপু বাজাইয়া দিলেন। দূরস্থিত বালকবৃন্দের কর্ণে তাহা যেন সুধাবৎ লাগিল। বালকের মন পাখী উধাও হইয়া উড়িল।

কোন বালক, গৃহ-শিক্ষকের নিকট

পাঠ লইতেছিল; তেঁপুরব শুনিবামাত্র, সে পেটকামড়ানির ভান করিয়া, বাহিরে গেল;—আর ফিরিল না! কোন বালক উল্টা পিরিহাণ গায়ে দিয়াই বেগে ধাইল। দুই পাটি জুতা পায়ে দিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া কেহ বা একপাটি জুতা অর্দ্ধ-মাত্রায় পায়ে দিয়াই ছুটিল। কোন বালকের গায়ে পিরিহাণ নাই, কাঁধে চাদর নাই, এক ছুটেই চলিয়াছে। কোন বালকের পিতা, ছেলেটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে; বালক, পিতার বাহুদ্বয়ে বেষ্টিত হইয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রশিশুর ন্যায় কেবল ছট্‌ফট্ করিতেছে,—আর মুখে বলিতেছে, "আমাকে ছেড়ে না দিলে, আমি মরিব,—আমি আফিঙ খাইব।" চারি পাঁচ বৎসরের কতকগুলি বালক উলঙ্গ হইয়া, কয়েকটি বয়োবৃদ্ধ বালকের পিছু পিছু ছুটিয়াছে। তন্মধ্যে একটি বৃদ্ধ-বালক উলঙ্গের উদ্দেশ্যে বলিল, "ওরে ছেলেগুলো, তোরা ঘরে ফিরে যা—আমাদের সঙ্গে কোথা যাবি?"

ষোলকলা পূর্ণ হইল। চিনিবাস অলাঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ক্ষুধিতা বাঘিনী যেন সম্মুখে শীকার পাইয়া, লোভ লোলুপনেত্রে চারিদিকে দেখিয়া, দন্ত বিকাশ পূর্বক বদনব্যাদান করিল; অথবা কালনাগিনী যেন, ল্যাজে লগুড় প্রহারিত হইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া উঠিল। চিনিবাস চীৎকার-রাগিণীতে আরম্ভিলেন;—"ভদ্রমহিলাগণ! এবং মহোদয়গণ! ভারতে নাই কি? —ঐ দেখ, উত্তরপ্রান্তে সু-উচ্চে, সদুচ্চ, অত্যুচ্চ হিমালয়-নাম্নী মহতী গিরি মাথা খাড়া করিয়া দণ্ডায়মান,—এমন পর্বত কোথায়ও দেখিয়াছ কি? ইউরোপ খুঁজিয়া আইস, আমেরিকা, আফরিকা, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর—অষ্ট্রেলিয়ায় যাও,—এমন উচ্চ পর্বত কোথাও দেখিবে না! তাই বলি, ভারতে নাই কি? আবার নদীর দিকে দৃষ্টিপাত কর,—গঙ্গা, গোদাবরী, গোমতীর সহিত পৃথিবীর কোন্ নদী তুলনীয়া? ভারতীয় স্রোতঃস্বিনী যেরূপ সুলম্বা, সুন্দরী, সেরূপ আর কোথায়? (করতালি) মহা-

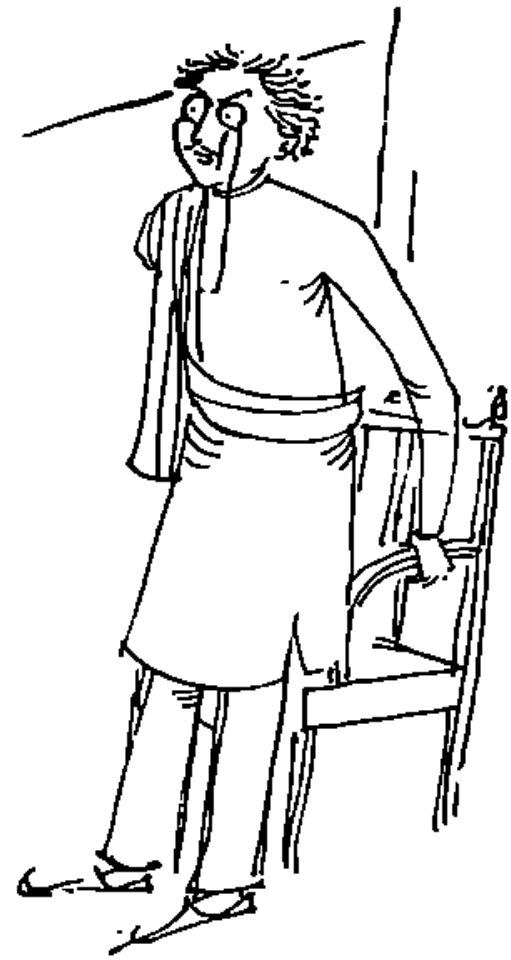

ক্রমে চিনিবাসবাবু সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন

সাগরের কথা কাহারও মনে পড়ে কি? বঙ্গোপসাগরের মত এমন তরঙ্গমালা-

সংকুল, সুপ্রশস্ত মহাসাগর আর কোথায় আছে কি? আর ওদিকে, উচ্চ গগনগর্ভে চন্দ্রের প্রখর উজ্জ্বল জ্যোতি তাকাইয়া দেখ।—বুঝিবে, এমন সুধাময়ী চাঁদ ভারত ব্যতীত আর কোথাও নাই। তাই বলি ভারতে নাই কি?

যদি সবই আছে, তবে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ কেন? (শোন, শোন) উদরান্নের জন্য আমরা পরের দ্বারস্থ কেন? ইহার একমাত্র মুখ্যতম কারণ—নারীজাতির অবনতি। (ঘন করতালি)। আবার বলি, নারীর অবনতি (করতালি।) চির-কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া আমরা মারা যাইতেছি। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-ব্যায়াম এবং বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ,—এ সব সুপ্রথা আমাদের দেশে আছে কি? ইউরোপে ইহা আছে বলিয়া ইউরোপ রাজা; ভারতে নাই বলিয়াই ভারত প্রজা। (ঘন করতালি)। আজই এ সুপ্রথা ভারতে সুপ্রচলিত হউক,—কালই দেখিবে, যাদুমন্ত্র-বলে ভারত সজীব হইয়া উঠিয়াছে। একটা বিষয় আপনারা প্রণিধান করিয়া ভাবুন,—স্বাধীনতা ব্যতীত, স্বাধীনভাবে যথাতথা বিচরণ ব্যতীত, রমণীকুলের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। একজন প্রসিদ্ধ মার্কিন ডাক্তারের ইহাই মত। অসুস্থ ছেলেও অসুস্থ হইবে, সুতরাং ভারতের আর আশা কোথায়? আর দেখুন,—ভারতের অনেক জমী এখনও পতিত আছে, গর-আবাদী নিবন্ধন শস্য কম হয় বলিয়াই ভারতবাসীর অন্নকষ্ট। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অনেক অতিরিক্ত সন্তান অবশ্যই জন্মিতে পারে। তাহারা তখন জঙ্গল-ভূমি আবাদ করিয়া ভারতের দুঃখবিমোচন করিবে। (করতালি) কোন কোন অল্পবুদ্ধি, অদূরদর্শী মানব বলিয়া থাকেন, "ভারতে পুরুষের সংখ্যা কম, স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক; এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য, ভারতে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমান, বরং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, পুরুষের সংখ্যাই অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চীন পরিব্রাজক হোয়েন্থশাং এ বিষয় বিশেষ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

জাতিভেদই যত অনর্থের মূল। আমি ব্রাহ্মণ বটি, কিন্তু আমার মন এমনই ভাবে গঠিত হইয়াছে যে, আমি চণ্ডাল বা তাঁতির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে ঘৃণা করি না। সমাদরে সসম্মানে, তাহাদের সহিত কোলাকুলি করি। ইহা সৎশিক্ষার একমাত্র ফল। তাঁতিজাতিকে অস্পৃশ্য বিবেচনায়, আমি যদি তাহার ছায়া না মাড়াই, তাহার সঙ্গে হাতধরা ধরি করিয়া না বেড়াই, তাহা হইলে কি উভয়ের মধ্যে কখন ভ্রাতৃভাব জন্মে? আর ভ্রাতৃভাব ব্যতীত উদ্ধারের কখনও আশা নাই। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে খুব নিগূঢ় ভ্রাতৃভাব ছিল বলিয়াই এক-স্ত্রী দ্রৌপদীতেই পাঁচজনেই উপগত হয়েন। অর্থাৎ ভ্রাতৃভাব থাকিলেই কিছুতেই আটক হয় না,—কিছুতেই দ্বিধা বোধ হয় না। (ঘন ঘন করতালি)। ভারতে সেই ভ্রাতৃভাবের অভাব—সেই ভাব—সেই মহাভাব, ভারতীয় নরনারীর মধ্যে এখনি প্রচলিত হউক—এখনি প্রচলিত হউক—আর বিলম্ব সহে না—সহে না—সহে না। (ঘন ঘন করতালি) অথবা বোধ হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষিত, সভা যুবক এবং যুবতী নির্বিকারচিত্তে এ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। (সভা হইতে,

হাঁ, হাঁ, করিয়াছি) (ঘন ঘন করতালি)।

ভারতীয় নরনারীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সতত আমার প্রাণ কাঁদে বলিয়াই এরূপ গলা চিরাইয়া, মুখে রক্ত উঠাইয়া, অতি চীৎকারে এ কথা ঘোষণা করিলাম। সেই ছিন্নভিন্নকেশা, মলিনবেশা, অনাথিনী, রমণীর দুর্দ্দশা দেখিলে কাহার না চোখ ফাটিয়া জল পড়ে? (করতালি) এ প্রশস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে এমন কি কেহ সামাজিক বীর নাই, এমন মহানুভব ব্যক্তি—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সুদূর গন্ধার হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে—কেহ কি নাই?—কেহ কি নাই? (ঘন ঘন করতালি। (সভাস্থল হইতে—আছে, আছে)"—

চিনিবাসের তিনটী চর টাউনহলের উপর নীচে চারিদিক ঘুরিয়া নানা বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন আসিয়া কি একটা কথা চিনিবাসের কাণে কাণে বলিল। বক্তার মুখ অমনি বিষম বিষণ্ণ হইল। গলার সুর ভাঙ্গিয়া গেল। বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল; সেই চরকে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সেই বৃদ্ধা পাপীয়সী যেন কদাচিৎ উঠিতে না পায়, তাহার বন্দোবস্ত কর—এবং সেই দুষ্কর্ম্মের সহায়কারী অঘোরবাবুকে চোর অপরাধে পুলিসের হাতে গ্রেফতার করাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।" চর তথাস্ত বলিয়া চলিয়া গেল।

চিনিবাস তখন ঝিম্ আওয়াজে বক্তৃতার উপসংহার আরম্ভ করিলেন।

অনেক কথা বলা হইল না। যে গ্রামে চিনিবাসের বাস, সে গ্রামের নাম বলিব না; সেই বালিকার নাম বলিব না, আর বলিব না,—সেই কলিকাতা-প্রবাসী বালিকার স্বামী অঘোর বাবু, কোন্ স্থানে কি চাকুরী করেন। এ সব কথা, অনেকের জিজ্ঞাস্য হইলেও নিগূঢ় কারণবশত তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

চিনিবাস, অঘোরবাবুর চক্ষে ধুলো দিয়া, ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া টাউনহল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অঘোরনাথ, অনেকক্ষণ চিনিবাসের অপেক্ষা করিয়া, শেষে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, বন্ধাকে লইয়া, ভগ্নমনে ঘরে ফিরিলেন। বৃদ্ধা কেবল কাঁদিলেন। "বাবা! চিনিবাস, তুই কোথায় গেলি", বলিয়া শেষে তিনি আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলেন।

সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা ধীরে ধীরে, চুপে চুপে, মরালগমনে আসিয়া, বৃদ্ধার চোখ টিপিয়া ধরিল। বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দিদিমণি! কল্‌কাতা এনেও তুমি বাছাকে আমার দেখাতে পারিলে না—তোমার দোষ কি?—এ সবই আমার অদৃষ্টের লিখন।"

বালিকা একখানা গামছা আনিয়া বলিল, "এইবার বুড়ীর মুখ বাঁধিব। অমন ক'রে কাঁদলে হাত পা বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিব।"—

বৃদ্ধার মুখে হাসি দেখা দিল। অতি দুঃখে মানুষ হাসে। তখন চিনিবাস-জননী কৌশল্যা উত্তর দিলেন,—"গঙ্গায় এখন হাত পড়লে ত আমি বাঁচি। এ পোড়া কপালে কি সে সুখ আছে? দিদিমণি! রাত হলো; তুমি খাওয়া দাওয়া করে শোও গে; বুড়ী মরবে না!

এইরূপে রাত্রি গেল, দিন আসিল। বালিকা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বৃদ্ধার ঘরে দ্রুতপদে হাজির হইল। দেখিল, বৃদ্ধা

জাগিয়াছেন, তথাচ শুইয়া আছেন; আর বালিসের দিকে মুখ করিয়া কেবল চোখের জল ফেলিতেছেন। কৌশল্যা, বালিকার সাড়া পাইয়া আস্তেব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন, "তুমি দিদি, এত ভোরে উঠেছ কেন? শেষরাত্রে পালিয়ে এলে, নাতজামাই ভালবাস্‌বে কেন?"

বালিকা। গঙ্গা নাইবি না?

কৌশল্যা। তুমি শোও গে,—আমি কি-কে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় যাবো এখন!

বালিকা তখন বৃদ্ধার হাত ধরিয়া বলিল, "দূর! বুড়ী পাগ্‌লি!—দোয়ার-গোড়ায় গাড়ি দাঁড়িয়ে,—আমি যাব, কি যাবে, তুই যাবি, আর রামা চাকর যাবে,—শীগ্‌গির, আয়, শীগ্‌গির আয়।"

গঙ্গাস্নান হইল। একটী ডাবের মুখ কাটিয়া বালিকা, "বুড়ী, তুই শীগ্‌গির এই ডাবটা খা—

বৃদ্ধা, একটু হাসিয়া অগত্যা ডাবজল পান করিলেন। বালিকা বলিল, "বুড়ী! তুই একটা ভাল শ্লোক মনে কর্, আমি ও-ঘর থেকে এসে শুন্‌বো।"

ও-ঘর অর্থে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শয়ন-ঘর। অঘোরবাবু সাদাসিধে লোক। ঘরে আস্‌বাব অনেক, কিন্তু সাজান নাই। বেলা ৯টা বাজে, তথাচ অঘোরবাবু ঘরে আসিলেন না। দেখিতে দেখিতে ১০টা বাজিল,—স্নানাহার হইল না,—স্বামী কোথায় গেলেন?—এই চিন্তা বালিকার মনোমধ্যে উদয় হইল।—বালিকা তখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া কৌশল্যার নিকট আসিল। বৃদ্ধার নয়ন-আকাশে সর্বদাই শ্রাবণের বারিধারা—মেঘপূর্ণ, বজ্রাগ্নিপূর্ণ, জলতরঙ্গপূর্ণ! বালিকা বৃদ্ধার হবিষ্যান্নের উদ্‌যোগ করিয়া বৃদ্ধার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল,—"বুড়ী! আজ তোকে আমারও ভাত রাঁধ্‌তে হবে, আমার হবিষ্যের ভাত খেতে সাধ হয়েছে।"

এমন সময়ে অঘোরবাবুর দ্রুতপদ-বিক্ষেপ শ্রুত হইল। বালিকা তৎক্ষণাৎ অমনি শয়নগৃহে ধাবিত হইল। অঘোরবাবু ঘরে পৌঁছিলে, বালিকা ধীরভাবে জিজ্ঞাসিল, "এত দেরী কেন?"

অঘোর। এই তোমার জন্য ঘুরে ঘুরে এত বেলা হলো। তোমার চিনিবাস ভবানীপুরের বাসা উঠাইয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া নিয়েছেন। খুঁজে খুঁজে বৌ-বাজারে তাঁর বাসার সন্ধান পেয়েছি।

বালিকা। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি?

অঘোর। দেখা করি নাই; আজ তার বাড়িতে ভারি ধুম। বাবু না কি মিউনিসিপাল কমিশনার হয়েছেন; রাজা হবেন, তাই আজ মহা উৎসব চলিয়াছে।

বালিকা। বড়ঠাকুরমাকে তবে কখন্ সঙ্গে করে নিয়ে তার কাছে যাবে?

অঘোর। তার কাছে সহজে যাওয়া যাইবে না,—সিপাহীর পাহারা,—আমার জিজ্ঞাসিল,—"এত দেরী কেন?"

অঘোর। এই, তোমার জন্যই ঘুরে ঘুরে এত বেলা হলো। তোমার শ্রীমান চিনিবাস, ভবানীপুরের বাসা উঠাইয়া কলিকাতায় এসে বাসা ভাড়া নিয়েছে। খুঁজে খুঁজে বৌবাজারে তাঁর বাসার একটী বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সে শীঘ্রই রাজা-বাহাদুর উপাধি পাইবে। ছোট-লাটের সঙ্গে সে প্রতি সপ্তাহে একবার দেখা করিতেছে। তোমার চিনিবাস খুড়ো জানিয়াছেন যে, তাহার মা আমারই ঘরে

আছে। খুড়ো আমাকে জব্দ করিবে বলিয়াছেন।

বালিকা নীরব।

অঘোরবাবু বালিকার পৃষ্ঠদেশে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নাই; একটী কার্যদক্ষ লোকের সহিত আমি চিনিবাসের মাতাকে লইয়া আগামী রবিবার দিন যাইব।"

বালিকা বলিলেন, "তবে তাহাই হইবে; তোমার কোন বিভ্রাট ঘটিবে না ত?"

অঘোরবাবু স্ত্রীকে "কোন ভয় নাই" বলিয়া স্নানার্থ গেলেন।

ওদিকে চিনিবাসের বাসায় প্রকৃতই মহা ধুম। লোকজন চাকর বাকর, দ্বারবান্, পাইক,—যেন লোকের হাট বসিয়াছে! চারিদিকে রব উঠিয়াছে, চিনিবাস রাজা হইবেন।

প্রতিবেশী দুই একজন সন্দেহ করিল, চিনিবাস এত টাকা পায় কোথা? যাঁহারা নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতেন, তাঁহারা বলিলেন, রাজনীতির সহিত সমাজনীতির যোগ হইলে টাকার ভাবনা কি?

অঘোরবাবু ইতিমধ্যে তাঁহার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর দ্বারা চিনিবাসকে বলিয়া পাঠান যে, কলিকাতায় তাঁহার মা আসিয়াছেন। চিনিবাস এই দুঃসংবাদ পাইয়া চকিত হইয়া বলেন, "আমার মা—কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের যখন সহমাতা, পিতার সহিত সহমৃতা হইয়া-মরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখনই আমার ছিলেন।"

গোপাল। বলেন কি, মহাশয়! আপনার মা, "চিনিবাস চিনিবাস" করিয়া অজ্ঞান!—আপনি এক বৎসর তাঁকে দেখা দেন নাই,—আপনাকে দেখবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন; কেঁদে কেঁদে চোখে আর তিনি ভাল দেখিতে পান না। আপনার মায়ের দুঃখ দেখে পাড়ার সমস্ত লোকই কাতর!

চিনিবাস। উঃ—ঘোরতর ষড়্‌যন্ত্র! আমি দেখিতেছি, আপনি মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন। আমার জননী থাকিলে কি, এতদিন তাঁহাকে অন্তঃপুরবাসিনী থাকিতে দিতাম? তাঁহাকে অবশ্যই এতদিন ইংরেজী পড়াইয়া, শিক্ষিতা করিয়া, স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজা ধরাইয়া, ভারতীয় ললনাকুলের অগ্রগামিনী করিতাম।

কথা শুনিয়া, গোপালবাবু ত অবাক্!

আমা হতে যা হবে তাই তখনি করবো

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কেবল চিনিবাসের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

চিনিবাস পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"দেখিতেছি, আপনি বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি,—আপনার সহিত একটু সদালাপ করা যাউক। আপনি বোধ হয় অবশ্যই অবগত আছেন, রাজনীতির তরঙ্গতুফানে দেশে আজ কাল প্লাবিত! ইহার আমিই বীজ।

গোপালবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার মাতার আকৃতি স্মরণ আছে কি?"

চিনিবাস। ছি ছি ছি!—ও সব অসার পাপ কথা ছাড়িয়া দাও—আমি সময় নষ্ট করিতে সক্ষম নহি। আমেরিকা হইতে আমার যে টাইটেল আসিয়াছে, তাহা আপনি দেখিতে চান কি?—দেখিলে আপনার দিব্যজ্ঞান জন্মিবে।

তৎক্ষণাৎ বাক্স খুলিয়া কাগজ বাহির করিয়া চিনিবাসের টাইটেল পাঠ
"Z. Q. T. P. N. S. O. D. C. R. B. X. Y. &c. &c."

গোপাল। মহাশয়, ও সব আমার কিছুই আবশ্যক নাই। আপনার মাতা একরকম মৃত্যুশয্যায় শায়িত—এ অন্তিম-কালে, তিনি দিনরাত কেবল আপনার নাম উচ্চারণ করিতেছেন। আচ্ছা, আপনার মায়ের নামটী কি বলুন দেখি?—

চিনিবাস ক্রোধকষায়িত-লোচনে উত্তর দিলেন,—"আমি আপনার নিকট চৌদ্দ-পুরুষের হিসাব দিতে প্রস্তুত নহি, আইনমতে বাধ্যও নহি। আপনি আমাকে আর বিরক্ত করিবেন না,—মূল্যবানীয় সময় বৃথা অপব্যয়িত হইতে দেখিলে, আমার প্রাণ কেবল কাঁদে।"

গোপাল। আমি নিজের জন্য আসি নাই, আপনার মায়ের কষ্ট দেখিয়া আসি-য়াছি—আপনি সন্তান হইয়া মাতাকে বিসর্জ্জন দিতেছেন, হা চন্দ্রসূর্য্য! তোমরা কি আর উদয় হইবে?

চিনিবাস। (ক্রোধভরে) আপনি দুর্বৃত্ত, এখনি চলিয়া যান,—আপনি তিলার্দ্ধ এখানে থাকিলে, আপনার নামে অনধিকার-প্রবেশের দাবী দিয়া নালিস করিব।—

গোপালবাবু "ঈশ্বর তোমার একমাত্র শাসনকর্ত্তা," বলিয়া উঠিয়া আসিলেন।

অঘোরবাবুর বৈঠকখানা সুদীর্ঘ এবং সুপ্রশস্ত। উত্তম ঢালা বিছানা। কয়েকটী উকীল, একটী ডাক্তার এবং আরও তিন চারিজন লোক—সর্বশুদ্ধ প্রায় আটদশ জন ব্যক্তি, একত্র বসিয়া গল্প করিতেছেন; তামাক-পান চলিতেছে। হাসির শব্দ হো হো উঠিতেছে।

উকীলবাবু বলিলেন, "ওরে শীঘ্র তামাক দে, গল্প ভারি জমিয়াছে।"

এমন সময় চিনিবাসের বাসা হইতে গোপালবাবু আসিয়া উপস্থিত। তিনি ও ডাক্তার। গোপালবাবু আসিবামাত্র, অঘোর-নাথ অতি ব্যগ্র হইয়া, জিজ্ঞাসিলেন, "সংবাদ কি?"

গোপালবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সংবাদ বড়ই বিষম। আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিয়াছে—"

অঘোর। গতিক কি? ব্যাপার কি?

গোপাল। আমি নিবিষ্টচিত্তে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল তাহার চেহারা দেখিলাম। চোখের চাহনির কেমন স্থিরতা নাই। অন্তরটা যেন তার সদাই গুর গুর করচে। সদাই ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চায়—যেন কে তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে। আর মাঝে মাঝে কি যে আবল-তাবল

বকে, তার বিন্দুবিসর্গ আমি অর্থ করিতে পারি না।

অঘোর। এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখিতেছি!

গোপাল। আমিও তাই ভাব্‌চি—তার মতিস্থির নাই—

ডাক্তার। তোমরাও ত কম পাগল নও,—চিনেটাকে আমি ছেলে বেলা থেকে জানি। বদমাইসের চূড়ান্ত! সে আবার পাগল কোথা?—ভারি বদমাইস! সেই সেয়ানথেপাটাকে তোমরা আজও চিনিতে পারিলে না?

অঘোর। না না,—টাউনহলে এক দিন বক্তৃতার ঝোঁকে সে যেরূপ রঙ্গ ভঙ্গ বিকট চীৎকার করিল, তাহাতে তাকে বদ্ধ পাগল বলেই মনে হইল।

ডাক্তার। তাকে পাগ্‌লা-গারদে দিতে হয় দাও, তাতে আপত্তি নাই। ফল কথা, সে পাগল নয়—ঐ একরকম ধরণ।

অঘোর। ডাক্তার স্মিথকে লইয়া তার কাছে গেলে হয় না?—

ডাক্তার। স্মিথকে নিয়ে যাবার দরকার নাই, পাগ্‌লাগারদে রাখিবার জন্য আমিই সার্টিফিকেট দিতে পারি!

অঘোর। মহামুস্কিলের কথা হইল। তার মা কেঁদে কেঁদে সারা হলো—এখন উপায় কি? গোপ্পলবাবু! তার মায়ের কথা বলাতে সে কি উত্তর দিল?

গোপাল। সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই! অতি পাপিষ্ঠ নরাধম। অথবা উন্মাদ!

অঘোর। চিনিবাস মায়ের কথা কি বলিল,—বল, বল!

গোপাল। পাপিষ্ঠ বলিল, আমার মা নাই,—মা, বহুকাল সহমৃতা হইয়াছে! তার পর সে, বক্তার হইয়া, সাপের মন্ত্রবৎ কি যে বক্‌ বক্‌ বকিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিলাম না।

অবশেষে অঘোরবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ কথা লইয়া এখানে আর অধিক আন্দোলন করিয়া কাজ নাই;—চিনিবাসের মা যদি এ কথা শোনেন, তাহা হইলে বুড়ী আজই মোর্‌বে—অনেক যত্নে আমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি—"

ডাক্তার। গোপালবাবু, আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি কি খালি পায়ে চিনিবাসের বাড়ি গেছলেন?

গোপাল। এ কথা কেন?

ডাক্তার। জুতা কালে থাকিলে কি আপনি চিনের মাথায় পঁচিশ পয়জার মারিতেন না? তোমরা না পার,—এস আমার সঙ্গে,—বাহিরে থেকে জুতার শব্দ শুনিবে;—"আসুন গোপালবাবু"—এই বলিয়া ডাক্তারবাবু গোপালবাবুর হাত ধরিয়া উঠিলেন।

অঘোরবাবু বলিলেন, "থাক্‌ থাক্‌,—এ সময় আর যেয়ে কাজ নাই,—বাগেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় ঠিক করা যাবে। তিনি প্রবীণ ব্যক্তি, এ সকল ব্যাপারে তাঁর মত লইয়াই কার্য করা ভাল।"

কথান্তে অঘোরবাবু, ডাক্তারবাবুর হাত ধরিয়া বসাইলেন।

পরদিন প্রাতে তাঁহারা সকলে বাগেশ্বর পণ্ডিতের বাটীতে গেলেন। বাগেশ্বর সহরে মোড়ল। তাঁর ধন আছে, দান আছে, পাণ্ডিত্য আছে, প্রতিপত্তি আছে এবং বহুদর্শিতাও আছে; এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন; লোককে কেবল সলা, পরামর্শ, উপদেশ দেন। তিনি বলিলেন,

"চিনিবাসের মাকে দিয়া চিনিবাসের নামে একটী নালিস রুজু করাইতে হইবে। আমি শুনিয়াছি, খিড়কীর পুকুর, আম-বাগান এবং ১২ বিঘা লাখরাজ জমী চিনিবাসের পিতা, স্ত্রীর নামে কেনেন। চিনিবাসের বাপ অতি সংলোক ছিলেন;—আমার স্মরণ হইতেছে, ঐ দলিলটা তিনি কৃষ্ণনগরে একবার আমাকে দেখান। যাহোক, ঐ তিনটা সম্পত্তি স্ত্রীধন। চিনিবাস সমস্তই বিক্রয় করে ফেলেছে,—শুনিলাম, সিকি দামে ওগুলো বেচিয়াছে;—স্ত্রীধন উদ্ধারের জন্য উহার মা নালিস করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।"

অঘোর। চিনিবাসের মা নালিস করিতে কোনমতেই স্বীকার হইবেন না। বিশেষ, তিনি এ সব কথা শুনলে আর বাঁচবেন না। আমি বড় বিষম সংকটে পড়েছি—

বাণেশ্বর। যে কোন উপায়ে হোক্, নালিসটা একবার রায়ের করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত—

অঘোর। নালিস করিতে ত দেরী আছে। অভাবপক্ষে একমাস সময়ের কম কিছু এ কাজ সমাধা হবে না। মহা-মুস্কিল কাণ্ড! এক্ষণে বৃদ্ধার কাছে প্রতিশ্রুত আছি যে, আগামী রবিবার দিন নিশ্চয়ই আপনাকে চিনিবাসের বাড়ি লইয়া যাইব। বৃদ্ধা কেবল দিন গণিতেছে, বার গণিতেছে,—কবে রবিবার আইসে।"

বাণেশ্বর পণ্ডিত অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই। রবিবার দিন আমি নিজে চিনিবাসের মাকে লইয়া চিনিবাসের বাসায় যাইব। অঘোরবাবু, কেবল আমার সঙ্গে যাইবেন।

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া অঘোরবাবু প্রভৃতি স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

যথানিয়মে, রবিবার প্রাতঃকালে অঘোর বাবু স্বয়ং চিনিবাসের বৌবাজারস্থ বাসায় গেলেন। দেখিলেন, দ্বারে দ্বারবান্। প্রশ্নোত্তরে বুঝিলেন, চিনিবাস বাবু রাজ-নৈতিক আন্দোলনার্থ মফঃস্বল গিয়াছেন। তিন চারি দিন আসিবেন না। অঘোর বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার চক্ষে পৃথিবী যেন শূন্য বোধ হইল। বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য তিনি এ দিক ও দিক চাহিতে লাগিলেন। গৃহের অভ্যন্তরপ্রদেশে একবার উঁকি মারিলেন। দ্বারবানটা গাঁজা টিপিতেছিল। সে, অঘোর বাবুর দ্বারদেশে বৃথা অবস্থিতি দেখিয়া একটু বিরক্ত হইল। সে বলিল, "বাবু! আপনি কাল আসবেন—ঠিক খবর বলিব—কাল প্রাতে বড়বাবুর ডাকের চিঠি পাইব। আজ ঘরে কেহই নাই।"

দ্বারবান্ বলে, ঘরে কেহ নাই; কিন্তু অঘোর বাবু শুনিলেন,—ছাদে, উঠনে, দ্বিতলে দুপদাপ, হুটহাট শব্দ। চৌবাচ্ছায় কৈ, মাগুর, খলসে মাছ জীওয়াইয়া রাখিলে, যেমন মধ্যে মধ্যে হুটুস্ হুটুস্ শব্দ হয়,—ইহা সেই রকম শব্দ। কেহ সিঁড়ি দিয়া তত্তর বেগে নামিতেছে, কেহ হর্হর্ শব্দে উপরে উঠিতেছে, কেহ ছাদে ঝম্ ঝম্ রবে ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ বা মধুর-ধ্বনিতে হার্মোনিয়ম বাজাইতেছে!

দ্বারবানের কথাই সত্য। বাস্তবিক ঘরে পুরুষ কেহই ছিল না; চিনিবাস-প্রতিপালিতা কয়েকটি মহিলা আজ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মহিলাগুলি এখন

প্রাতঃকালিক উৎসবে মনোযোগ দিয়াছেন। তাই ঐ শব্দ।

অঘোর বাবু কোন কথার উত্তর

হইল। তারের সংবাদ এইরূপ পৌঁছে সভা। ৪৯ হাজার ৯৯৯ জন চাষা উপস্থিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত

চিনিবাস তখন একগাছা চাবুক হাতে লইয়া

দিয়া প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে চিনিবাসের রাজনৈতিক-আন্দোলনের সংবাদ ঘোষিত

ধুলুগ্রামের ময়দানে সভার কার্য হয়। দ্বাদশটি প্রস্তাব অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইয়াছিল। মহা উৎসাহ, মহা আন্দোলন,

মহা বক্তৃতা। চিনিবাস বাবুর বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেই কাঁদিয়াছিল।" পরদিন প্রাতঃকালের সংবাদপত্রে আবার এইরূপ তারের সংবাদ ঘোষিত হইল:—"২৪ পরগণার অন্তর্গত নুলগ্রামে মহতী সভা। সভার মাঠে স্থান সংকুলান না হওয়াতে, অনেক কৃষক চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিল। লোকসংখ্যা ৬২ হাজার ৩১৭। চিনিবাস বাবুর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া লোকসকল উৎসাহে নাচিয়াছিল।"

দুই দিন পরে সংবাদপত্রে আবার তারের সংবাদ:—"হুগলী জেলার অন্তর্গত কুলগ্রামে ভয়ঙ্কর সভায় মেদিনী বিকম্পিত হইয়াছিল। লোক-পদ-উৎক্ষিপ্ত ধূলি-পটলে সমগ্র বঙ্গভূমি ধূসরিত হইয়াছিল। এক লক্ষ একশত এগার জন লোকের সমাগম। সিবিলসার্বিস পরীক্ষার বয়স বত্রিশ বৎসর অনুমোদিত হইয়াছে।"

এদিকে রাষ্ট্র হইল, চিনিবাস শীঘ্রই লাট-সভার সভ্য হইবেন। কেহ বলিল, "বঙ্গীয়-মহিলাকুলের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া চিনিবাস লাট-সভায় বসিবেন।" কেহ বলিল, "তিনি কৃষক এবং তাঁতি-কুলের প্রতিনিধি হইবেন।" দেশে দেশে রাজনীতির জয়ডঙ্কা পিটিয়া, কোথাও বা সমাজনীতির ফুলুট বাজাইয়া, কোথাও বা প্রেম-নীতির সিস দিয়া,—চিনিবাস তিন সপ্তাহের পর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

দুর্গোৎসব নিকটপ্রায় হইল। মহা-দেবী রামমণির বেদপাঠার্থ কাশীগমনেরও সময় নিতান্ত নিকটবর্তী হইল। যেদিন চিনিবাস বহুবাজারের বাসায় আসিলেন, তার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কুমারী কুঞ্জমালা, চিনিবাসের চরণতলে কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল, "বেদপাঠের সময় উপস্থিত না হউক, আমার দর্শন-পাঠের কাল নিতান্ত নিকটে আসিয়াছে। আমাকে যদি একান্তই কাশীতে লইয়া না যান, তবে বৈদ্যনাথে রাখিয়া যাউন,—সেখানে পাতঞ্জলি পাঠটা সমাপ্ত হইতে পারে।"

চিনিবাস বলিলেন, "তাহাই হইবে।" কুঞ্জমালার অভিভাবকস্বরূপ রামকানাইও সঙ্গে চলিল। হাবড়ার ষ্টেসনে ডাকগাড়ী শিক্ষিত নরনারীর প্রভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

আশা পূর্ণ হইল না। কৌশল্যার সহিত চিনিবাসের সাক্ষাৎ ঘটিল না। দিন যায়, রাত আসে, আবার সূর্য উঠে,—বালিকা প্রত্যহ স্বামীকে বলেন, "চিনিবাস আসিয়াছে কি না, আজ সংবাদ লইও।" স্বামী প্রতিদিন অনুসন্ধানে জানিলেন, চিনিবাস এখনও ফেরেন নাই। তখন বালিকার মুখকমল শুকাইতে লাগিল। অঘোর বাবুরও মুখ-ম্লান হইয়া আসিল। আর, বৃদ্ধা কৌশল্যার আহার একরকম বন্ধ হইল। প্রথম কলিকাতা আসিয়া বৃদ্ধার মনে একটু স্ফূর্তি হইয়াছিল,—কিন্তু সে সুখ, নির্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, শীঘ্রই নিবিয়া গেল। শেষে অঘোর বাবু সংবাদ পাইলেন, চিনিবাস বঙ্গীয় রাজনৈতিক আন্দোলন শেষ করিয়া যেদিন কলিকাতায় প্রত্যাগত হন, তার পরদিনই ভারতভ্রমণের জন্য, তিনি উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, বোম্বাই-অঞ্চল উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। তিন মাস কাল তিনি ফিরিবেন না।

এখন সব আশাই ফুরাইল। কৌশল্যা

অন্ধকার দেখিলেন, কূলকিনারা কোথাও পাইলেন না।

একদিন রাত্রিকালে প্রায় সাড়ে তিন-টার সময়, অঘোর বাবু এবং বালিকা উভয়েই বৃদ্ধার গৃহপার্শ্বে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন, —বৃদ্ধা ঘোরনিদ্রায় অভিভূতা, অথচ কথা কহিতেছেন।

অঘোর বাবু দেখিলেন, বালিকা তাঁহার বাহুমূলে ঠেশ দিয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী স্ত্রীর পৃষ্ঠে হাত দিয়া, সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"তুমি কাঁদ কেন?"

বালিকা (কাঁদ কাঁদ স্বরে)। বুড়ী আর বাঁচবে না—এই সময়, এক দিনের জন্যও যদি ওর ছেলের সঙ্গে দেখা হতো—

এই বলিয়া বালিকা উচ্চরবে রোদন করিয়া উঠিলেন। স্বামী, "চুপ কর, চুপ কর"—বলিয়া অঞ্চলের দ্বারা বালিকার চোখের জল মুছাইলেন। বালিকা বহুকষ্টে রোদন সম্বরণ করিলেন। অঘোর বাবু বলিলেন, "চিনিবাসকে পাইবার এখন কোনও উপায় দেখি না—পূজার পর নিশ্চয়ই কার্য উদ্ধার করিব।" এই বলিয়া অঘোরনাথ স্ত্রীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে গমন করিলেন।

আশ্বিন মাস। দুর্গোৎসব। পূজার অবকাশে অঘোরনাথ সপরিবারে ঘরে গেলেন। কৌশল্যা সঙ্গে রহিলেন। অঘোর বাবুর বাটি, হুগলী জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে।

এক বৎসর পরে অঘোর বাবু বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, গ্রাম জঙ্গলপূর্ণ। পথ গতায়ত বিহীন। গুরুতর বর্ষার প্রভাবে চারিদিকে ঝুপিবনের রাজত্ব হইয়া উঠিয়াছে। উৎসব আনন্দের দিন উপস্থিত—আনন্দময়ী ঘরে আসিবেন। ঘরে ঘরে, নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার, নূতন আহারীয় সামগ্রী। পুত্র মায়ের নিকট নব-বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া, পথে পথে, ঠাকুর-বাড়ীতে খেলাইয়া বেড়াইতেছে। বৃদ্ধা বালিকাকে বলিলেন, "আমার চিনিবাসের কাপড় কৈ?" বালিকা একখানি ভাল কালা পেড়ে ধুতি আনিয়া দিলেন। ধুতি পাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার ছেলের জামা কৈ, জুতা কৈ?" বালিকা অমনি স্বামীর নূতন জুতা, নূতন জামা আনিয়া হাজির করিলেন! তখন বৃদ্ধা ধুতিখানি খুলিয়া সম্মুখে পুত্রবোধে, তাহা পরাইতে গেলেন। শেষে, পুত্রকে খুঁজিয়া না পাইয়া, "আমার ছেলে কৈ?" বলিয়া, গভীর আর্ত্ত-নাদে বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন! বহুক্ষণ পরে আবার তিনি চেতন লাভ করিলেন। পূজার বাজনা বাজে, বৃদ্ধা বালিকাকে বলেন, "দেখ দিদিমনি! চিনি-বাস আমার, বিয়ে করে, বৌ নিয়ে বাজনা বাজায়ে ঘরে আস্‌চে,—দেখ দিদি! বৌকে কোলে ক'রবে, আমি ছেলেকে কোলে ক'রে আন্‌বো!"

বালিকা। তা আনবো বৈকি?

বৃদ্ধা। কাল, ঐ বড় ঘরে ফুলশয্যা হবে, তুমি এখন থেকে ফুলশয্যার যোগাড় কর।

আরতি শাঁক বাজিল, কৌশল্যা বলিল, "ঐ বর এসেছে।"

এইরূপে আশ্বিন গেল, কার্ত্তিক আসিল। বৃদ্ধার দেহ ক্ষীণ হইতে

ক্ষীণতর হইতে লাগিল। কোন দিন ভাত খান, কোন দিন খান না,—কোন দিন বা বালিকা খাওয়াইয়া দেন। কোন দিন ভাত খাইতে বসিয়া বৃদ্ধা বলেন, "আমি এত-গুলো ভাত খেলে আমার চিনিবাস খাবে কি? আমি বেশী ভাত খাব না—" গ্রাস দুই মুখে দিয়া সেদিন সমস্ত ভাত ফেলিয়া রাখেন।

কার্ত্তিকমাসের শেষে অঘোরবাবু আবার সপরিবারে কলিকাতা আসিলেন। তাঁহার কাজকর্ম দূরে গেল, কেবল চিনিবাসের অনুসন্ধানই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল। কার্ত্তিক অতীত হইল, অগ্রহায়ণ আসিল,—কিন্তু চিনিবাস আসিলেন না। অবশেষে পৌষ মাসের প্রথমে, চিনিবাস, রামমণি সমভিব্যাহারে কলিকাতায় শুভ পদার্পণ করিলেন।

নগরে আনন্দলহরী। নিষ্কামধর্ম্ম চিনিবাস রাজা হইবেন। পক্ষে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মর্ম্মে ব্যথা পান, বড়লাট দুঃখিত হন, ছোটলাট কাঁদেন;—এই ভয়ে শ্রীযুক্ত চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, (নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও) জনক ঋষির ন্যায়, নিষ্কামভাবে রাজা-উপাধি গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন।

আজ ঘোষণার দিন। চিনিবাস যে রাজা হইবেন, অদ্য তাহাই কলিকাতা-বাসীর নিকট তিনি নিষ্কামভাবে ঘোষণা করিবেন। তাই তাঁহার গৃহে আজ মহা মহোৎসব।

গৃহমধ্যে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে এক বিচিত্র চন্দ্রাতপ খাটান হইয়াছে। সাদা, লাল, নীল রঙের ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছে। সেই চন্দ্রাতপে এই কয়টী কথা খুব বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে।—

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।"

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।"

"কন্যাপ্যেব পালনীয়া
শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

"অহিংসা পরমোধর্ম্ম।"

উঠানটা প্রথমত লাল কার্পেট মোড়া, তার উপর কোথাও চেয়ার-টেবিল, কোথাও সোফা, খাট;—কোথাও বা জাজিমপাতা ঢালা বিছানা। উঠানের এক কোণে কতক-গুলি বিলাতী বাদ্যযন্ত্র—পিয়ানো,—হারমোনিয়ম, ফ্লুট, জয়ঢাক ইত্যাদি।

আজ হবে কি? চিনিবাস-রাজার গৃহে আজ কলিকাতার জনসাধারণ নিমন্ত্রিত।

কিরূপ আমোদ হইবে, তাহা লইয়া ভারি বাদানুবাদ হয়। বাইনাচ, খেমটানাচ, —কুরুচি। থিয়েটার কুরুচি—কারণ তাহাতেও বেশ্যা-স্ত্রীলোক থাকে। যাত্রার দল—অসভ্যতা পূর্ণ,—এবং উহাতে মিথ্যা কথার প্রশ্রয় দেওয়া হয়,—কারণ তথায় পুরুষ স্ত্রীবৎ পোষাক পরিয়া আপনাকে স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচয় দেয়;—জালকরা, পিনালকোর্ড অনুসারে দণ্ডনীয়। শেষে ঠিক হইল, কেবল শিক্ষিতা-মহিলাগণের পবিত্র সঙ্গীত হইবে। একজন এ প্রস্তাবটী অর্দ্ধপ্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "সংগীত হউক ক্ষতি নাই,—কিন্তু ইহাতে আর নূতনত্ব নাই।" একজন বিলাত প্রত্যাগত সুসভ্য যুবক এইরূপ প্রস্তাব করিলেন;—"এরূপ সমারোহ কাণ্ডে

বিলাতে রাজগণ "বল" দিয়া থাকেন। অতি পবিত্র নৃত্য। শিক্ষিতা সভ্য যুবতী কুল-বধূগণ শিক্ষিত সভ্য কুলতিলকগণের

বাপরে মারে গেলাম, গেলাম

হাত ধরিয়া স্কন্ধ ধরিয়া পায়ে পা দিয়া, অতীব পবিত্র মনে নৃত্য করিতে থাকেন। অদ্য এই মহোৎসবে বল নাচই হউক।"

প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, রাজ ভবনে বল-নাচেরই আয়োজন হইতে লাগিল। নরনারীকুল নাচের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেন। তবকে তবকে ফুরে রাশি চারিদিকে পড়িতে লাগিল। গোলাপজল, লাভেণ্ডার, অডিকলোম প্রভৃতি জলীয় পদার্থের বর্ষণ সুরু হইল। মহোৎসব-উন্মত্তা মহিলাকুলের মধুমুখের মধু-মাখা কথায়, আসর মাৎ হইয়া উঠিল। পরেশ-পাথর পুরুষকুলও প্রকৃতির সেবার কার্য্যপরতা দেখাইতে গেলেন। কোন কামিনী কৌতুক করিয়া কোন পুরুষের গাত্রে গোলাপফুল ছুঁড়িয়া মারিলেন। পুরুষপ্রবর সেই কোমল-কামিনী হস্তপ্রক্ষিপ্ত নিজ-অঙ্গ-ঘর্ষিত, ভূপতিত, গোলাপপুষ্পটিকে কুড়াইয়া লইয়া একবার চুম্বন করিয়া, আপন বক্ষে তাহা ধারণ করিলেন। কোন মধুরহাসিনী,

ঈষৎ-কর্ণাভরণ দুলাইয়া, আড়খেমটায় তালে তালে পা ফেলিয়া নীরবে প্রচ্ছন্ন-ভাবে, কোন পুরুষের পশ্চাৎ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া অলক্ষ্যে তাঁহার গলদেশে বেলফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। পুরুষ-প্রাণ চমকিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, যেন ফুলময়ী বাসন্তীলতা গৌরবে স্ফীত হইয়া, মলয়ানিলের মন্দ মন্দ হিল্লোলে, মৃদুমৃদু দুলিতেছে।

বিজয় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। নর-নারীর নাচ আরম্ভ হইল। দিক্ সুপ্রসন্ন হইল। আকাশের কালো মেঘ কাটিয়া গেল। চন্দ্র হাসিল। জয়-জয় রবে ভুবন ভরিল। এ সময় রাজা-চিনিবাস কোথায়? গুরুতর কর্ত্তব্য অনুরোধে তিনি আজ নাচে যোগ দিতে পারেন নাই। অদ্য তিনি স্বয়ং গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিত আগন্তুক, অতিথিগণকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতেছেন। পাছে কাহারও অমর্য্যাদা হয়, এই ভয়ে তিনি নিজে দ্বারে থাকিয়া সম্ভাষণ-কার্য্যের ভার লইয়াছেন। নিষ্কাম-ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! রাজগৃহে আজ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়;—কিন্তু স্বয়ং চিনিবাস-রাজ আজ নিষ্কাম,—আট আনা মূল্যের ঠেঁটি থান ধুতি পরিয়াছেন,—হাঁটুর উপর সে কাপড় উঠিয়াছে,—পায়ে তালতলার চটী,—কাঁধে মুড়িশেলাই চাদর, হাতে একগাছি কঞ্চির ছড়ি। চিনিবাসরাজের পার্শ্বদেশে কয়েকটী অনুচর ছিল,—তাহারা সকলে উজ্জ্বল বসন ভূষণে বিভূষিত। সমগ্র রাজপুতানা উজাড় করিয়া সে পোষাকের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও পোষাকে সুবর্ণ হীরক ঝকিতেছে। কাহারও পাগড়ীতে সোনার প্রজাপতি বসান আছে। সাল, কিংখাপ, সাটীনের শ্রাদ্ধ হইয়াছে। তাহা-দিগকে দেখিলে মনে হয় যেন, পোষাক পরিবার জন্যই তাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ নব-ভূপতির উদ্দেশে বলিতেছেন, "মহারাজ! অদ্য আপনার এ সামান্য বস্ত্র পরিধান করা উচিত নহে। আপনি একবার রাজ-বেশ পরুন, আমরা একবার নয়ন সার্থক করি।"

নবভূপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আমি নিষ্কামধর্ম্মী পুরুষ,—আমি কামনাশূন্য হইয়া সমস্ত কাজই করিয়া থাকি, সুতরাং আমার আড়ম্বরময় পোষাকে কাজ কি? আমার পক্ষে সব সমান।"

অঘোরবাবু নিজগৃহ হইতে কলি-কাতায় আসিয়া পৌঁছিলে পর, নিয়মিত গঙ্গাস্নান এবং সুনিয়মে আহারাদি করিয়া একটু যেন সুস্থ হইয়া উঠিলেন, বৃদ্ধা তত আর প্রলাপ বকিতেন না।

শুভ-সংবাদ পাইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে বৃদ্ধা পুত্রদর্শনে গমনোদ্যতা হইয়া সজ্জা করিতে লাগি-লেন। ছেলের জন্য সেই পূজার সময়ের কালাপেড়ে কাপড়, জামা এবং জুতা—একখানি রুমাল স্বহস্তে বাঁধিতে লাগিলেন। বাঁধা ভাল হইতেছে না দেখিয়া, বালিকা তাহা বাঁধিয়া দিতে গেলেন। বৃদ্ধা বালিকাকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া হাসিকান্নামিশ্রিত সুরে বলিলেন, "দিদিমণি! আজ আমি ছেলের জিনিস কাহাকেও বাঁধিতে দিব না।"

ঘোড়গাড়ি আসিয়া দ্বারে লাগিল। অঘোরবাবু কৌশল্যাকে বলিলেন, "শীঘ্র এস, গাড়ি আসিয়াছে।" খৈচুরের হাঁড়ী,

কাপড়ের বস্তা প্রভৃতি সমস্তই গাড়িতে তোলা হইল।

অঘোরবাবু পুনরায় শীঘ্র আসিবার জন্য ত্বরা দিলেন। কৌশল্যা, বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত বালিকার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে, বালিকার হাত ধরিয়া গাড়িতে উঠিলেন। অন্য সময়ে, কৌশল্যাকে ধরিয়া গাড়িতে তুলিতে হইত; অদ্য তিনি স্বয়ং সজোরে গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। অঘোরবাবু এবং ডাক্তারবাবু উভয়েই তখন গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে রাজভবনের সম্মুখে গাড়ি উপস্থিত হইল।

চিনিবাস-রাজ সেইরূপই ঠেপটি খান কাপড় পরিয়া, মাথায় নিষ্কামভাবে মুকুট আঁটিয়া লোকসম্ভাষণার্থ, দ্বাররদেশে দণ্ডায়মান।

কৌশল্যা, বহুদিন পরে দূর হইতে সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া দ্রুতপদে গাড়ি হইতে নামিয়া, লক্ষ্য বেগে চিনিবাস-অভিমুখে ছুটিলেন। চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে বৃদ্ধা "বাবা চিনিবাস" বলিয়া মহা আর্ত্তনাদে পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। চিনিবাস ভীত, চমকিত, শশব্যস্ত; বিব্রত। মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না; তিনি "কে তুমি, কে তুমি" বলিয়া কৌশল্যাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। অঘোরবাবু বলিলেন, "চিনিবাসবাবু আপনার মা এসেছেন—"

কৌশল্যা চিনিবাসের গলা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা চিনিবাস! এত দিন কি মাকে ভুলে থাকিতে হয় বাছা?—"

পার্শ্ববর্তী অনুচরগণ বিস্ময়ান্বিত হইল। তখন মহাদেবী রামমণি ক্রোধে দন্ত কিটি মিটি করিয়া, রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া চিনিবাসকে বলিলেন, "রাজন্! কিং করিতেছং—ইয়াং বৃদ্ধাং দুষ্টাং পাপিনিং ভিখারিণীং পদাঘাতং কৃত্বাং,- দূরং কুরু, —দূরং কুরু—"

কৌশল্যা কিছুই বুঝেন নাই, "বলিলেন বাছা চিনিবাস! তোর মুখ এত শুকনো কেন?—"

চিনিবাস তখন রামমণির হাত ধরিয়া দ্বারদেশ ছাড়িয়া অন্যাভিমুখে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, "বাবা চিনিবাস! তুই বুড়ীকে ফেলিয়া আবার কোথা যাস্?" এমন সময় দ্বারবান আসিয়া বৃদ্ধার গলা সজোরে বিষম টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "ভাগো—হিঁয়াসে।"

জরাজীর্ণা, ক্ষীণা, দীনা বৃদ্ধা গলায় দারুণ আঘাত পাইয়া, মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। মুখ দিয়া ফেন উদ্গত হইতে লাগিল। চক্ষু কপালে উঠিল। অঙ্গ স্থির হইল। এক মিনিটের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—এই সমস্ত ঘটনা ঘটিল।

অঘোরবাবু এবং ডাক্তারবাবু ধরাধরি করিয়া সেই পুত্রময়প্রাণা কৌশল্যাকে নিমতলার ঘাটে লইয়া গেলেন। তথায় স্তূপীকৃত চন্দনকাষ্ঠের মধ্যে বৃদ্ধার জ্বালাময় দেহ ভস্মীভূত হইল। সেই বালিকা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, আমার যেন কখন পুত্র সন্তান না হয়।"

চিনিবাসের রাজত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সত্যধর্ম্মের ফুল ফুটিল সমগ্র ভারতবাসীর প্রেমে চিনিবাসের মন মজিল।

---

# আপনার শব্দ ভাণ্ডার পূর্ণ করুন

অরিজিৎ আচার্য

[ দশটি শব্দ দেওয়া হলো। এর কোনোটাই আপনার অপরিচিত নয়। প্রত্যেক শব্দের পাশে চারটি করে মানে আছে। তার মধ্যে একটি ঠিক। আপনি যেটিকে ঠিক বলে মনে করছেন তার পাশে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখুন। উত্তর অন্য পৃষ্ঠায় আছে। মিলিয়ে দেখুন কটি আপনার নির্ভুল হলো। ]

১। **বিভাবরী—**
(ক) বিদ্যুৎ
(খ) প্রভাত
(গ) রাত্রি
(ঘ) সূর্য

২। **তৈলঙ্গ—**
(ক) উদাসীন
(খ) উলঙ্গ
(গ) সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত
(ঘ) দক্ষিণ ভারতের অঞ্চল-বিশেষের অধিবাসী

৩। **বিতান—**
(ক) সুন্দর
(খ) আকাশ
(গ) চাঁদোয়া
(ঘ) বিলাস

৪। **মঞ্জুষা—**
(ক) কাঁপি
(খ) কুঞ্জবন
(গ) প্রাসাদ
(ঘ) মুকুল

৫। **কালকূট—**
(ক) গভীর অন্ধকার
(খ) তীব্র বিষ
(গ) আগামী কল্য
(ঘ) যম

৬। **প্রদোষ—**
(ক) গুরুদোষ
(খ) প্রদান করা
(গ) জাগরিত
(ঘ) সন্ধ্যা

৭। **কাণ্ডারী—**
(ক) পাল
(খ) মাঝি
(গ) নৌকা
(ঘ) কাণ্ডজ্ঞানহীন

৮। **নীপবন—**
(ক) কদম্ব গাছের বন
(খ) আঁধার
(গ) অগোপন
(ঘ) শান্ত বাতাস

৯। **অজাতশ্মশ্রু—**
(ক) যাহার কোন শত্রু জন্মায় নি
(খ) অজ্ঞাত
(গ) যাহার দাড়ি উঠে নাই
(ঘ) নিম্নসম্প্রদায়

১০। **বিদগ্ধ—**
(ক) সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ
(খ) রসিক
(গ) বিদঘুটে
(ঘ) সমালোচক

সত্যকে না বুঝে মিথ্যা ধারণা পোষণ

করার নামই হল টাবু

ভগবানের নিসিদ্ধ ফল খেয়ে আজ আমাদের দুর্দশার একশেষ। নিষিদ্ধ লেডী চ্যাটারলিকে নিয়ে পৃথিবী ব্যাপী তুফানের অন্ত নেই আজো। আর ললিতাকে নিয়ে সংশয়ের এখনও হয় নি শেষ। নিষিদ্ধ জিনিসের আকর্ষণই এমন। তাই নিষিদ্ধ ছাপমারা বইয়ের গৃহপ্রবেশ আমাদের সমাজে এখনও যেমন গর্হিত —তেমনি এর বিপুল চাহিদা ও কাটতি আমাদের বিস্মিত করে।

কেন? আদর্শনীয় বস্তুর প্রতি—যে জিনিস সহজলভ্য নয় তার প্রতি মানুষের কৌতূহলের প্রবৃত্তি সহজাত বলে। আর তা যদি না হত তাহলে বিজ্ঞানের জয় জয়কার আজ সম্ভব হত না। এটা হ'ল মানুষের প্রবৃত্তির উন্নততর বিকাশ।

তেমনি বিকশিত সভ্যতার অবদান সমাজের অনুশাসন প্রচলিত রীতি-নীতিও নেই বটে তবে প্রকৃতি আছে। এবং আছে এক অদ্ভুত জিনিস। এদের কোন অকৃতি বলেই কোন কোন বিশেষ বিষয়কে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করে চালানো হয়। এটা ভাল কি মন্দ তা পরে বিচার্য—কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এবং রচনার খাতিরে এটাকেই বলব প্রবৃত্তির বা আমাদের কৌতূহলের নিম্নমানের বিকৃতি।

কিন্তু কেন এটা হল? অথবা কি করে?

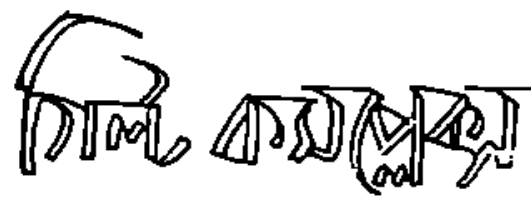

**আনন্দ ভট্টাচার্য**

এর একমাত্র উত্তর হ'ল আমাদের ব্যক্তি

ও সমাজ জীবনে টাবু-র প্রভাব। টাবু কি? সোজা কথায় টাবু বলতে আমরা যা বুঝি তা হল, কতকগুলি রীতি-নীতি এবং সামাজিক অনুশাসনের সঠিক অর্থ না বুঝে তাদের পোষণ-করা অথবা মেনে চলা। আমাদের দেশে ছেলে মেয়ের অবাধ মেলা-মেশার প্রচলন হয়েছে আজ—এখন। কিন্তু কিছুদিন আগেও এটা ছিল সমাজের চোখে নিষিদ্ধ বা খারাপ জিনিস! সব ক্ষেত্রেই অবাধ মেলামেশার ফল খারাপ হয় না। এই সত্যটিকে না বুঝেই এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ধারণা পোষণ করাই হ'ল টাবু। এখনও কোন অবিবাহিতা নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করা বা তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখা সমাজের বা ব্যক্তির চোখে অপরাধ। (কাজটি টাবুর প্রভাবে নিষিদ্ধ বলেই অপরাধ বলছি) অথচ ঐ রমণী-টির বিবাহের পরে তাকে নিয়ে আলোচনায় বা তার সৌন্দর্যের প্রশংসায় ততখানি অপরাধ হবে না—কেননা সে বিবাহিতা! সিঁথিতে রক্তরাঙ্গা সিঁদুরই তার সতীত্বের অথবা নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদার প্রমাণ বহন করছে এখনে টাবুর কোন নিষেধ নেই। বাধাও না। এই ভুল বুঝে কিছু কিছু অনুশাসনকে মেনে চলাই হল টাবু।

আজও যৌন বিষয়ে প্রকাশ্যে স্ত্রী-পুরুষে আলোচনা আমাদের দেহে গর্হিত টাবু। বিদেশে এ বালাই নেই। সেখানে এ ব্যাপারে টাবুর প্রবেশ নিষেধ। গুরু-জনদের সামনে ধূমপান করা মানে তাঁদের অসম্মান করা। বলা হয়ে থাকে বয়ঃ-জ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই বয়ঃকনিষ্ঠরা ধূমপান করে না বা উচিত নয়। ধূমপান করায় জ্যেষ্ঠদের কিসের যে সম্মানহানি হয় তা বুঝি না। হয়ত বলবেন, খারাপ নেশা বলে। উত্তরে বলা যায়—নেশা মানেই খারাপ। চায়ের নেশা কি নেশা নয়? অথচ তাঁদের সামনে বসে নির্বিঘ্নে আসর জমিয়ে চা-কফি পান করি, পান চিবুই, মুখ ঘুরিয়ে নাকের শব্দ করে নস্যিও টানি। ডাক্তারে বলেছেন অতএব শরীর খারাপের অজুহাতে ব্রাণ্ডি বা বিয়ার খাই। এতে কোন দোষ নেই! এগুলো নিষিদ্ধ নয়! অথচ বিড়ি সিগা-রেট খেলেই হয় মারাত্মক অপরাধ! তাই লুকিয়ে বিড়ি খেতে গিয়ে গুরুজনের সামনে ধরা পড়ে যাওয়ায় জাগে এক ধরনের অপরাধ ভাবনা। গিল্ট্ কমপ্লেক্স। যদি নেশার খারাপ কার্যকারিতার কথা বলেন, তো তা সব নেশাতেই বিদ্যমান। তবে কেন এধরনের ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে আজও? কারণ, একমাত্র কারণ হল টাবু। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এই টাবু সম্বন্ধে বলেছেন—"এর সঠিক কারণ এবং কবে কোন দিন থেকে প্রচলিত হয়েছে তা আজও অজ্ঞাত। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মনে খারাপ ভাল সংস্কারের বদ্ধমূল ধারণাই হল টাবু।"

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর রকমফের হয়েছে মাত্র কিংবা কোন কোন টাবু অগ্রগতির চাপে পড়ে সমাজের প্রয়োজনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েদের মেলামেশা উদাহরণ।

এবং এইসব অর্থহীন রীতি নীতিকে জোর করে মেনে চলা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে মানুষের মনে গিল্ট কমপ্লেক্স বাংলায় যাকে বলা যায় "অপরাধ ভাবনা" তাই যখনই আমরা কোন সামাজিক বিধি নিষেধের অর্থাৎ টাবুর বিরুদ্ধে যাই তখ-

নই আমাদের মনে অপরাধ বোধের ভাবনা জেগে ওঠে—অকারণ সংশয়াকুল হয়ে ওঠে মন। এবং এই বিব্রতবোধের ভাব আমরা আমাদের আচার আচরণে প্রকাশ করে ফেলি।

আমাদের দেশে খাঁটি অর্থে প্রেম বলতে যা বোঝায়, বলাবাহুল্য তা নিতান্তই দুর্লভ এবং বিরল। অথচ একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আজকালকার অধিকাংশ প্রেমই হল কামজ প্রেম। এই প্রেম অথবা ভালবাসা-বাসি আমাদের সমাজে এখনও নিষিদ্ধ। অতএব অপরাধ। ফলে অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ দেখতে পাই যুবক-যুবতী একত্রিত হলেই তাদের মধ্যে জেগে ওঠে প্রেম-কামনা-বোধ, তারপরই দেহজ মিলন। সামাজিক টাবুর বিরুদ্ধে সোজাসুজি যাওয়ার এ হল একটা বড় উদাহরণ এবং এ কারবার আজকাল হামেশাই হচ্ছে। তাই, লক্ষ্য করলেই দেখবেন ঐ প্রেমে পড়া যুবক যুবতী দুটির মধ্যে অপরাধভাবনা কি মারাত্মক ভাবে কাজ করছে।

অবিবাহিত মেয়ের প্রশংসা করা অবিবাহিত ছেলেদের কাছে টাবু মানে নিষিদ্ধ। এই সূত্রটি মেয়েদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু তারা যখন নিরালায় নিভৃতের অলিন্দে অথবা বাতায়ন পাশে দাঁড়িয়ে যুবকদের লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে অথবা নিজের বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের লুকোচুরি খেলে তখন কোথায় বা থাকে তাদের সাধুতা আর কোথায় বা টাবু! কিন্তু সেই মেয়েই যখন কোন কাজে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন সে যেন কদাচ কোন যুবকের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়নি। অনেকখানি গ্রাহ্যের মধ্যেই না আনা ভাব! এটার অর্থ কি? মনোবিজ্ঞানে বলে

"টাবুর অপরাধ ভাবনার রূপান্তর।"

গৃহস্থের মেয়ে বড় হয়ে উঠলে বাপ-মার মনে দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না তাকে সৎ পাত্রস্থ করার জন্য। মেয়ে যদি অপরূপা হয় তো অর্থকষ্ট থাকলেও গায়ে লাগে না মেয়ের রূপ যৌবনের অধিকারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তা হয় না। সাধারণ মেয়ে এবং তথাকথিত 'কুৎসিৎ' মেয়ের সংখ্যা আমাদের সমাজে বেশী। 'মেয়ে দেখার' নামে যে প্রহসন আমাদের অরক্ষনীয়াদের ভাগ্যে হামেশাই দেখা দেয় তা থেকেই তাদের মনে জেগে ওঠে বিচিত্র এক অপরাধ ভাবনা। কুৎসিৎ হয়ে জন্মানোর অপরাধে বেচারীদের সমস্ত নারীসত্তাই যেন ব্যর্থ হয়ে যায়!

'মেয়ে দেখা' ও পত্রী পছন্দ রীতি আমাদের সমাজে বিচিত্র এক টাবু। তেমনি আছে পণ-প্রথাও! অথচ পাত্র নির্বাচনে কোন টাবুই নেই। বিস্তারিত নিষ্প্রয়োজন।

বেশ কিছুদিন আগেও অস্পৃশ্যতার (ছুঁয়াছুত) মারাত্মক টাবু আমাদের দেশেই কায়েমী শিকড় জমিয়ে বসেছিল। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, অথবা ছোট জাত বড় জাত ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে গেলে ঘটত পরমাদ। এর হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ ছিল 'শুদ্ধিকরণ' অথবা 'প্রায়শ্চিত্ত!' তা না হলে একঘরে! আজ যুগ ও কালের প্রয়োজনে এবং প্রভাবে আমাদের সমাজ থেকে সে টাবু অন্তর্হিত হয়েছে। আফ্রিকার গোরা-কালার বিবাদ এই টাবুর বদ্ধমূল প্রভাবের পরিণতি। তেমনি মুসলমান সমাজেও পর্দাপ্রথার টাবু

অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়েছে আজ!

টাবুর উৎপত্তির সঠিক কারণ এবং প্রচলনের সময় বলা শক্ত হলেও মোটা-মুটিভাবে আমরা এটা মনে করতে পারি যে, কালের প্রয়োজনের তাগিদে এবং শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ মানুষের বিধানেই টাবু আপনার স্থান করে নিয়েছে পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজে। তেমনি, কতকগুলি টাবুর অবলুপ্তিও সম্ভব হয়েছে আজকের যুগের প্রয়োজনে। এবং এটা হল স্বাভাবিক নিয়ম।

বিশেষ কয়েকটি টাবু সমাজের পক্ষে মানুষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নিঃসন্দেহে—আবার কতকগুলি নয়ও।

যেমন "পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।" এও একটা টাবু বৈকি! কিন্তু ধরুন, যদি এটাকে জোর করে তুলে নেওয়া হয় বা আমরা না মানি, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? দার্শনিক মতে চুরি কিছুই নয়। প্রোগ্রেসিভ্ মাইণ্ডের বিচারে চুরি মানে একের প্রয়োজনের পূর্তি অতএব দোষণীয় নয়। এগুলি মেনে নিয়েও যদি চৌর্য বৃত্তির টাবু লোপ পায় তবে মনে হয়, মানুষ মাত্রেরই বেঁচে থাকা কণ্টকর হয়ে পড়বে। অভাবে স্বভাব নষ্ট—চুরির মূল কারণ। এছাড়াও একটি কারণ হ'ল রোগ—ক্লেপ্টোম্যানিয়া। তাছাড়াও বড় যে কারণটি আছে, তা হল যে চুরি করে তার মধ্যে চুরির টাবুর অনুপস্থিতি—অপরাধ ভাবনা একেবারেই না থাকা! আমার মনে হয় পৃথিবীর তাবৎ দেশে চুরি করার কারণগুলি বোধ-হয় একই!

সাধারণত আমরা কেউই 'অপরের দ্রব্য না বলিয়া লই না।' নিলেও সামাজিক দিক থেকে হয়ত কোন বাধাই আমি পাব না, কেননা, সবাই আমায় চেনে, জানে এবং বিশ্বাসও করে! কিন্তু চুরি করতে গিয়ে যে আমায় বাধা দেবে সে হ'ল গিল্ট কম্-প্লেক্স'—অপরাধ ভাবনা। এবং এধরনের কিছু অপরাধ ভাবনা এবং টাবু সমাজে না থাকলে হয়ত দেখতেন লোকে স্বচ্ছন্দে একের গায়ে থুথু ফেলে দিচ্ছে—পানের পিচ্ ফেলছে, পরস্ত্রীকে অবলীলাক্রমে নিজের বলে ছিনিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু তা হচ্ছে না—হয় না। উচিত নয় বলে। এই ঔচিত্য বোধই হল টাবুর উন্নত প্রভাব!

প্রসঙ্গত বলি, দেশান্তর ভেদে টাবুরও ভেদাভেদ আছে বৈকি! এমন কি, একই দেশ আমাদের ভারতের একস্থানে যা টাবু—গর্হিত, অপরাধ, অন্যস্থানে তা সামাজিক নিয়ম। আমাদের বিয়ে-থা, পূজাপার্বণে মঙ্গল ধ্বনি শাঁখ বাজানো হয়—হিন্দুস্থানী সমাজে এটা হ'ল অমঙ্গল ধ্বনি! তাদের সমাজ একমাত্র কোন জাতকের জন্মমুহূর্তেই অথবা, মৃত্যুর সময়ে শাঁখ বাজবে! ভারতীয় কোন নারীই সাধারণত একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না—অথচ তিব্বতে যে কোন স্ত্রী-লোকের নিজের ইচ্ছামত একাধিক স্বামী গ্রহণে সামাজিক কোন বাধাই নেই। সেখানে এ ব্যাপারে কোন টাবু নেই—আমাদের সমাজে একমাত্র শিশুদেরই স্নেহ বা আদর-চ্ছলে প্রকাশ্যে চুম্বনে কোন বাধা নেই—টাবু বা অপরাধ ভাবনার এখানে প্রবেশ নিষেধ। অথচ এই চুম্বনই প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—পাপ! কিন্তু পাশ্চাতো এ বালাই নেই। সুতরাং প্রকাশ্য দিবালোকে দুটি বিদেশী যুবক যুবতী যদি রাজপথে চুম্বন করে তাতে আমরা

হতভম্ব হই বটে; ইতরতার প্রশ্ন তুলি, কিন্তু ওতে তারা কোন অপরাধ ভাবনার জ্বালাতেই জর্জরিত হয় না। অথচ এটি আমাদের ক্ষেত্রে নির্জন স্থান হলেও তার হাত থেকে মুক্তি পেতাম না জীবন ভোরেও।

তাই হ্যাভলক এলিস বলে গেছেন "আমাদের জীবনটা সত্যিই বেঁচে থাকার মত জীবন, কেননা, আমরা যেখানেই যাই না কেন, প্রত্যেকেই তাদের হাবে ভাবে এমন সংযত ভাবে মেলামেশা করে যে, সেটা তাদের প্রবৃত্তিগত টাবুর সূক্ষ্ম জালে বোনা প্রকাশ মাত্র।"

সাধারণত এই অসুখের সৃষ্টি মস্তিষ্কের
ভেতরকার সাম্য বা স্থৈর্য রক্ষার যন্ত্র থেকে

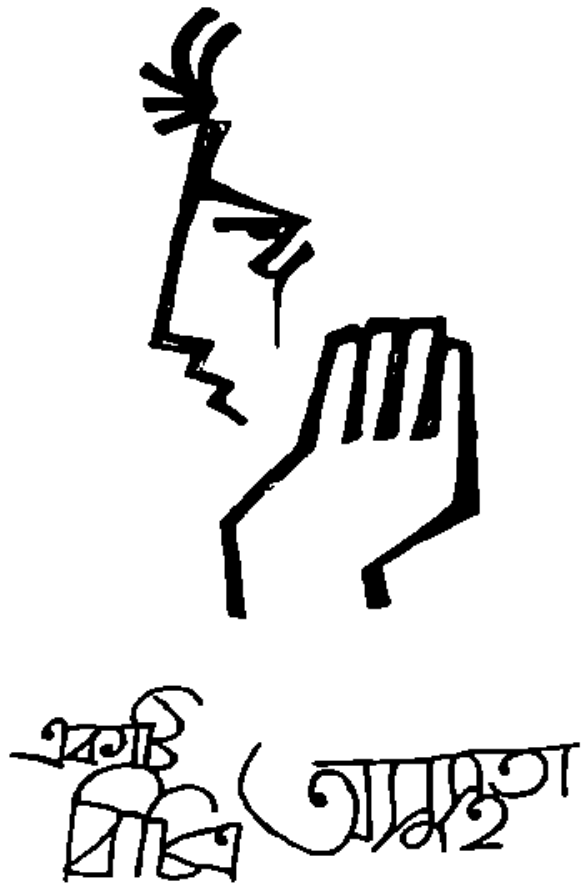


**জীবনময় দত্ত**

আগহুর মানুষের ভীড়ে কোন রকমে নিজেকে গেঁথে নিয়ে আপনি অফিস যাচ্ছেন। বাসে আজকের ভীড়টা যেন অনেক বেশি। অন্যদিন ভেতরের দিকে অন্তত দাঁড়াবার অসুবিধা হয় না। আজ 'নিজের পায়ে' দাঁড়াতেও দস্তুরমতো কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর প্রচণ্ড গরম। ডিজেলের পোড়া গন্ধ।

নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক নতুন বিপদ।

পাশের সীটে বসা ভদ্রমহিলা হড়হড় করে বমি করে দিলেন। সামলাতে পারেন নি নিজেকে। আপনার পায়েও কিছু লেগেছে। একটা ঘৃণার শিরশিরানি আপনার মেরুদণ্ড বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

কারণটা আর কিছুই নয়—বেগজনিত অসুস্থতা ( মোশান সিক্‌নেস )।

আপনার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে তাই ওসব আপনার হয় না। যাঁদের অভ্যেস নেই তাঁদের এই বিচিত্র অসুস্থতায় ভুগতে হয়।

সী সিকনেস তো সমুদ্রযাত্রায় নতুন

যাত্রীদের ত্রাস। উড়োজাহাজে, লিফ্‌টে, নৌকায়, নাগরদোলায়, বাসে, এসকালেটরে, এমন কি সাধারণ দোলনায় চড়লেও এই অসুস্থতার কবলে অনেককে পড়তে হয়।

মাথাটা ঝিমঝিম করা বা ঘোরা, গা গুলিয়ে ওঠা আর বমির ভাব হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। শুধুমাত্র বেগবান জিনিষ দেখেও অনেকে এই অসুখে আক্রান্ত হন। এক ভদ্রলোককে জানি যিনি একটা থ্রী-ডাইমেনশানাল ইংরেজী ছবি দেখতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক সময় বড় বড় সিগারেট কারখানার কর্মচারীরা তৈরী সিগারেটের চলন্ত লাইন দেখে পীড়িত হয়ে পড়েন বলে শোনা যায়।

সাধারণত এই অসুস্থতার সৃষ্টি মস্তিষ্কের ভেতরকার সাম্য বা স্থৈর্য রক্ষার যন্ত্র (অরগানস অফ ব্যালান্স) থেকে। মাথার ভেতরে দুটো কানের পাশেই খুব ছোট ছোট তিনটি তরলপদার্থপূর্ণ অর্ধ-বৃত্তকার নালী আছে। ঐ নালীতে এক-প্রকার ছোট ছোট লোম থাকে। নড়া-চড়া করলেই তরলপদার্থের সঙ্গে লোমগুলোও দুলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে যায় মগজে (ব্রেন)। নড়া-চড়া যদি অস্বাভাবিক হয় তাহলে মগজের বমন কেন্দ্রে (ভমিটিং সেন্টার) সেই খবর পৌঁছায়। সেই সঙ্গে মগজের অন্যান্য অংশও ঐ নালীর সাহায্যে খবর পেয়ে যায়। মস্তিষ্কের যে স্নায়ু-কোষ মানুষকে সতেজ রাখে ঐ খবর সেখানে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় যার ফলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মোটামুটি এই হলো বেগজনিত অসুস্থতার কারণ।

পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে বারবার নানাদিকে শরীর চালনার বদলে শুধু-মাত্র একদিকে চালিত হতে দিলে কষ্ট কম হয়।

এরোপ্লেনে চলার সময় এয়ার সিক-নেস অনেক কমে যায় যদি প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে আসনের পেছনে মাথা রাখার ব্যবস্থা থাকে। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে এই অসুস্থতা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে নড়া-চড়া না করান হয় তাহলে মস্তিষ্কের ভেতরকার নালীর তরলপদার্থ কম দোলে ফলস্বরূপ বমি করার ইচ্ছাও অনেক কমে যায়।

চলন্ত অবস্থায় দিগন্ত রেখা যদি চোখের আড়াল হয়ে যায় তাহলেও অসুস্থ হবার সম্ভাবনা আছে। একটা মিলিটারী পরীক্ষায় এই সত্যতা অনেকাংশে প্রমাণিত হয়েছে। একটা যুদ্ধ জাহাজে সৈন্যরা নত হয়ে থাকায় কামান ছোঁড়ার জায়গার (গানওয়াল) ওপর দিয়ে দিগন্তরেখা ওরা দেখতে পাচ্ছিল না। সেই অবস্থায় ৩০% অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাঁড়াবার পর দিগন্ত-রেখা ওদের চোখে পড়ল। তখন মাত্র ১১% অসুস্থ রইল।

নাক অনেক সময় চলমান মানুষের কষ্টের কারণ হয়। সমুদ্রে জাহাজের ডেকের চেয়ে বন্ধ কেবিনে থাকা অবস্থায়ই যাত্রীরা সী সিকনেসে বেশি আক্রান্ত হয়। এই অসুস্থতা সময় সময় অন্য যাত্রীর দেহেও সংক্রামিত হতে দেখা যায়।

পুরুষ বা শিশুর তুলনায় স্ত্রী-লোকেরাই এই রোগের শিকার হয় বেশি। মেয়েরা-ঋতুর সময় অধিক স্পর্শ-কাতর হওয়ায় একটুতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

যদিও খাবারের সঙ্গে এই অসুস্থতার বড় বেশি একটা সম্বন্ধ নেই তবুও খালি-পেটে বা খুব ভরাপেটে যাত্রা করা ঠিক নয়। যতদূর সম্ভব নিয়মিত খাবারের ওপর টিকে থাকাই ভাল।

রকমারি সাবধানতা অবলম্বন করার পরও অনেক এই বিচিত্র ধরনের অসুস্থতার কবলে পড়েন। আজকাল অনেক নতুন ওষুধ বেরিয়েছে এর জন্যে। কিছু এমনিতেই কিনতে পাওয়া যায় আবার কিছু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশানে। সময় সময় কোন কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়া অন্যরকমভাবেও হয়। মুখ শুকিয়ে যায় বা ঘুম-ঘুম জড়তায় শরীর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

কিছুদিন আগে প্লেনে এক যুবতী আকাশচারিণী হঠাৎ পাইলটের কেবিনের দিকে ছুটে যায়। বাধা দেয়া সত্ত্বেও পাইলটের কোলে বসার চেষ্টা করে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সুন্দরী বেগজনিত অসুস্থতার হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাবার জন্যে একটার বদলে ছটা প্রতিষেধক টেবলেট খেয়ে ফেলেছে। ফলে বিভ্রাট।

তাই বলে এত ব্যবস্থার পর আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

# অপরাধের অধিনেত্রী মা-বেকার

সুনীলচন্দ্র বসু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধতত্ত্বের ইতিহাসে অপরাধের অধিনেত্রী মা বেকারের নাম রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল বুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) একদিন মা বেকারকে জনসাধারণের 'এক নম্বর শত্রু' বলে মনে করতো। একটি সরলা নারীর অতিরিক্ত অর্থ স্পৃহা একদিন তাকে অপরাধীর তালিকাভুক্ত করেছিল। অর্থের জন্য মা বেকার একটির পর একটি অপরাধ

করে গেছেন। এমন কি মা বেকার তাঁর ছেলেদেরও সেই পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাঘিনী যেমনি তার শাবকদের মানুষ করে ঠিক সেইভাবে মা বেকার তাঁদের মানুষ করেছিলেন। মা বেকার ছেলেদের শিখিয়ে ছিলেন কি ভাবে শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়তে হয়। এমনি ক'রে মা তাদের পুরোপুরি শয়তান করে তুলেছিলেন। মা বেকারের সংগে তাদের জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা নিম্নে বর্ণনা করা হ'লো।..

ওক্‌লা হোয়া উত্তর ফ্লরিডা শহরের অংশ হ'লেও মোটেই আকর্ষণীয় ছিলনা। আজ থেকে ২৫ বছর আগে এখনকার পরিবেশ আজকের চেয়েও ছিল অনেক শান্ত। এমনি দিনে হঠাৎ একদিন ওক্‌লা হোয়া সাময়িক ভাবে মেশিন গান, রাইফেলের গুলী বিনিময়ের শব্দে আর আগুনের শিখায় রক্তাভ হ'য়ে উঠলো। কুখ্যাতির জন্যে সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলো।

১৯৩৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী সকালবেলা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের একদল এজেন্ট যাঁরা 'জি ম্যান' নামে খ্যাত তাঁরা একখানি সাদা দোতোলা বাড়ীকে ঘেরাও করে ছ' ঘণ্টা ধরে বাড়ীর মধ্যেকার জিনিসপত্র তছনছ করেছিল। বাড়ীর আসবাব পত্র ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল বাইরে। পাম গাছগুলি আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছিল। জানলার কাঁচ, আরসি ভেঙে চুরমার হ'য়ে যেতে লাগলো মেশিনগান, ও রাইফেলের গুলীতে। কাঠের বাড়ীর ভাঙা টুকরোতে। শেষ পর্যন্ত অপরাহ্ণ কালে গুলীবর্ষণ আর ধ্বংসলীলা স্তব্ধ হ'লো। শান্ত হ'লো পরিবেশ। ঐ বাড়ীর যে লোকটা পরিবারের রান্নার কাজ করতো তাকে ভেতরে পাঠানো হ'লো "মিস্টার আর মিসেস ব্যাক বার্ণ" বেঁচে আছেন কিনা দেখবার জন্যে। লোকটি ভেতর থেকে চিৎকার ক'রে জানালো 'ওরা মরেছে'।

আশ্বাস পেয়ে 'এফ. বি. আই'-এর এজেন্টরা অগ্নিগর্ভ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রলো। দোতলায় শোবার ঘরে গিয়ে দেখলো, ষাট বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা বুকের কাছে একটি মেশিনগান আঁকড়ে ধরে মরে পড়ে আছে। আর তার পাশে পড়ে আছে দশ হাজার ডলারের একটি থলি। বৃদ্ধার অদূরে মরে পড়ে আছে ওরই ছেলে ফ্রেড। ওর এক হাতে বন্দুক আর এক হাত বাড়ানো রয়েছে জননীর দিকে। হয়তো মৃত্যুকালে সে জননীর হাত ধরতে চেয়েছিল। নারী অপরাধিনীকে 'জি-ম্যানেরা' জীবিত অবস্থায় ধরতে পারেনি,—আরো উল্লেখযোগ্য এই যে এই সংঘর্ষে ৫০০ শত রাউন্ড গুলী কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস অপরাধী হননের কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যে লেগেছিল।

হ্যাঁ, এমনি ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে মিসেস এ্যারি জোনা ক্লার্ক ওরফে মা বেকারের রোমাঞ্চকর জীবনের। মা'কে ঘিরে পড়েছিল তার ভালোবাসার জিনিসপত্রগুলি অপরাধী সন্তান আর অপরাধে অর্জ্জিত কয়েক লক্ষ ডলার। মা বেকারের মৃত্যুতে শুধু ক'জন অপরাধীরই জীবনাবসান ঘটেনি, মা বেকারের মৃত্যুতে অবসান ঘটেছিল একটি অপরাধী পরিবারের।

বেকার ছিলেন অপরাধের প্রতি সুকণ্ঠে ধ্বনিত কিন্তু,
মা বেকারের মৃত্যুর সংগে মার্কিন দলিল বলেন তো
যুক্তরাষ্ট্রের শেষ রাজত্বেরও অবসান নারী অবস্থা ছে কেটি

মরাত্মক গুলি বিনিময় হল

ঘটে। এই গুণ্ডারাজ্যে বেকার-কারাপিস ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।

মা বেকার ১৮৮০ সালে মিশৌরীর এ্যাস গ্রোভে জন্ম গ্রহণ করেন। ভালো নাম এলিজা জেনা ক্লার্ক ডাক নাম "কেটি"। এ্যাসগ্রোভের অধিবাসীদের কেউ সুন্দরী তন্বী কৃষ্ণা কেশী কেটি সম্পর্কে কোনো অশিষ্ট উক্তি করতে ছিল নিয়মিত চঞ্চলগামী ভঙ্গিমতী তরুণী, তার হলো অজ্ঞাত তার তন্বী দেহ মেদবহুল হল, তার তীক্ষ্ণ সুকণ্ঠ নেমে এলো গভীর উদারায়। ওর সংগে অল্পবয়সে বিবাহ হলো খামার মজুর নিরীহ জর্জ বেকারের। কেটি হলো চারটি সন্তানের জননী। হঠাৎ কেটির ওপর অসন্তুষ্ট গেল। স্বামীর ওপর জুলুম চলতে লাগলো অর্থের জন্যে

বেচারী স্ত্রীর দাবী মেটাতে

হলে কেটি ঘৃণ্য পথ ধরলো—যে পথ অপরাধের।

কেটি বেকার তার ছেলেদের ভালবাসত (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের পরিচালক মিঃ জে. এডগার হুভার এই ছেলেগুলিকে পরে "নরকের কীট" বলে উল্লেখ করেন)। অপরাধিনী মা বেকার পুলিশ সহ অন্য কেউ যদি তার কাজে ও আচরণে হস্তক্ষেপ করতো তাহলে ক্ষেপে উঠতেন। মা বেকারের একমাত্র আরাধনা ছিল অর্থ উপার্জন। আর এই অর্থ উপার্জনের জন্যে তিনি ছেলেগুলোকে অপরাধী, চোর, ডাকাত আর শয়তান তৈরী করেছিলেন। ছেলেরা শীঘ্রই নানা অপরাধে ওস্তাদ হয়ে উঠলো। নানা ধরনের অপরাধ করে আইন ভঙতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ১৯১০ সালে মা বেকারের বড় ছেলে হারমান ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হলো। লয়েড, অর্থার, আর ফ্রেড এই তিনটি ছেলে তখনও বাইরে থেকে নানা ধরনের অপরাধজনক কাজ করতে লাগলো। এদের কার্যস্থল হলো ওকলাহমার তুলসা সহর। এরা বাইরে থেকে বন্ধু বান্ধবদের এনে নানা ধরনের অপরাধের কাজের গবেষণা চালাতে লাগলো। আর মেতে রইল নতুন নতুন অপরাধ সংগঠনের পরিকল্পনায়। মা বেকারের বাড়িটি অপরাধীদের গুহা বিশেষ হয়ে উঠলো। আর মা বেকার পরিচিত হলেন গুহামাতারূপে। ছেলেরা পাখা-মেলে উড়তে শিখিল। মা বেকারের পরিচালনা ব্যতিরকে তারা কেউই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারলো না। ১৯২১ সালে লয়েড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেল ডাকাতির অপরাধে ধরা পড়ে ২৫ বছরের জন্যে কারারুদ্ধ হলো। অপর ছেলে আর্থার ওকলাহামা স্টেট হাসপাতালের ডাকাতির সময় প্রহরীকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত মায়ের একান্ত ভালোবাসার ধন ফ্রেডী সুদূর কাপসাস্টেটের কতকগুলি ডাকাতি ও চুরির হাঙ্গামায় পড়ে দশ বছরের জন্যে কারাবন্দী হলো।

মা'র ছেলেরা কারারুদ্ধ হলো। মা রইলেন ওদের ছেড়ে বাইরে। মা কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন না। তিনি একদল ধুরন্দর আইনজীবিকে নিয়োগ করলেন ছেলেদের কারামুক্তির জন্যে। অর্থ আসতে লাগলো নানা ধরনের অপরাধীর মাধ্যমে। যদিচ মা তেমন লেখাপড়া জানতেন না তবে ব্যাঙ্ক ডাকাতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা। মায়ের পরামর্শে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতারিত হয়েছে। স্বামী পরিত্যাগ করে গেছেন এবং ছেলেরা অনুপস্থিত। কেটি রোমান্স জমিয়ে তুললো বিল পেপটর অর্থার ডানলপের সংগে। ডানলপের সহযোগিতায় কেটি ফেঁপে উঠতে লাগলো। এমনি সময় মা'র জীবনে একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেল। ১৯২৭ সালে ওর সবচেয়ে দুর্বল চরিত্রের বড় ছেলে হারমেন বেকার কান্সার একজন পদস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হলো। জেলেবন্দী হয়ে রইল অপর তিনটি ছেলে।

দুঃখের মধ্যেও আনন্দের ঝিলিক আনলো ফ্রেডি। ১৯৩১ সালে ফ্রেডি মা ও আর সকলকে অবাক করে দিয়ে এক বন্ধুকে নিয়ে উপস্থিত হলো বাড়িতে। ছেলেটির বয়স একুশ। ভালো নাম এসডিন

কারপিস্, ওকে সকলে ডাকে 'ওল্ড ক্রিপি'। অল্পভাষী কিন্তু অত্যন্ত চতুর ছেলে। মা এলভিনকে আনন্দের সংগে গ্রহণ করলো। আর কারপিস্ও খুশী হ'লো তার আশ্রয় পেয়ে। অন্ধকারের দেশের সংগে কারপিসের যোগাযোগ ছিল। তাই মা অন্য দলের ওপর আর নির্ভর না ক'রে তার পোষ্যপুত্রকে (কারপিস্কে) টেনে নিলেন নিজের দলে। আর বেপরোয়া ভাবে মধ্য পশ্চিমের ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতারিত করতে লাগলো।

কিন্তু সুখের দিন বেশীদিন রইল না। এই অদ্ভুত চরিত্রের নারী বেশীদিন কারুর কাছে অপরিচিত রইল না। সকলেই তাঁকে চিনে ফেললো। এমনি সময় একটি ঘটনা ঘটে গেলো। মিশৌরীর এক সন্দেহ-পরায়ণ সেরিফকে হত্যা ক'রে বসলো এভলিন আর ফ্রেড। মার্কিন পুলিশ বাহিনী তাদের পিছন নিল। মা তার বন্ধু ডানলপকে নিয়ে দলবল সহ লোটাকম্বল গোটাতে বাধ্য হ'লো। কেটি আর ডানলপ, মিনিসোটার সেন্টপল শহরে গিয়ে মা ও বাপ সেজে ব'সে রইল সন্তানদের আগমন প্রতীক্ষায়। দলের লোকেরা গোপনে এখানে যাতায়াত আরম্ভ ক'রে দিল। এমনি সময় মায়ের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যাবজ্জীবন কারাবাস থেকে মুক্তি লাভ ক'রে ঘরে ফিরে এলো দুই ছেলে। মা খুশী হ'লো ছেলেদের কাছে পেয়ে।

'জি' ম্যানেরা কিন্তু মা ও তার দলটিকে অনুসরণ করতে ছাড়লো না। ছায়ার মতো তাদের পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগলো। মা এবার গা ঢাকা দিল ক্যানসাস শহরে। মায়ের বালক বন্ধু এই ভাবে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর ব্যাপারে ক্রমেই ভীত হ'য়ে পড়তে লাগলো। মা ডানলপের গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত একদিন মিনিসোটায় ওয়েফ স্টালেকের একটি যুবকের বুলেটে ক্ষত বিক্ষত মৃত দেহ পাওয়া গেল। এবং তার ক'দিন পরেই যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তারই অনতিদূরে আবিষ্কার হ'লো মেয়েদের হাতের একটি রক্তমাখা দস্তানা। (বস্তুত মৃতদেহটি মা বেকারের বাড়ী-ওয়ালীর ছেলের। যে একখানি ছবি দেখে পুলিশকে ওদের বাড়িতে মা বেকারের অবস্থানের কথা জানায়।)

১৯৩৯ সালে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হ'লো লিন্ডেনবার্গের ছেলে চুরি এবং তার মুক্তির জন্য বিরাট অংকের মুক্তি পণের দাবীতে—মা ও এই খবরে আঘাত পেয়েছিল। মা এবার ব্যাঙ্ক ঠকানোর পথ ছেড়ে অন্য ব্যবসা ধরলো। ১৯৩৩ সালের জুন মাসে সেন্টপল ষ্ট্রীটের একটি লোককে মা বেকারের দল বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে সরিয়ে ফেললো। হতভাগ্য লোকটি সহরের একজন ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে। নাম উইলিয়াম এ হ্যামাম। অজ্ঞাত লোপাটকারীর দলের তরফ থেকে মুক্তি পণ দাবী করা হ'লো একলক্ষ ডলার। পিতা মুক্তিপণ দিয়ে ছেলেকে উদ্ধার করলেন। ১৯৩৪ সালের সেন্টপল ষ্ট্রীটের খ্যাতনামা ব্যাঙ্কার এড্ ওয়ার্ড জি ব্রিমারকে সরিয়ে ফেলা হ'লো। গোপন একটি স্থানে। মুক্তি পণ দাবী করা হ'লো দু' লক্ষ ডলার। এই মুক্তি পণ দিলে ব্রিমারকে পাওয়া গেল—মিনিস্টোসের কাছে—রবে-স্টারে। মা বেকার এই সময় বিখ্যাত হ'য়ে উঠলো তার অপরাধ প্রবণতা ও ঐশ্বর্য

এই উভয়বিধ কারণে। ব্যাঙ্ক প্রতারণা ও লোকাপহরণ—এই দুই কাজই মা বেকার একসংগে চালাতে লাগল।

মা তার দুই ছেলে আর কারপিসকে নিয়ে উঠে এলো চিকাগোর সাউথ সোর ড্রাইভের একটি বিলাসপূর্ণ সুইটে। কিন্তু, মা'র দ্বিতীয় মানুষ চুরির কাজটি 'জি' ম্যানদের অনুসন্ধানের সূত্র দিয়ে গেল। এ্যাডুয়ার ড্রিমা পুলিশকে জানালো অপহরণকারীরা কিছু দূরে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে গাড়িতে তেল ভ'রেছিল। অনুসন্ধানে চারিটি খালি গ্যাসলিন-এর টিন পাওয়া গেল। আর ঐ টিনগুলির একটিতে পাওয়া গেল কারপিসের আঙুলের ছাপ। এফ, বি, আই কারপিসকে একটি অপরাধের জন্য খোঁজ করছিল। অতঃপর এবার তারা সমগ্র বেকার কারপিসের দলটিকে বিচারের কাঠ গোড়ায় এনে দাঁড় করালো।

দলের বাইরের সাহায্যকারীরা এক একটি ক'রে ধরা পড়তে লাগলো। মা সিকাগোর খবরের কাগজগুলিতে এর সংক্ষিপ্ত সংবাদ আর মুখে মুখে খবর পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। অতঃপর মা'র সন্তানদের ও কারপিসের প্রতি অস্বাভাবিক স্নেহ তাদের এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটালো। সাউথ সোর ড্রাইভের সেই সুসজ্জিত সুইটে একদিন সকালে ডাঃ জোসেফ মর্গার নামে অন্ধকার জগতের একজন মাতাল ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটলো —মা'র নির্দেশে তাকে কিছু কাজ করতে হবে। ফ্রেড, এলভিন, অর অর্থার ডাক্তারের এর হাতে আত্মসমর্পণ করলো ছোটখাটো অস্ত্রপচারের জন্যে। ডাক্তার ওদের বুড়ো আঙুলের ছাপ চেঁচে দিলে। কারপিস্ আর দু'ছেলের মুখের আদল বদলাবার জন্যে কানের লতি ছেঁটে ফেলে প্লাস্টিক সার্জারি করা হ'লো। ডাক্তারের অস্ত্রের মুখে ওরা পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগলো। মা নির্বিকার ও স্তব্ধভাবে বসে উন্মাদ ডাক্তারের অস্ত্র কাজ দেখতে লাগলো আর শুনতে লাগলো ছেলেদের গোঙানী। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সবই মিথ্যা হ'য়েছিল। মা ডাক্তারকে আদেশ করলো তার সংগে অপেক্ষমান মোটরে আরোহণ করতে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারকে চিরকালের জন্যে স্তব্ধ ক'রে মা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো।

কিন্তু, এফ, বি, আই এর বিস্তারিত জাল ক্রমশই গুটিয়ে আসতে লাগলো। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে—মা চিকাগোর দোকান পাটের ঝাঁপ বন্ধ করে শহর ত্যাগ ক'রলো। বাড়িতে রইল শুধু আর্থার বেকার। মা সরে যেতেই 'জি' ম্যানরা ঝাঁপিয়ে পড়লো আর্থার বেকারের ওপর। ওর দু'জন বিভ্রান্ত সহকারী পালাতে গিয়ে মারা পড়লো। আর্থার মা'র শিক্ষা অনুসারে 'জি' ম্যানদের অনুগমন করলো। কিন্তু, ওরা আর্থারের মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত বাড়ির ঘর খোঁজাখুঁজি ক'রে ফ্লোরিডা অঞ্চলে বড় সাদা বাড়ির সন্ধান করলো। একটি পরিত্যক্ত মানচিত্রে। যেটিতে একটি লাল বৃত্ত দেওয়া ছিল। আর্থার অসাবধানতাবশতঃ মানচিত্রটি ঐ ঘরে ফেলে গিয়েছিলো।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একটি জঙ্গী বিমানে 'জি' ম্যানের দল ছোটোখাটো একটি গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে ফ্লোরিডার উদ্দেশে অভিযান আরম্ভ করলো। ঠিক

ঐ দিনেই একজন নারী ও একজন পুরুষ ওক্লায়োয়ার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। এদের নাম মিঃ ও মিসেস ব্ল্যাকবার্ণ। আসলে পুরুষটি হচ্ছে এলভিন কারপিস্। এবং নারীটি তার বান্ধবী। বিদায়দাত্রী ও গৃহকর্ত্রী হচ্ছেন মা বেকার। মা বেকার আত্মগোপন করবার জন্য দু'মাস পূর্বে কঠিনভাবে প্রস্তুত গাছপালা ঢাকা এই সাদা বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছিলেন। আর এইখানে মা ও ছেলে মিঃ সামার ও মিসেস সামার নাম গ্রহণ ক'রে নিজেদের পরিচয় দেন। পাড়ার লোকেরা মিসেস সামারকে 'ঘর কুনো' আর তার তরুণ স্বামীকে 'স্পোর্টস ম্যান' আখ্যা দিয়েছিল। কারপিস দিন কাটাচ্ছিল মাছ ধরে আর পাখী শিকার ক'রে।

এই বাড়িটিতে মা আসন্ন শীতকালের উপযোগী রসদ যোগাড় ক'রে রেখেছিল। এই রসদগুলি হলো দু'টি মেসিন গান, তিনটি অটোমেটিক পিস্তল, এগুলির উপযুক্ত খাদ্য পাঁচটি বুলেট ফুড জামা এছাড়া ফ্রেডের মোটরে লাগানো ছিল একটি সর্টওয়েভ রেডিও। যার দ্বারা সে ঘোরাফেরার সময় বহির্জগতের খবরাখবর রাখতো।

১৫ই জানুয়ারীর রাত পর্যন্ত সবই শান্ত ছিল। দু'জন ফেরারী সেদিন সকাল সকাল বিশ্রাম করতে গেলো। সেদিন তারা প্রয়োজন বোধ করেনি ভাগ ক'রে পাহারা দেবার। মা এতই নিশ্চিন্ত ছিল যে, দশ হাজার ডলারের থলেটি শোবার ঘরে ওমনিই ফেলে রেখেছিল। ফ্লোরিডার এই বাড়িতে মা ও ফ্রেড যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন এফ. বি. আই-এর এজেন্টরা নিঃশব্দে এসে বাড়ি থেকে বেরোবার ও ঢোকবার সকল পথ আটক ক'রে বাড়িখানি ঘিরে ফেললো। ওরা অপেক্ষা ক'রতে লাগলো ভোরের আলো ফোটার জন্যে। আস্তে আস্তে দিনের আলোতে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো সাদা বাড়িটি। ভারপ্রাপ্ত একজন এজেন্ট চেঁচিয়ে ডাকলো—'ফ্রেড, মা বেকার।' সে একাধিক বার চিৎকার ক'রে থামলো।

আবার হেঁকে বললো, 'আমরা পুলিশ, কর্তব্যকর্ম ক'রতে এসেছি। তোমাদের চাই। নিঃসংকোচে বেড়িয়ে এসো। কেউ তোমাদের আহত করবে না।

সমস্ত স্তব্ধ!

তারপর ঘুমভাঙা নারীকণ্ঠে কে বললো, 'নরকে যাও।' অতঃপর উভয় পক্ষে মারাত্মক গুলি বিনিময় আরম্ভ হ'লো।

পরিণামের কথা আগেই উল্লেখ ক'রেছি।

# আপনার শব্দ ভাণ্ডার পূর্ণ করুন

## ১১০ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর

**১। বিভাবরী—**
(গ) রাত্রি
"আশীর্বাদ করিলাম, অবসান হবে
বিভাবরী"—"মালিনী"—রবীন্দ্রনাথ

**২। তৈলঙ্গ**
(ঘ) দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলবিশেষের
অধিবাসী

**৩। বিতান—**
(গ) চাঁদোয়া, মণ্ডপ

**৪। মক্ষিকা—**
(ক) মাছি

**৫। কালকূট—**
(খ) তীব্র বিষ
"হায় সূর্পণখা
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে, কালকূটে ভরা
এক ভুজগে"—মেঘনাদবধ কাব্য

**৬। প্রদোষ—**
(ঘ) সন্ধ্যা

**৭। কাণ্ডারী—**
(খ) মাঝি

**৮। নীপবন—**
(ক) কদম্ব গাছের বন
"এসো নীপবনে
ছায়াবীথি তলে এসো"—রবীন্দ্রনাথ

**৯। অজাতশ্মশ্রু**
(গ) যাহার দাড়ি উঠে নাই

**১০। বিদগ্ধ—**
(ঘ) রসিক

**মন্তব্য :**
১০—৯ ঠিক হলে·····খুব ভাল
৮—৭ ঠিক হলে····· ভাল
৫—৬ ঠিক হলে····· মন্দ নয়

যতদিন না জাতি নির্বিশেষে বিবাহ খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি হচ্ছে
তদ্দিন এদেশ উন্নতি করতে পারে না

# মামলি দুপের কুকুর

**বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ**

গুন্তকল থেকে ব্যাংগালোর যাওয়ার পথে মাকলি দুর্গ নামে একটি ষ্টেশন পড়ে। ষ্টেশনের কাছেই ছোট্ট পাহাড় রয়েছে। সে পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। ষ্টেশনের অন্য-পারে গভীর খাত। জায়গাটা উর্বর। ষ্টেশনের কাছেই এক বিরাট অট্টালিকা রয়েছে। কোন এক যুগে কোন এক বিত্ত-শালীর অজস্র টাকা ঢেলে করা ইমারত।

মাকলি-দুর্গ খুব ছোট্ট ষ্টেশন। ষ্টেশনের গা-ঘেঁষে একটি ছোট্ট দোকান। গাড়ি এলে ঐ দোকান খোলে আর ঐ দোকান খোলার সংগে একটা কুকুর কোত্থেকে যেন এসে দোকানের সামনে বসে দোকানের কাঁচের ভিতরে রক্ষিত খাবারের দিকে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দোকান পরিষ্কার করার সময় অথবা কোন খদ্দেরের হাত ফসকে খাবার পড়ে গেলে সে খায়। একদিন একটি ছেলে বাসি পাকোড়া কিনেই শুকে ফেলে দিল। কুকুরটা এক লাফে ঐ পাকোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবগুলো একসংগে গিলে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণেই কেসে নামি করে ফেলল। পাকোড়া আর পেটে গেল না। ট্রেন যাওয়ার সংগে সংগে দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। কুকুরও সেখান থেকে সরে পড়ে

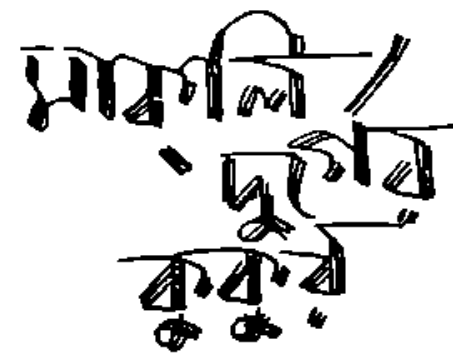

ঝরণার জল খেয়ে সামনের পা-গুলো বাড়িয়ে দিয়ে ঘাসজমির উপর ঘুমোনোর চেষ্টা করে। কালেভদ্রে বন্য মেষের পিছনে ধাওয়া করে।

কুকুরটাকে দেখতে ভাল। দ্রুত ছুটতে পারে। স্বচ্ছ বায়ু, ঝরণার জল সেবন করে সে মোটামুটি ভালই ছিল।

সেই ছোট্ট পাহাড়ী এলাকায় কখনও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। জনবসতি অত্যন্ত কম, নিতান্তই ছকবাঁধা জীবন সকলের। স্টেশনে গাড়ি ঢুকলে সামান্য কর্মচঞ্চল হয়ে পড়ে জায়গাটা। গাড়ি চলে গেলে ঝিমিয়ে পড়ে।

একবার এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক মাদী কুকুর নিয়ে স্টেশনে নামল। কুকুরটি বিলিতী। তাকে দেখেই এই কুকুরটা তাকে ঘিরে ঘুরঘুর করতে লাগল। মাদি কুকুরও প্রথম দর্শনে যেন ঐ কুকুরটাকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু মাদি কুকুরের মালিকের কাছে ছাড়া থাকায় প্রেমিকার কাছে এগোতে সাহস পায়নি। মিটমিট করে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। আরও একটা ভয় যেন কুকুরটার আছে: লোকে যেন তাকে অভদ্র না মনে করে। শহরে পালিত মাদি কুকুরটি সাগ্রহে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। কিছুক্ষণ পর মালিক তাকে দোরগোড়ায় বেঁধে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। প্রেমিক প্রেমিকারা মিলনের সুবর্ণ সুযোগ পেল।

স্টেশন মাস্টার সামান্য লেখাপড়া জানা লোক। গল্প গড়াতে গড়াতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় পর্যবসিত হল। স্টেশন-মাস্টার বললেন, দেখুন, বর্ণবৈষম্যের মূলোচ্ছেদন কিছুতেই আমরা করতে পারিনা। আর তা করা উচিতও নয়। পূর্বপুরুষরা যা করে গেছেন ঠিকই করেছেন। তারা যে উদ্দেশ্যে এসব করেছেন তা সঠিকভাবে অনুধাবন না করে রাতারাতি এসব তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা এবং অনুচিত।

—দেখুন, সেকাল আর একালে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আজকের যুগ প্রগতির যুগ, দ্রুত বিকাশের যুগ। কোনদিন কি একবার ভেবে দেখেছেন এই পাঁচা সমাজ ব্যবস্থার জন্যে আমাদের অগ্রগতি কেমন ব্যাহত হচ্ছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মাঝে এই ব্যবস্থা যেন দেওয়াল তুলে দিয়েছে। প্রত্যেকে তার চেয়ে নীচ জাতির মানুষের উপর খবরদারি করে। যতদিন না এই ভেদ মিটছে, যতদিন না জাতি নির্বিশেষে বিবাহ, খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি হচ্ছে তদ্দিন এদেশ উন্নতি করতে পারে না।—আমি স্বীকার করছি মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকা উচিত নয়। মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভাব না থাকুক এটা আমারও কাম্য। কিন্তু আর যাই হোক অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে নই। আমার ধারণা শুধু কতগুলো অসবর্ণ বিয়ে হয়ে গেলেই এই মনোভাব আমাদের কেটে যাবে না। এরজন্য চাই আমাদের মনের পরিবর্তন।

ঐ ভদ্রলোক মনে মনে হেসে আর তর্ক বাড়ালেন না। ভাবলেন পাহাড়ী এলাকার ছোট্ট স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে অত বড় বড় বিষয়ে তর্ক করা বৃথা। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ছাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার নজর পড়ল কুকুরটার ওপর। তার কুকুরও বোধহয় মালিকের মত অসবর্ণ বিয়ের পক্ষে। তাই ঐ পাহাড়ী কুকুরের কাছে নিজেকে সে সমর্পণ করেছে। ওদের কাণ্ড দেখে ভদ্রলোক তেলে বেগুনে চটে গেলেন। ভদ্রলোক হয়ত কুকুরদের বেলায় প্রাচীন মত বহাল রাখবার পক্ষ-

পাতী। তৎক্ষণাৎ পাহাড়ী কুকুরটিকে ছেড়ে দিয়ে বেদম প্রহার করলেন। কুকুর-টাও সেখানে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতে

স্টেশন মাস্টার মুখ টিপে হাসলেন। ঐ হাসি ভদ্রলোকের নজরে পড়ায় বিরক্তি বোধ করলেন। পরক্ষণেই স্টেশন মাস্টার

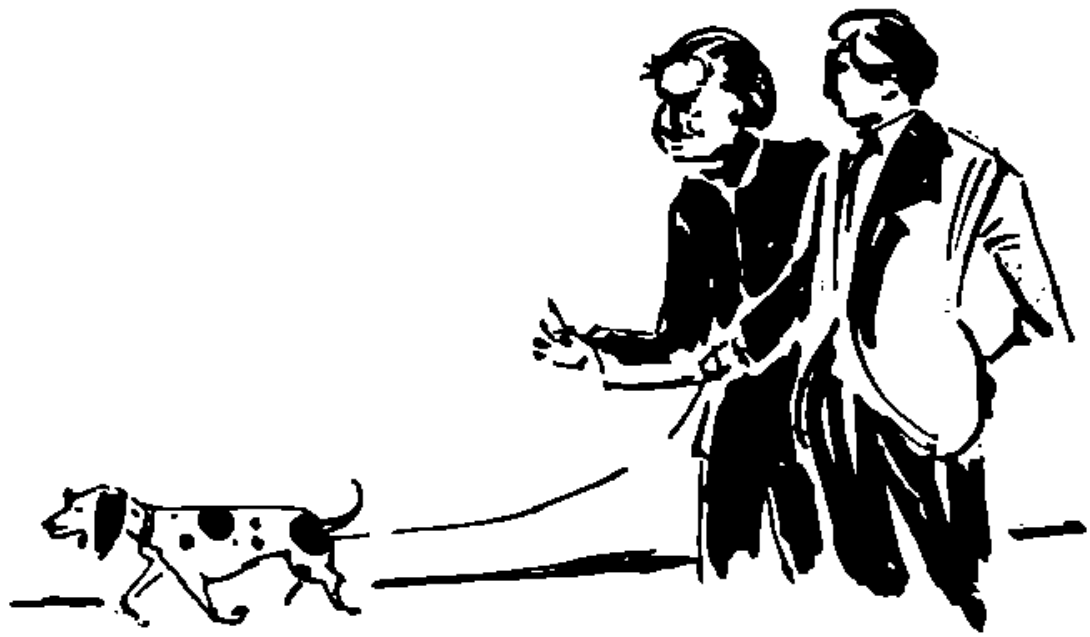

ক্যাঁও ক্যাঁও করতে করতে সেখান থেকে সরে পড়ল

লাগল। শেষে ছাঁড়র অসংখ্য আঘাতে কোমড় ভেঙ্গে যাওয়ার পর ক্যাঁও-ক্যাঁও করতে করতে সেখান থেকে সরে পড়ল।

কুকুরের কান্না শুনে স্টেশন মাস্টার বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়েই সাফাই গাইলেন, আপনি আমার কুকুরটা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। খুব বড় জাতের কুকুর। এটা মাদী কুকুর। অনেক চেষ্টা করেছি এর জন্য একটা কুকুর কেনার। কোথাও পাইনি। মাদী কুকুরটি কদিন ধরে বড় জ্বালাচ্ছে। এখন এটা ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাচ্ছি—দেখি কোন বড় জাতের কুকুরের সন্ধান পাই কিনা।

ভদ্রলোকের কুকুর সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিলেন।

—আপনার কুকুরের মুখের উপর কালো দাগ আর এমন সুন্দর লেজ আর ঘিয়ে রঙে লোম সব মিশিয়ে ভারি সুন্দর দেখছে! এর বাচ্চা হলে আমাকে একটা দেবেন কিন্তু।

ভদ্রলোক সম্মত হয়ে কুকুরের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তাকালেন। তারপর পাহাড়ী কুকুরের সংস্পর্শে আসায় তার গা বেয়ে সম্ভবত দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। তাই বাক্স থেকে সুগন্ধি সাবান বের করে কুকুরটাকে ঘসে মেজে স্নান করিয়ে নরম

তোয়ালে দিয়ে মোছা হল। ততক্ষণে ট্রেন এসে গেল। ভদ্রলোক কুকুরটিকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। পাহাড়ী কুকুর দূরে থেকে এক দৃষ্টিতে এই মাদী কুকুরটার দিকে তাকাচ্ছিল। ট্রেন ছাড়ার সময় মাদী কুকুরটি মালিকের কোল থেকে উঠে গিয়ে জানলার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ভদ্রলোক তার পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, ছি, লিলি। এসব তোমার শোভা পায় না।

আর আশ্চর্য কুকুরটিও কুমারী কন্যার মত মাথা নিচু করে পা গুটিয়ে চুপ করে বসে পড়ল। এতক্ষণে যে কুঁ-কুঁ করছিল তা আর করল না।

গাড়ি যখন নাগালের বাইরে চলে গেল তখন পাহাড়ী কুকুরটা সেখান থেকে সরল। তারপর সেই কুকুর পাহাড়ী গাছে গা ঘষে ঝরণার কাছে মসৃণ মাটি লাগিয়ে রেদে বসে কোমরের ব্যথা সারিয়ে নিল। ষোল দিনের দিন আবার স্টেশনের কাছে এল দোকানের কাছে হাজির হল। গরিব দুটো যুবক ঐ দোকানে বসে কি যেন খাচ্ছিল। কুকুরটা লোলুপ দৃষ্টি মেলে লেজ নাড়তে নাড়তে ওদের কাছে দাঁড়াল। ওরা দুজনে কথা বলছিল।

—যা দিনকাল পড়েছে কহতব্য নয়। দয়াধর্ম আর মানবতার কোন অস্তিত্ব নেই। শোষণের ক্ষুধা অনেকগুণ বেড়ে গেছে ওদের। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার দিকে তাকানোর কারও সময় নেই। এই আমার কথাই ধর না, বি. এ পাশ করে হন্যে হয়ে কত জায়গায় ধর্ণা দিয়েছি তবু চাকরি আর জোটাতে পারলাম না।

—স্বার্থপর! স্বার্থপর! তোকে আমাকে একমুঠো ভিক্ষে দেবে না। কিন্তু কুকুরকে খেতে দেবে দামীদামী জিনিস।

কুকুরের প্রসঙ্গ ভেবেই তাকেই ডাকবে ভেবে লেজ নাড়তে নাড়তে কুকুরটি আরও কাছে গিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে ওদের একজনের লাথি খেয়ে কাঁও-কাঁও করতে করতে স্থান ত্যাগ করতে হল। অনেকক্ষণ তার কান্না শোনা গেল।

কুকুর ভাগ্যে সম্ভবত সেদিনটাই খারাপ ছিল। সারাদিন ঘোরাঘুরির পরও কিছুই সে খেতে পায়নি। রাত্রে হঠাৎ স্টেশনে একটি বন্য মেষ ঢুকে পড়ল। হুলুস্থুলু ব্যাপার। যে দুচারজন ছিল পালিয়ে গেল। মানুষের আর্তনাদ শুনে কুকুর আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। কোত্থেকে ছুটে এসে একটা কামড় বসিয়ে দিল ঐ বন্য মেষের পায়। পরক্ষণেই মেষটি মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি এক লাফে মেষটির গলা ধরে ফেলল। মেষ যত চেষ্টা করল ছাড়া পাওয়ার কুকুরের কামড় আরও জোরদার হল। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরেও ছাড়া পেল না। শেষে মেষের নির্জীব শরীর কুকুরের কামড় থেকে মুক্তি পেল।

পরের দিন থেকে কুকুরের আদর হতে লাগল। স্টেশন মাষ্টার স্বয়ং কুকুরটির যাতে প্রত্যেকদিন খাওয়ার জোটে তার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ঘটনার দুচার-দিন পরে নিজের গোটা জীবনের কৃপণতার কথা ভুলে গিয়ে ঐ দোকানদার এক ঝুড়ি তেলের তৈরি খাবার এনে কুকুরের সামনে রেখে দিল। বহু বছর ধরে ঐ ঝুড়ির দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে, আজ সেই ঝুড়ি তার সামনে পেয়ে ক্ষুধার্ত

বাঘের মত যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। গোগ্রাসে সমস্ত গিলে ফেলল।

সেদিন সারারাত তার গোঙানি শোনা গেল। লোকে ভাবল হয়ত অনেকগুলো বন্য মেষের সঙ্গে একা সে মোকাবিলা করছে। কুকুরের পেটে যেন আগুন লেগে গেছে। সারাদিন সে পাগলের মত পাহাড়ে ঘুরেছে। গায়ে গা ঘষে এবার তার জ্বালা কমেনি। ঝরণার কাছের মসৃণ মাটিও যেন এবার তাকে বলল, না ভাই তোমার এ-রোগ সারিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। কুকুরটা আবার স্টেশনে ফিরে এসে গোঙাতে থাকে। তার গোটা শরীর টানছে। সাতদিন সাত রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাকে কাটাতে হয়েছে। এক-দিনেই তার চেহারা একেবারে ভেঙে গেছে। হাড়গুলোর উপর চামড়াটা যেন লেগে রয়েছে। লোকে আবার তাকে ছ্যা ছ্যা করতে লাগল। স্টেশন মাস্টারও তার দিকে ঘুরে তাকালে না। কুকুরটা স্টেশনের এক কোণে বসে ধুঁকতে লাগল।

পুরো ছমাস পড়ে ঐ ভদ্রলোক আবার স্টেশনে নাবলেন। কথায় কথায় স্টেশন মাস্টার ঐ পাহাড়ী কুকুরের কথা পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বিরক্তির স্বরে বললেন, আর ও কুকুরের নাম করবেন না। ঐ বজ্জাত কুকুরটা আমার সুন্দর কুকুরটাকে একেবারে খারাপ করে দিয়েছে। ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু কোন কুকুরকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। বাচ্চা অবশ্য দুটো হয়েছে। আপনাকে একটা সময় মত দেবো।

ওদের কথার মাঝেই কুকুরটা সেখানে এসে গেল। ভদ্রলোক ওটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ছড়ি নিয়ে মারতে লাগলেন। কুকুরের পালানোর আর ক্ষমতা নেই। সেখানেই পড়ে পড়ে মাথা এবং পা-দুটো তুলে কাঁপতে লাগল। পরে এক পোর্টার লাথি মেরে মেরে কুকুরটাকে স্টেশনের বাইরে ফেলে দিয়ে এল। সেই রাত্রেই স্টেশনের অদূরে গাড়িচাপা পড়ে শেষ বারের মত আধঘণ্টা চিৎকারে এ-সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কের ছেদ টেনে কুকুরটা মরে গেল।

আর এই ঘটনার পুরো চারমাস পর একদিন সেই ভদ্রলোক এসে একটা কুকুর ছানা স্টেশন মাস্টারকে দিয়ে বললেন, দুটোর মধ্যে একটা অক্কা পেয়েছে। নিন এটা আপনি রেখে দিন।

মাস ছয়েকের মধ্যেই কুকুর ছানাটি খুব তাগড়াই কুকুর হয়ে উঠল। কুকুরটি খুব সাহসী এবং দ্রুত ছুটতে পারে। কিন্তু ভুলেও যখন তাকে কেউ খাবার দিত সে তৎক্ষণাৎ তাকে কামড় দিতে ধাওয়া করত। বহু মাদী কুকুর তার কাছে ঘুর ঘুর করত কিন্তু সে তাদের দিকে ফিরে তাকাত না। কেউ যখন লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিত সে তার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকাত। আর যখন ঐ ভদ্রলোক এসে বর্ণবৈষম্যদূরীকরণ অথবা অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে আলোচনা করতেন তখন কুকুরটি তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকাত। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে মনে হত যেন সেই মুহূর্তেই বুঝি সে ঐ ভদ্রলোককে কামড়ে টুকুরো টুকরো করে ফেলবে?

অনুবাদ বোম্মানা বিশ্বনাথম

# চলচ্চিত্র

চিত্রদূত

প্রতিরোধের আন্দোলনে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পীরাও পিছিয়ে নেই। পার্কে পার্কে পথনাটিকা, স্বদেশপ্রেমের গান, অল্পদৈর্ঘের দেশপ্রেমের ছবি, চারিদিকে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। 'আমার দেশ' ছাড়াও, আশিষ মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত, সুধীর মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, দেবকী বসু, মধু বসু, সুশীল মজুমদার, বিভূতি লাহা, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, রাজেন তরফদার, অগ্রগামী, চিত্ত বসু, মৃণাল সেন, হরিদাস ভট্টাচার্য ও যান্ত্রিক সম্প্রদায় দেশাত্মবোধক ছবি করছেন বলে জানিয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় 'মহানগর' নামে যে চিত্রটির কাজ সুরু করেছেন তার প্রযোজনায় আছেন আর, ডি, বনশল য়্যাণ্ড কম্পানি। মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায় মূল দুটি চরিত্রে অবতরণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

ঋত্বিক ঘটকের নূতন ছবি 'সুবর্ণরেখা' বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। শ্রীরাধেশ্যাম রচিত মূল কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা ছবিটির প্রধান ভূমিকায় আছেন অভি ভট্টাচার্য, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অশোক ভট্টাচার্য, জহর রায় ও বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গীত ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ।

মৌমাছির কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে চিলড্রেনস ফিল্ম ফাউণ্ডেশান 'বিলে—নরেন' নামে একটি চিত্র প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন। পরিচালনায় রবি বসু। সুর সংযোজনা আশীষ খাঁ ও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য।

জি, ডি, প্রডাকশনের প্রথম ছবি স্বীকৃতির কাজ শীঘ্রই সুরু হচ্ছে। গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রটির পরিচালনা করছেন রবি বসু।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চার্লস লটন সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি তাঁর হলিউডের বাড়িতে ১৬ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে লটন মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে যোগ দেন। পত্রিকা হোটেল ব্যবসা ছেড়ে রয়াল একাডমী অফ ড্রামাটিক আর্ট এর ছাত্র হিসাবে যৌবনের সুরু। পরবর্তীকালে কূট চরিত্রে অভিনয় দক্ষতায় তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন। অভিনয় শিল্পের প্রচলিত রীতিকে ভেঙ্গে দিয়ে তিনি বিশ্ব চলচ্চিত্রে একটি আদর্শ-স্থান অধিকার করে বসেন। তাঁর মৃত্যু পৃথিবীর চলচ্চিত্রে একটি অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে রইলো। এর অভিনীত বিখ্যাত ছবির মধ্যে হাণ্ড ব্যাক অব নতরদাম, লে মিজারেবল, মিউটিনি অন দি বাউণ্টি, উইথনেস ফর দি প্রসিকিউশন প্রভৃতি।

লন চ্যানীর পর তাঁর হাণ্ড ব্যাকের অভিনয় আজও একটি অনন্য প্রতিভার স্বীকৃতি হয়ে আছে।

# নতুনবই

## খবরনবীশ

বড় হয়ে দেখেছি রামায়ণ শুধু অসার কবি-কল্পনা নয়। এই বর্তমান সংসার জীবনেও হাজার হাজার রাম-সীতা-রাবণ আপন মহিমায় বিরাজমান। অযোধ্যা আর লঙ্কা শুধু ভৌগোলিক নামমাত্রই নয়—কলকাতা শহরের মধ্যেই তাদের অবস্থিতি। এই কলকাতায় এ যুগেও সীতাহরণ হয়। এযুগেও সীতার বনবাস হয়। এবং এই বিংশ শতাব্দীতেও সীতার পাতাল প্রবেশ হয়।...লিখতে গিয়ে দেখলাম কলিযুগের চেয়ে সত্যযুগ অনেক সত্য। সত্যযুগে পুণ্যের জয় নিশ্চিত, পাপের পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু কলিযুগে সে বালাই নেই। এ যুগের রাবণের পক্ষে রামকে যুদ্ধে হারিয়ে অযোধ্যার সিংহাসনও দখল করা সম্ভব...এযুগ টাকার যুগ, এ যুগ কড়ির যুগ।...এ যুগের সাধারণ মানুষের সাধ—আহ্লাদ, বাসনা কামনার প্রতীক যদি হয় সতী, তো সে সমস্ত কিছুই অকালে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে মহৎ দাবীর খেসারৎ দিতে দিতে। মনুষ্যত্বকেও আজ চিনতে হয় রক্তমাংসের মূল্য দিয়ে।...'কড়ি দিয়ে কিনলামে'র আত্মকথা বলেছেন বিমল মিত্র। দুটি খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডের চতুর্থ মুদ্রণ ও দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হলো। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সংসর্গে তাঁর জীবনের বহু বসন্ত কাটিয়েছেন। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন রেজা শাহপহলবী ও রাজা ফৈজলের নিমন্ত্রণে ইরাণ ও ইরাক ভ্রমণে যান তখন লেখক রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী ছিলেন। এই দুটি দেশের সর্বত্র কবি যে সাদর অভ্যর্থনা ও বিপুল সম্মান লাভ করেছিলেন, তার পূর্ণ বিবরণ ও চিত্র পরিচয় লেখক পরিবেশন করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাণ ভ্রমণ'(৫·৭৫) গ্রন্থে। ইরাণ ও ইরাকের প্রাচীন ও আধুনিক কালের ইতিবৃত্ত, সভ্যতা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পরিচয়বহ প্রায় একশোটি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

মহাত্মা গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্য সাহিত্যে শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল একটি নাম। রমেন চৌধুরী সম্পাদিত 'গিরিশ রচনাবলী' (১ম খণ্ড, ১০·০০) সম্প্রতি প্রকাশিত হলো। প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, তিন কনে, ফণির মণি, যামিনী চন্দ্রমাহীনা, গোপন চুম্বন, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক চারটি অনবদ্য প্রবন্ধ ও বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপরিচয় সংকলনের অন্যতম আকর্ষণ। বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের বিচিত্ররূপ যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এমন আর কোন সাহিত্যে হয়নি। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাণীই যে শুধু রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করে গিয়েছেন তা নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের পথও তিনি নির্দেশ করে গিয়েছেন। এককালে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে অভিহিত করে-

ছিলেন ভারতপথিক বলে, আজ আমাদের চোখে রবীন্দ্রনাথই ভারতমহাপথের শ্রেষ্ঠ-যাত্রীরূপে প্রতিভাত। সুবিখ্যাত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ-অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ'(৮·০০) গ্রন্থে ইতিহাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করে নতুনভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা করেছেন। 'ভারতপথিক'-অংশে দেখিয়েছেন বৈদিক বৌদ্ধ ও গুপ্ত-যুগের সঙ্গে কবির আত্মিকযোগ 'যুগ-নায়ক'— অংশে দেখিয়েছেন সংশয়-দ্বন্দ্ব-দীর্ণ আধুনিক ভারতবর্ষে মহামনীষীর অবিচল নির্দেশ। আর, 'বিচিত্র'—অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রমনীষার আরও কয়েকটি বিভিন্ন দিকের আলোচনা। দণ্ডকারণ্য, ধ্যানস্তিমিত পর্বতমালা, দুর্ভেদ্য অরণ্য আর যোজন-বিস্তৃত অজানাদেশ। সে দেশের সাহিত্যমূল্য সৃষ্টি করেছেন নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ দণ্ডক-শবরী—১ম ৪·০০; ২য় ৫·০০) গ্রন্থে। নবগোপাল দাসের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস অনুচ্চারিত (৫·০০) একটি হৃদয়স্পর্শী কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কথাশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় সমরেশ বসু একটি অসামান্য উপন্যাস রচনা করেছেন। দুরন্ত চড়াই ৫·০০ তার নাম। মন্তব্য-টির সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, তবু এযে শেষ দুরন্ত চড়াই। ঠেলে ঠেলে, আরও ঠেলে ঠেলে, দম নিয়ে একেবারে শীর্ষে চড়তে হবে। তারপরে উতরাই। জীবনের এই চড়াই-উতরাইয়ের বেদনা-মধুর কাহিনী অসামান্য হয়ে উঠেছে, লেখকের মায়াময় আবেগে। ডক্টর রবীন্দ্র-নাথ রায় সম্পাদিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ সংগ্রহ (৭·০০) প্রকাশিত হলো। সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ। সাহিত্যে শিল্পকলার সমা-লোচনায়, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে, সৌন্দর্য জিজ্ঞা-সায় সর্বত্রই তাঁর অসাধারণ রূপদক্ষতার স্বর্ণোজ্জ্বল চিহ্ন। তরুণ কথাশিল্পী চিত্তরঞ্জন ঘোষের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হলো। অভিনয়ের নায়ক ও দুই দ্বীপ। বিস্তৃততর পটভূমিকায় চাণক্য সেন উপ-ন্যাস রচনায় খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস সে নহি সে নহি (১০·০০)। লেখক বলেছেন : রাজপথ জনপথ পড়ে যাঁরা খুশি হয়েছেন এ উপন্যাস তাঁদের কাছে আমার বিনীত সাহিত্যিক নিবেদন।

বাঙ্গালী পাঠকদের একান্ত প্রিয় ইন্দ্র মিত্র বর্তমান বছরের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নরসিংহদাস পুর-স্কারে ভূষিত করেছেন। উক্ত পুরস্কারের মূল্য এক হাজার টাকা। বাংলাদেশের নাট্যালয় ও নাট্যজগৎ সম্পর্কে গবেষণা-মূলক গ্রন্থ সাজঘর রচনার জন্য এই পুরস্কার। ইন্দ্র মিত্র তাঁর আসল নাম নয়, অরবিন্দ গুহ নামে যিনি কবিতা লেখেন তাঁরই ছদ্মনাম ইন্দ্র মিত্র।

সম্পাদক ॥ বীরেন সিমলাই সহঃ সম্পাদক ॥ শৈলেন ঘোষ
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ হইতে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও ৭৯/৫ বি লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা ১৪ হইতে প্রকাশিত।

(56
·001/A·
Y.E

অনন্যা ফেব্রুয়ারী সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, শুভার্থীর-দের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। তাঁরা অনেকেই আশংকিত হয়েছেন এই বিলম্বে; এবং তা হওয়া স্বাভাবিকও: যদিও এই অঘটনের পেছনে আমাদের হাত সামান্য মাত্র। কথাটা কৈফিয়তের মতো শোনালেও মুদ্রণশালার কাজের চাপের জন্য এই অহেতুক ত্রুটি—যার হাত থেকে মুক্তি নেই, আশা করি পাঠক-পাঠিকা শুভার্থীরা আমাদের অসহায়ত্ব মেনে নিয়ে মার্জনা করবেন।

পরবর্তী মার্চ সংখ্যা যাতে আবার মার্চ মাসের মধ্যে প্রকাশ করা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাসটির আকর্ষণ দু তরফের। প্রথমত গ্রন্থটির রচনাকার ফরাসীদেশের বিখ্যাত লেখক থিয়ফিল গতিয়ের। এবং গতিয়ের-এর সুন্দর এই প্রেমোপাখ্যানের বাংলা অনুবাদ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষান্তরণের স্বচ্ছতা, সহজ রচনা শৈলী কেবলমাত্র পাত্রপাত্রীর ও স্থানের নাম বাদে স্বসৃষ্ট সাহিত্য বলেই বোধ হবে। যা এখনও পাঠক-মনকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করবে।

অনন্যা যাতে অনন্য স্বাদে বর্ণে প্রত্যেকের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে আমরা সেজন্য প্রচুর যত্ন নিচ্ছি। নানা কাগজের শ্রেষ্ঠ নতুন পুরনো রচনা, অন্যান্য প্রবন্ধে বিচিত্রতার স্বাদ পরিবেশনের চেষ্টা করছি।

অনন্যা

দ্বিতীয় বর্ষ সপ্তম সংখ্যা ॥ ১৩৬৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩

# স্বদেশানুরাগ

পৃথিবীর সকল মনুষ্য ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর সকল মনুষ্যের সাধারণ পিতা, অতএব তাহারা পরস্পর ভ্রাতা স্বরূপ। কোন পারস্য কবি বলিয়াছেন, 'সকল মনুষ্য এক শরীর, সেই শরীরের কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হইলে সমস্ত শরীর দ্বারা তাহা অনুভূত হয়।'

মনুষ্যের যেমন অন্য সকল মনুষ্যকে সাধারণতঃ প্রীতি করিবার একটি প্রবৃত্তি আছে তেমনি স্বদেশকে ও আপনার জাতিকে বিশেষরূপে প্রীতি করিবার প্রবৃত্তি আছে। আপনার দেশ মরুভূমি হইলেও তাহাকে প্রীতি করে; আপনার জাতি অতি নিকৃষ্ট হইলেও লোকে তাহাকে আন্তরিক ভালবাসে।

স্বদেশানুরাগ না থাকিলে স্বদেশের হিত সাধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই স্বদেশানুরাগ যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদিগের দ্বারা স্বদেশের উপকার সাধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই স্বদেশানুরাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে যতই ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করা যাইবে ততই ভারতের উন্নতি সাধন হইবে। জাতীয় ঐক্য একটি জাতি-সাধারণ ভাষার প্রতি নির্ভর করে। এক প্রকার ভাব একটি জাতি সাধারণ ভাষা দ্বারা সেই জাতীয় সকল লোকের মনে প্রবিষ্ট না হইলে জাতীয় ঐক্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এ স্থলে প্রত্যেক ভাষা ব্যবহারকারী লোকের কর্তব্য যে প্রধানতঃ আপনার জাতির উন্নতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রধান করিয়া অন্য জাতির উন্নতির প্রতি সামান্যতঃ মনোযোগ প্রদান করেন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজ নিয়ম বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষস্থ সকল ব্যক্তির মধ্যেই ঐক্য হইতে পারে, কিন্তু সকল বিষয়ের উন্নতি সাধনে প্রগাঢ় ঐক্য সম্পাদন জন্য ধর্ম ও ভাষার সমতা নিতান্ত আবশ্যক।

এক্ষণকার লোকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর বিষয়েও এমত সকলভাব প্রাপ্ত হইয়া যায় যাহা অন্য কোন জাতির ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, এবং এমত সকল সুরীতি হিন্দুদিগের মনে স্বদেশানুরাগ ক্রমে বিলক্ষণরূপে সঞ্চারিত হইতেছে।

এক্ষণে বিদ্বান লোকদিগের মনে স্বদেশানুরাগের ক্রমশঃ উদ্দীপন দেখিয়া হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যে পর্যন্ত না আমাদিগের জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণরূপে জাতীয় আকার ধারণ করে সে পর্যন্ত আমাদের সুস্থির হইবার কোন কারণ নাই।

যে পর্যন্ত না আমাদিগের জাতীয় উন্নতি, আহার পরিচ্ছদ, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্ম বিষয়ে সুসংগত আকার ধারণ করে, সে পর্যন্ত আমাদিগের জাতীয়ভাব সুগঠন প্রাপ্ত হইয়াছে এমন কখন বলা যাইতে পারে না। তাহাকে এইরূপ সুগঠন প্রদান করা সকল প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিরই কর্তব্য।

['তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আশ্বিন ১৭৯৮ শক

একথা মনে করবার কোনো হেতু নেই যে সৃষ্টি উপান্তে পৌঁছেচে

# কমিউনিজম ও ভারত

সুভাষচন্দ্র বসু

ইউরোপে সকলের মুখে মুখে এক প্রশ্ন : ভারতে কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ কী? এ বিষয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা উদ্ধৃত করার মত। ১৯৩৩ সনের ১৮ই ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি, আজকের পৃথিবীর সামনে মূলত দুটি পথই খোলা আছে এক—

কোন না কোন আকারে কমিউনিজম, দ্বিতীয়—কোনো না কোন চেহারায় ফ্যাসিজম। আমি সর্বান্তকরণে প্রথমটি অর্থাৎ কমিউনিজম-এরই স্বপক্ষে। ফ্যাসিজমকে আমি তীব্রভাবে ঘৃণা করি। বস্তুত আমার কাছে তা যেন তেন প্রকারেণ নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করবার জন্যে আধুনিক ক্যাপিটালিজিম-এরই একটা নগ্ন বর্বর প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বেছে নিয়েছি কমিউনিস্ট আদর্শকে। অবশ্য এই মতাদর্শের জন্যে গোড়া কমিউনিস্টরা যে পন্থা গ্রহণ করেছে, তার সব কিছুর সঙ্গে, আমার মতের মিল নাও হতে পারে। আমার ধারণা, পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে এই সব পন্থারও পরিবর্তন ঘটবে। তা ছাড়া দেশে দেশেও তার রকমফের হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কমিউনিজম-এর মূল আদর্শ এবং তার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের ব্যাখ্যা দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

আমার মতে এখানে যে অভিমতটি প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। যদি আমরা বিবর্তনের শেষ ধাপে উপনীত না হয়ে থাকি, যদি আমরা বিবর্তনকে সম্পূর্ণ বাতিল করে না দিয়ে থাকি, তবে এমন মনে করার কোন যুক্তি নেই—আমাদের পছন্দ দুটি বিকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। হেগেল, মার্কস বা অন্য যে কোন দার্শনিক বিবর্তনতত্ত্বেই আমরা আস্থাবান হই না কেন, একথা মনে করার কোন হেতু নেই যে, সৃষ্টি উপান্তে এসে পৌঁছেচে। বরং সব দিক বিবেচনা করলে এমন ধারণাই জন্মাবে যে, বিশ্ব ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়টি ফ্যাসিজম এবং কমিউনিজম-এর সমন্বয় সাধন করবে। সে সমন্বয় যদি এই ভারতভূমিতেই সাধিত হয় তবে কি সেটা খুব বিস্ময়কর ঘটনা হবে?

কমিউনিজম এবং ফ্যাসিজম-এর বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু ঐক্য রয়েছে। কমিউনিজম এবং ফ্যাসিজম দুইই ব্যক্তি মানুষের উপর রাষ্ট্রের আধিপত্যে বিশ্বাসী। দুই-ই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে খারিজ করে দিয়েছে। দুই-ই দলীয় শাসনে আস্থাশীল। দুই-ই দলীয় একনায়কত্বে বিশ্বাস করে এবং যারা তা মানতে চায় না সেই সংখ্যালঘু দলকে নির্মমভাবে পীড়ন করে। দুই মতবাদই পরিকল্পিত উপায়ে দেশের শিল্প পুনর্গঠিত করার পক্ষে। উভয় মতবাদে এই ঐক্যচিহ্নগুলোই হবে ভবিষ্যতের নবসমন্বয়ের ভিত্তি। আমি সেই সমন্বয়ের নাম দিয়েছি 'সাম্যবাদ'। শব্দটি ভারতীয়। এর শব্দগত অর্থ 'সমন্বয় বা সাম্যের মতবাদ'। এই সমন্বয়কে কাজে পরিণত করাই হবে ভারতের দায়িত্ব।

ভারতে কমিউনিজম কেন গৃহীত হবে না তার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, কোন রকমের জাতীয়তাবাদের প্রতিই আজকের কমিউনিজম-এর কোন সহানুভূতি নেই। অথচ ভারতের আন্দোলন হচ্ছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ভারতের জনসাধারণের জাতীয় মুক্তিই তার লক্ষ্য। (গত চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর জাতীয়তাবাদ এবং কমিউনিজম বিষয়ে লেনিনের তত্ত্বটি বোধ হয় বাতিল হয়ে গেছে) দ্বিতীয়ত, রাশিয়া এখন আপন ঘর সামলাতেই ব্যস্ত এবং যদিও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এখনও কোনমতে ঠাঁট বজায় রেখেছে তবুও বিশ্বে বিপ্লব

ঘটাবার জন্যে খুঁচিয়ে বেড়াবার উৎসাহ তাদের এখন কম। রাশিয়া এবং অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সম্প্রতি যে সব চুক্তি হয়েছে এবং সেই সব চুক্তিতে যে সব লিখিত এবং অলিখিত শর্তাদি রয়েছে তা ছাড়া রাশিয়া লীগ অব নেশনস-এও আসন গ্রহণ করেছে। তদুপরি রাশিয়া আজ তার আভ্যন্তরীণ শিল্প পুনর্গঠনের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। দেশের পূর্ব সীমান্তে জাপানী উপদ্রব মোকাবিলা করার জন্যেও তাকে তৈরি হতে হচ্ছে। এ সব কারণে বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার জন্যে আজ সে উদগ্রীব। ভারতের মত দেশের ব্যাপারে সক্রিয় আগ্রহ দেখাবার আজ আর তার সময় নেই। তৃতীয়ত, কমিউনিজম-এর অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার অনেক আদর্শই ভারতীয় জনসাধারণের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে বটে, কিন্তু এমন অনেক আদর্শও আছে যার ফল অনিবার্যভাবেই বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। রুশ ইতিহাসে চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে নিবিড় যোগ থাকার ফলে রাশিয়ায় কমিউনিজমকে ধর্মবিরোধী নিরীশ্বরবাদী হিসেবে গড়ে উঠতে হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয়দের সুসংগঠিত কোন চার্চ নেই, এখানে ধর্মীয় সংস্থাসমূহের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন যোগ নেই। ফলে এখানে ধর্মের বিরুদ্ধে সেই মনোভাবও নেই। চতুর্থত, ইতিহাসের যে জড়বাদী ব্যাখ্যা কমিনিজম-এর তত্ত্বে কেন্দ্র বিন্দুস্বরূপ তাও ভারতে নির্বিচারে গৃহীত হবে বলে মনে হয় না। এমন কি যারা কমিউনিজম-এর অর্থনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারেন তাঁরাও তাতে রাজি হবেন না। পঞ্চমত যদিও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজম-এর কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে (যথা—রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে অর্থ পরিকল্পনা) তবুও অন্যান্য ক্ষেত্রে তা একান্তই দুর্বল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুদ্রা সমস্যার কথা বলা চলে। এ বিষয়ে কমিউনিজম নতুন কিছু দিতে পারেনি, সনাতন অর্থনীতিকেই অনুসরণ করছে মাত্র। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বের অর্থসমস্যা সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা হতে এখনও দেরি আছে।

সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে আজ এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, ভারত সোবিয়েত রাশিয়ার আর একটি সংস্করণ হচ্ছে না। তেমনি জোরের সঙ্গেই এ কথাও আজ বলা যায় যে, আধুনিক ইউরোপ আমেরিকার সমুদয় রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যাবে আগামী দিনের ভারতে।...

['দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' অষ্টাদশ অধ্যায় ১৯৩৪]

# সৈন্যবলে বলীয়ান

**সুবোধ ঘোষ**

খৈবার গিরিপথের মুখোমুখি হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে শিখ-শক্তির একটি দুর্গ। মহারাজা রণজিৎ সিং-এর সেনাপতি হরিসিং নালোয়া এই দুর্গ স্থাপন করেছিলেন। পঞ্চনদের সমতল অঞ্চলের প্রবেশপথের মুখে দাঁড়িয়ে আছে যে আটক নগর; সেই আটক নগরও অধিকার করে নিতে দেরি করেন নি মহারাজ রণজিৎ সিং। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তা ছাড়া এই আটক নামটির মধ্যেও একটি বিশেষ অর্থ নিহিত আছে যে, বহিঃশত্রুকে এখানেই প্রতিহত করে রাখতে হবে। আটক হলো সীমান্তরক্ষার প্রতিরোধ-নগর।

বুঝতে অসুবিধা নেই মহারাজা রণজিৎ সিং-এর সীমান্ত-নীতি ইতিহাসের শিক্ষাকেই অনুসরণ করে গঠিত হয়েছিল। রাজ্যের নিরাপত্তা ও সার্থক সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যবলে বলীয়ান হবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে; কিন্তু সেই সংগে বাস্তবতানিষ্ঠ সীমান্তনীতিও চাই। পররাজ্যের সীমান্তকে অরক্ষিত অথবা অ-সুরক্ষিত, কিংবা অসহায় অবস্থায় পেলে শত্রুর অভিযান আরম্ভেই অর্ধেকের বেশি সফলতা লাভ করে ফেলে। অপরদিকে, সীমান্তের প্রতিরোধ যদি সক্ষম, সুদৃঢ় এবং ভয়ংকর আঘাতপ্রবণ হয়, তবে বহিঃশত্রুর পরাজয় সেখানেই অর্ধেক সম্ভব হয়ে যায়।

সৈন্যবলে বলীয়ান হবার আসল উদ্দেশ্যও হলো সীমান্তের প্রতিরোধশক্তি প্রবল করে তোলা। দেশরক্ষার যুদ্ধকে দেশের ভিতরে টেনে আনতে, অথবা দেশের ভিতর প্রবেশ করতে দিতে কেউই চায় না। সীমান্তের সুযোগ্য সামরিক প্রতিরক্ষাই দেশরক্ষার প্রতিশ্রুতি।

ভারতের অতীতের ইতিহাসে এমন ভুলের ব্যাপার অনেকবার ঘটেছে; সীমান্তের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ঔদাসীন্যের ব্যাপার। অনাভাবে বলা যায়, বহিঃশত্রুর প্রবেশপথ সম্পর্কে বাস্তবতাসম্মত ধারণার অভাব। পৃথ্বীরাজও আলেকজান্ডারকে বাধা দেবার জন্য যে সীমারেখায় সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন, সেটা আত্মরক্ষার যুদ্ধের দিক দিয়েও সুবিধার হয়নি। বিশেষজ্ঞ সামরিকের অভিমত, ঝিলমের

পশ্চিম তীরের কোন প্রান্তভাগে ম্যাসিডনীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করবার জন্য সৈন্য সমাবেশ করা পুরুরাজের উচিত ছিল। তিনি ঝিলমের পূর্বতীরে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে ঝিলম নদ আলেকজান্ডারের পক্ষে যতটা বাধা হয়েছিল, পুরুরাজের পক্ষে ততটা সুবিধা হয়ে উঠতে পারেনি। ঝিলম নদকে প্রতিরোধের সহায় মনে করা পুরুরাজের পক্ষে মিথ্যা স্বপ্নবিলাস হয়ে উঠেছিল।

মারাঠা শক্তি এবং মহীশূর শক্তির সামরিক প্রতিরক্ষা নীতির ভুল সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকদের একটি অভিমত আছে। এই দুই শক্তি যথাকালে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, ভারতের সমুদ্রোপকূল অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে; এবং সমুদ্রোপকূলের এই অসহায়তাই বহিঃশত্রু ফিরিঙ্গীর ভারত অভিযান সহজ করে রেখেছে। মারাঠা শক্তি এবং মহীশূর শক্তি নৌবল উন্নত করতে সচেষ্ট হননি; এবং উপকূল সীমান্তে সামরিক প্রতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করেন নি।

চীনের ভারত আক্রমণের পরেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষণায় এমন একটি কথা বলেছেন, যার সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভুল হয়েছে। কিসের ভুল? "আমরা এতদিন ধরে একটা অবাস্তব ধারণার জগতে প্রসন্ন হয়ে বসেছিলাম; চীনা আক্রমণ সেই প্রসন্নতা রূঢ়ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে; আমরা এখন বাস্তবতার রূপ দেখতে পাচ্ছি।"

সহজ অর্থ করলে শুধু এইটুকু বুঝতে পারা যায় যে, এটা বিশ্বাসের সঙ্কট, ক্রাইসিস অব কনফিডেন্স। চীনা কখনও ভারত আক্রমণ করবে না, সম্ভব এই বিশ্বাস, কিংবা, কোন জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে কোন বিদেশের নিকট হতে সশস্ত্র আক্রমণের দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে না, হয়তো এই বিশ্বাস। দেখা গেল যে, এই বিশ্বাসের মাজিনো লাইন দেশের নিরাপত্তার পক্ষে একটি কঠিন বিদ্রূপে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং অনুমান করলে ভুল হবে কি, রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার জন্য মৈত্রীভাবিত পররাষ্ট্র-নীতির উপর বেশি নির্ভর করা, আর সামরিক প্রতিরক্ষা শক্তির সার্থকতাকে গৌণ ব্যাপার মনে করাই অবাস্তবতার সঙ্গে মিতালী করা হয়েছে?

ভারতবাসীর পক্ষে আজ খুবই উদ্বেগের বিষয়; এবং দুঃখের বিষয়ও এই যে, ভারতের নিকট প্রতিবেশী প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই ভারতের আক্রমণকারী চীনের সঙ্গে সখ্যতার সম্বন্ধ আরও অন্তরঙ্গ করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভারতের ভৌগলিক অবস্থানের দিকে তাকিয়ে বলতে পারা যায়, ভারত আজ প্রতিবেশীর বিরূপ মনোভাবের একটি অবিচ্ছিন্ন বূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই বাস্তবতার সত্যকে কি চোখ বুজে অস্বীকার করা যায়?

সৈন্যবলে বলীয়ান হওয়া এবং সীমান্তের সুরক্ষা প্রবল করে তোলাই আজ ভারতের ইতিহাসের দাবি। এক কথায় বলা যায়, সামরিক শক্তি হিসাবেই ভারতের নূতন আত্মপ্রতিষ্ঠা চাই। নিন্দুকে বলতে পারে, এটা মিলিটারিজম্। কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস বলবে, এটা ভারতের জাতীয় ঐক্যের নূতন সংগঠন। বর্তমান বিশ্বে ভারতের মত একটি বিরাট রাষ্ট্রের

পক্ষে সামরিক শক্তিতে অনুন্নত হয়ে থাকা একটি ভয়ানক আইসোলেশন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এবং ভারতীয় জেনারেলদেরও সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, সীমান্ত রক্ষায় ভারতীয় বাহিনীর অপ্রস্তুত অবস্থার জন্যই চীনা শত্রুর পক্ষে নেফাতে এবং লাদকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। চীনা সৈন্যকে একটা মহা-বিক্রমের বাহিনী বলে ধারণা করবার মত কোন প্রমাণই নেই; শুধু তারা সংখ্যায় বেশি। কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যেও এমন ভীরুতাসুখী অভাগার দল আছে, যারা চীনার সামরিক বিক্রমের যত মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে থাকে। নেফাতে এবং লাদকে চীনা সৈন্যের সাফল্য বস্তুত চতুরতার কীর্তি; সামরিক কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। মাও সে তুং-এর যুদ্ধনীতিই এই যে, বিপক্ষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করতে হবে। এবং যেখানে সাফল্য লাভ সুনিশ্চিত নয়; সেখানে কখনও এগিয়ে যেয়ে আক্রমণ চালনা করবে না।

তবু, কোন সন্দেহ নেই, চীনাদের এই চতুরতার সাফল্যই ভারতীয় জাতির আত্মসম্মানবোধ পীড়িত করেছে। এক্ষেত্রে আমাদের 'অপ্রস্তুত' অবস্থাটাও বিশুদ্ধ কৈফিয়ৎ হতে পারে না; ওটাও নিদারুণ এক ত্রুটি।

শুনেছি, দেশের সরকার এ বিষয়ে কর্তব্য সচেতন হয়েছেন; এবং সামরিক শক্তির নূতন সংগঠনের প্রয়াসও চলছে। বন্ধু বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করা এবং দেশের কারখানাতে অস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, এই দুই নীতিতে অস্ত্রশক্তির উন্নয়ন পরিচালিত করা হচ্ছে।

সৈন্যবলের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কেও সরকার সচেতন। কিন্তু স্মরণে রাখা প্রয়োজন, স্থায়ী বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাই বাস্তবোচিত প্রয়োজন। যথার্থ 'প্রস্তুতি' বলতে রেগুলারের সংখ্যা বৃদ্ধিই বোঝায়।

আরও একটা প্রশ্ন, উন্নত এবং বিপুল বিমানবল ছাড়া কি ভারতের সামরিক প্রতিরক্ষা শক্তির যথার্থ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে? বরং, এই সত্যই স্বীকার করতে হয় যে, বিমানবলের বিপুলতাই ভারতের দেশরক্ষার সামরিক দিক দিয়ে সব চেয়ে সার্থক প্রতিশ্রুতি। ভারতের শত্রুরা ভারতের বিমানবলের সামান্যতাকে একটা 'অপ্রস্তুত' অবস্থা বলে বুঝে নিতে দেরি করবে না। ভবিষ্যতের সম্ভাবিত সংঘর্ষে শত্রুরা এমন অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হবে না; চীন তার সাম্রাজ্যিক প্রসারের লিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য বিমানবল প্রয়োগ করবে না, এমন ধারণা পোষণ করার অর্থ চীনকে বিশ্বাস করা। ভারতের সামরিক প্রতিরক্ষার সংগঠনে এমন বিশ্বাসের প্রভাব থাকলে সেটা খুবই ক্ষতিকারক হবে।

[আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন এই ঐতিহাসিক গীর্জাটি

# ঐতিহাসিক ব্যাণ্ডেল চার্চ

**অমিয় চট্টোপাধ্যায়**

চারশো বছর আগে বাংলাদেশে পর্তুগীজরা যে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ ব্যাণ্ডেলের রোমান ক্যাথলিক গীর্জা আজও অপরিবর্তিত ভাবে বর্তমান। উনিশ শো তেষট্টিতে ব্যাণ্ডেল চার্চের তিনশো চৌষট্টি বছর পূর্ণ হল। বাংলাদেশে এটিই প্রাচীনতম রোমান ক্যাথলিক চার্চ।

ব্যাণ্ডেল শব্দটি পারসীক 'বন্দর' শব্দের নামান্তর। পর্তুগীজদের উচ্চারণের ত্রুটির ফলে হুগলী নদীর বন্দর হুগলী নদীর ব্যাণ্ডেল-এ পরিণত হল। হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল সেই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের স্বাক্ষর। পর্তুগীজদের এই উপনিবেশ গঠনের সূচনায় বহু রক্তক্ষয় হয়েছিল, যার কলঙ্কময় বিবরণ ইতিহাসের পাতায় আজও স্পষ্টাক্ষরে বর্তমান।

কলকাতা থেকে প্রায় ছাব্বিশ মাইল দূরে এই ঐতিহাসিক গীর্জাটির অবস্থান। ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে পনেরোশো সাইত্রিশ খৃষ্টাব্দে রাজা মামুদ শা'র আমন্ত্রণক্রমে তাঁরই সাহায্যের জন্যে স্যামপেও নামে এক পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি বাংলা দেশে আসেন। সংগে আনেন ন'টি নৌবহর। ইতিহাস থেকে জানা যায় পরাক্রমশালী শের শা'র আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই পর্তুগীজ সেনাপতি স্যামপেওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মামুদ শা। আমন্ত্রণে স্যামপেওর সাড়া এলো, তবে প্রয়োজনীয় সময়ের অনেক পরে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও স্যামপেও কিন্তু ছাড়লেন না। বললেন, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চাই। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি দাবী করলেন বাংলা দেশে একটি গর্তুগীজ মালিকানার কারখানা স্থাপনের অনুমতি। অগত্যা সে দাবী মেনে নিতে হ'ল মামুদ শা'কে। বহুস্থান পরিদর্শন করে পরিশেষে হুগলীকেই কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচন করলেন পর্তুগীজ নৌসেনাপতি স্যামপেও।

এর কিছুকাল পরে পর্তুগীজরা তাদের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা আরও জোরদার করার জন্যে একটি দুর্গ নির্মাণ করলে কারখানারই নিকইবর্তী গোলঘাট নামে একটি অঞ্চলে। বর্তমান জুবিলী

দ্বীপ এবং হুগলী জেলের মধ্যবর্তী এই স্থানটিতে সেই প্রাচীন দুর্গটির ঐতিহাসিক ধ্বংস-স্মৃতি এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

স্যামপেও বাংলা দেশে আসার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেল পর্তুগীজদের উপনিবেশ স্থাপনের কাজে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সিস্কো রেমেডিয়স নামে এক পর্তুগীজ নাবিক তৎকালীন মোগল অধিপতি আকবরের বড় প্রিয় হয়ে উঠলেন। পনেরোশো আশি খৃষ্টাব্দে তিনি মোগলরাজের অনুগ্রহ লাভ করে অনুমতি আদায় করে নিলেন বাংলা দেশে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের এবং গীর্জা নির্মাণেরও। রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় মঠ নির্মাণের প্রথম সূচনা হল পনেরোশো নিরানব্বই খৃষ্টাব্দে। ব্যাণ্ডেলেই তিনি নির্মাণ করলেন প্রথম রোমান ক্যাথলিক গীর্জা। ব্যাণ্ডেল তখন স্যামপেও কর্তৃক স্থাপিত সেই কারখানার এক মাইলের মধ্যে একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র। ব্যাণ্ডেলে প্রথম চার্চ নির্মাণের সামান্য কিছুকাল পরে আরও দুটি ছোট গীর্জা নির্মিত হল পর্তুগীজদের উদ্যোগে কারখানার নিকটবর্তী অঞ্চলে।

স্বভাবতই চল্লিশ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে পর্তুগীজদের উপনিবেশ অত্যন্ত জোরদার হল। একাধিক দুর্গ নির্মাণের কাজ সুরু হয়ে গেল হুগলীর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে। ঠিক এই সময়টিতে আনুমানিক ষোলশো বাইশ খৃষ্টাব্দে শা'জাহান তাঁর পিতা জাহাংগীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। পিতাকে পরাস্ত করার জন্যে সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করলেন তিনি তৎকালীন পর্তুগীজ গভর্নরের কাছে। অসীম দৌলতের মোহ ত্যাগ করে নামঞ্জুর করলেন তিনি সৈন্য সাহায্যের প্রার্থনা। পিতা-পুত্রের সংঘর্ষে মাথা গলাতে চাইলেন না তিনি। শা'-জাহান কিন্তু ভুলে গেলেন না পর্তুগীজ গভর্নরের দুর্ব্যবহারের কথা, সৈন্য সাহায্য না করার ঘটনা। ছ'বছর পরে যখন মসনদে বসলেন তিনি, তখন প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। শা' জাহানের অধীনস্থ বাংলার সুবাদারের ঘোর শত্রু ছিল পর্তুগীজরা। তিনি আগ্রাতে সংবাদ পাঠালেন শত্রু সুলভ অভিসন্ধি ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে। সৈন্য সংরক্ষণ, দুর্গ নির্মাণ, কামান স্থাপন—এ সব তাদের শত্রুতারই সূচনা। সংবাদ পেয়েই শা'-জাহান নির্দেশ দিলেন বাংলার সুবাদারকে সমূলে উচ্ছেদ কর পর্তুগীজদের অসৎ অভিপ্রায়কে। সুবাদার যেন রাজ নির্দেশেরই অপেক্ষা করছিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু দুর্গের মুখে। পর্তুগীজরা দুর্গের ফটক বন্ধ করে একমাস ঠেকিয়ে রাখল সুবাদার-সৈন্যবাহিনীকে। শেষকালে বিশ্বাসঘাতকতা করলে পর্তুগীজ দলেরই একজন উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষ। সুবাদারের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে দুর্গে প্রবেশের গুপ্ত পথের নিশানা জানিয়ে দিলে সুবাদারকে। সেদিন ছিল সেণ্ট জনস্ ব্যাপ্টিস্ট-এর উৎসবের দিন। এই শুভ আরাধনার দিনে যখন পর্তুগীজরা উৎসবের আনন্দে আত্মহারা, তখন সুবাদার তাঁর সৈন্যদল নিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে পর্তুগীজদের দুর্গ, মঠ আর কারখানা। জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করলে পর্তুগীজ গভর্নরকে। রক্তক্ষয় হল অনেক। প্রায়

এক হাজার নর-নারী-শিশু বন্দী হয়ে প্রেরিত হ'ল আগ্রায়। পর্তুগীজদের গড়া গীর্জা-বাসস্থান ধূলিসাৎ হল এই সংঘর্ষের পরিণতিতে। সামান্য ক্ষতি স্বীকার করে শুধুমাত্র বেঁচে গেল ব্যাণ্ডেল গীর্জা। সেই ঐতিহাসিক ধ্বংস থেকে রেহাই পেয়ে চার্চ-ইতিহাসের প্রাচীনতম স্বাক্ষর হয়ে ব্যাণ্ডেল চার্চ আজও বেঁচে আছে।

প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন এই ঐতিহাসিক গীর্জাটি দেখার জন্যে বহু দর্শনার্থী ব্যাণ্ডেলে আসেন খৃষ্টমাস অথবা ছুটির মরশুমে। গীর্জার মধ্যে যে দেবী মূর্তিটি (লেডী অফ হ্যাপি ভয়েজ) অধিষ্ঠিত আছে, তার সম্পর্কে বহু প্রাচীনকাল থেকে একটি বিস্ময়কর কাহিনীর প্রচলন আছে। কাহিনীর সূত্র থেকে জানা যায় ষোলশো বত্রিশের সুবেদার এবং পর্তুগীজদের ঐতিহাসিক সংঘর্ষের পূর্বে মূর্তিটি পর্তুগীজ নির্মিত কারখানার সংলগ্ন একটি গীর্জাতেই অধিষ্ঠিত ছিল। সংঘর্ষের সময় দেবী মূর্তি শত্রুদের হাতের স্পর্শে কলঙ্কিত হওয়ার আশংকায় এক পর্তুগীজ ব্যবসায়ী গীর্জা থেকে মূর্তিটি সরিয়ে নিয়ে এসে মূর্তিসহ হুগলী নদীতে আত্মবলি দেয়। তার একবছর পরে যখন স্থিতাবস্থা ফিরে এলো, তখন এক মহা দুর্যোগের রাত্রে পর্তুগীজদের নৌবহর আবার হুগলীর বন্দরে এসে ভিড়ল। কিম্বদন্তী আছে সেই দুর্যোগের মধ্যে এক পর্তুগীজ পাদ্রী 'লেডী অফ হ্যাপি ভয়েজ'-এর রক্ষক সেই মৃত ব্যবসায়ীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। ব্যবসায়ীর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যাওয়ার সংগে সংগে সেই পাদ্রী দুর্যোগের অন্ধকার রাত্রেও নদীর ওপর এক আশ্চর্য আলোর জ্যোতি দেখেছিলেন। সে আলো সামান্য সময়ের জন্যে স্থায়ী হয়ে আবার মিলিয়ে গিয়েছিল। আলোর অন্তর্ধানের কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই দুর্যোগের ঘটা একেবারে শান্ত হয়ে যায়। পরের দিন সকাল বেলা সবাই দেখল, লেডী অফ হ্যাপি ভয়েজ-এর দেবী মূর্তি চার্চের ঘাটে এসে লেগে আছে। সেদিনই পর্তুগীজরা বেদীমূর্তিকে চার্চের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত করলে। এই বিশেষ দিনটি ব্যাণ্ডেল চার্চে আজও উৎসবের দিন।

যে ঘাটে দেবীমূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল, সে ঘাট এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যাণ্ডেল চার্চের ভেতরে যে কাঠের মাস্তুলটি রয়েছে, তার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে কিম্বদন্তী শোনা যায় তাও বিস্ময়কর। দেবী মূর্তির চার্চের ঘাটে আবির্ভাবের পর যখন পর্তুগীজদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ঠিক সেই সময়টিতে একটি পর্তুগীজ নৌবহর একই ঘাটে এসে ভিড়ল। অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবার পর সেই নৌবহরের নায়ক গীর্জার প্রধান পাদ্রীকে জানালেন, সমুদ্রের ভীষণ তুফান আর বিপর্যয়ের মুখ থেকে তিনি নৌবহরকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। সমুদ্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সেই নাবিক মাতা মেরীর কাছে একটি অংগীকার করেছিলেন। সমুদ্র শান্ত হলে জাহাজের একটি মাস্তুল দেবীর নামে ঘাটে পুঁতে দেওয়ার অংগীকার।

ব্যাণ্ডেল চার্চের কাঠের মাস্তুলটি তিনশো তিরিশ বছর পূর্বেকার সেই অংগীকারের স্বীকৃতি।

# স্বপ্ন

বিমল কর

প্রায়ই স্বপ্ন দেখি
কাল রাত্রে এক
আশ্চর্য স্বপ্ন। অবশ্য
ঘুম ভেঙে গেল
লাগল না।

ইচ্ছে কর-
স্বপ্ন

খবরটা রোজ
দেখলাম, সত্য-
হাতে বাজারে যাচ্ছেন

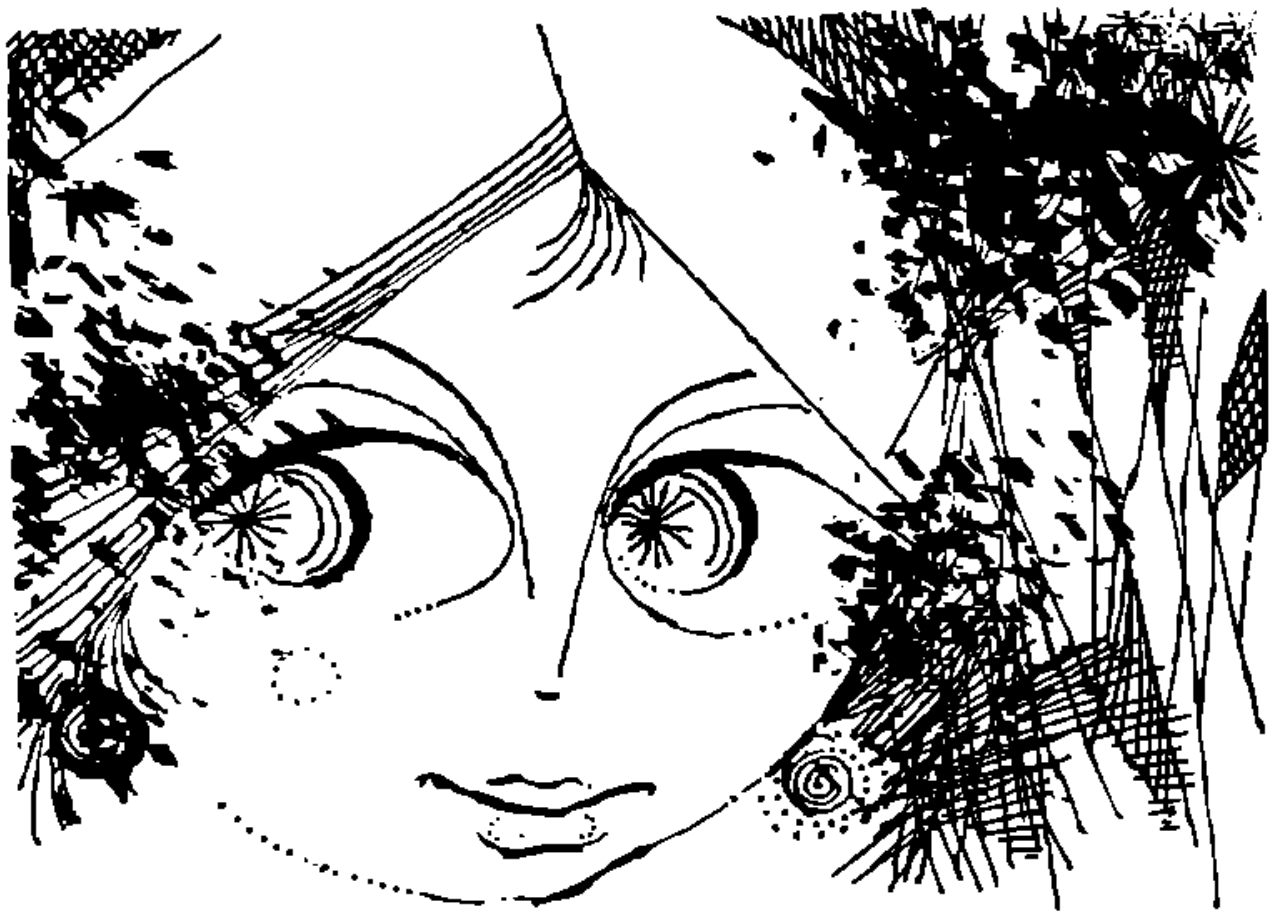

অমন
মনে করতে
দিয়ে মানুষ
নেয়, এই ঘটঘটে সকাল
তেমনি করে অমার
দাগগুলো মন থেকে শুষে
ছিল। মিনতি বলল,
যাও, পথে

স্বপ্নটা তুমেই যাচ্ছিল।
মরে যাচ্ছিল এক রকম আমি বাঁচাবার
যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম। সারা সকাল
আমায় মরণ-বাঁচনের ড়তে হল

পড়তে

সামারি দিয়ে দিও, সাহেব ফাইল নিয়ে টুরে যাবে।

স্বপ্নটা দুপুরে হারিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় পথের একটা দোকানে চা খেতে গিয়ে হঠাৎ পুরো স্বপ্নটাই আমার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে যাবার পর আমি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চায়ের দোকানের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওই দেওয়ালে একটুকরো রঙ করা টিন আঁটা ছিল; হলুদ রঙের টিন, তার গায়ে গাঢ় লাল হরফে খাবারের নাম লেখা ছিল।

কাল রাত্রে দেখা স্বপ্নটার কথা আমার মনে পড়ল।

স্বপ্ন শুরু হয়েছিল রেলগাড়ির কামরায়। কোথায় যেন যাব বলে বেরিয়ে ট্রেনে উঠেছি। গাড়ি চলছিল। এক ভদ্রলোক ও-পাশের বেঞ্চে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়েছিলেন। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, পাশ ফিরে থাকায় আমি ওঁর মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম। জনৈকা মহিলা ওঁর পাশে কোল পেতে বসে। মহিলার মুখ দেখা যাচ্ছিল। বয়স্কা। বসে বসে তিনি ঢুলছিলেন। সময়টা রাত। বাইরে অন্ধকার।

কামরায় তেমন আলো নেই।

আমার পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ মহিলা ও-পাশ থেকে উঠে এ-পাশে এসে বসলেন। এ-পাশের বাতি জ্বলছিল না। অন্ধকার। আমি সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসলাম। অন্ধকারে উনি যেন বিরক্তির শব্দ করলেন।

সহসা আমার দু পাশে রেল ইয়ার্ডের বাতিগুলো মুখ বাড়িয়ে দিল। জানলা দিয়ে দেখলাম, একটা মাঝারি স্টেশন। প্লাটফর্ম প্রায় ফাঁকা। নাম দেখার আগেই স্টেশন ছাড়িয়ে গাড়ি চলে গেল, বাতিগুলো থেমে থাকল, আমরা অন্ধকারে এগিয়ে গেলাম।

মহিলা ডাকলেন।

আমি চমকে উঠেছিলাম। কেমন করে যেন মলিন আলোর ঈষৎ রেখা তাঁর মুখে পড়েছে। আগে ওঁকে বেশ বয়স্কা রমণী মনে হয়েছিল, এখন মনে হল, অতটা নয়। মুখের গড়ন ভরন্ত।

—এটা কোন স্টেশন পেরোলো? উনি জিজ্ঞেস করলেন।

—দেখতে পাই নি।

—এবার কোন স্টেশন আসবে?

কোন স্টেশন আসবে আমি জানতাম না, তবু ভাববার চেষ্টা করলাম।

—আপনি কোথায় যাবেন? মহিলা শুধোলেন।

'আমি কোথায় যাব' এই প্রশ্নে আমি সচকিত হলাম। কোথায় যাচ্ছি ভাবতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমি অন্ধকারে পড়ে আছি; কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে আমার বিন্দু-মাত্র ধারণা নেই।

তবে এ-গাড়িতে কেন? কখন এলাম, কেন এলাম? আমার কিছু মনে পড়ল না। পকেট হাতড়ে টিকিটটা খুঁজতে যাব— মহিলা অ্যালার্ম-চেন ধরে টেনে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে ভয় সঞ্চারিত হল, বিদ্যুতের মতন।

'কি করছেন, কি করছেন আপনি'— এই কথা দুটো বলবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি কিছু বলতে

পারলাম না, এবং ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসতে লাগল।

ঘুমন্ত ভদ্রলোক জেগে উঠলেন। মহিলা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বলছিলেন। হয়ত চোর ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। ততক্ষণে গাড়ি থেমে এসেছিল, আর আমি কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে দরজা খুলে অন্ধকারে ঝাঁপ দিলাম।

তারপর সকাল।

সকালে আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত। পাহাড়তলির জমি দিয়ে হাঁটছি। অথচ এটা ঠিক পাহাড়তলি নয়। বড় বড় মাঠ, ঢালু প্রান্তর এবং বিক্ষিপ্ত গাছ ও ঝোপ দেখতে পাচ্ছিলাম। ক্বচিৎ পাখি ডাকছিল।

আমার ক্লান্তি লাগছিল।

হাঁটতে হাঁটতে ঢালু দিয়ে অনেকটা নেমে এসেছি। সামনে ছোট সাঁকো, শুকনো বালির একফালি রাস্তা চকচক করছিল।

সাঁকো পেরিয়ে, বালির রাস্তা ধরে অল্প একটু এগিয়ে আসতেই সেই বাড়িটা আমার চোখে পড়ল। বাড়িটা যেন কোথায় দেখেছি, অবিকল একই ছাঁদ। টালির চাল, পোড়ামাটির মতন রঙ। বাড়ির গায়ে এক টুকরো বাগান; কাঁটালতার বেড়া। কাঠের ফটক। লম্বা বারান্দা আমার দিকে মুখ করে যেন চেয়ে আছে। অনেক সময়, আমি দেখেছি, কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে আমার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বাড়িটার দরজা জানলা দেওয়াল সব যেন ঠিক ওই রকম করে তাকায়।

এরপর, কী আশ্চর্য, আমি দেখলাম, সেই সুন্দর ছবির মতন বাড়িটার ফটক খুলে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। বারান্দায় চৌকো টেবিল পাতা। চেয়ার সাজানো। হাত কয়েক তফাতে আরও একটা টেবিল, ওই রকম চৌকো, পাশে পাশে চেয়ার। কাঠের জাফরি দিয়ে ছায়া এবং আলোর ফিতে এসে ও-দিকটা কেমন নিবিড় করে রেখেছে।

তৃষ্ণা অনুভব করছিলাম, এবং ক্ষুধাও।

বাড়িটার পরিচ্ছন্নতা, শান্তি অথবা নির্জনতা অনুভব করার পর এখানে দু দণ্ড বসবার বাসনা আমায় কাতর করল।

আমি বসলাম। বসার পর চোখে পড়ল কাঠের জাফরির একপাশে একটি ময়ূর। ঘুমিয়ে রয়েছে।

অল্পক্ষণ আমি নীরবে নিশ্চিন্তে বসে থাকলাম। প্রচুর ক্লান্তির পর এই বিশ্রাম আমার ভাল লাগছিল। এত শান্ত আবহাওয়ায় ঘুম আসে। ঈষৎ আচ্ছন্নতা চোখের পাতা ভারী করে তুলছিল।

হঠাৎ ও-পাশের কোনো কোণের ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। তার হাতে শ্লেট। মনে হল, মেয়েটি যেন ঘরে বসে পড়ছিল, আচমকা উঠে এসেছে।

আমায় দেখতে পেয়েছিল। ভ্রূক্ষেপ করল না। ময়ূরের পাশে গিয়ে বসল। তার গায়ে ঘন রঙের ফ্রক; মাথার চুল টান করে বাঁধা, কাঁধ পর্যন্ত চুল। ময়ূরটাকে সে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল, ময়ূর জাগল না।

মেয়েটি চঞ্চল। ময়ূর জাগছে না দেখে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

ওর মুখটি আমি দেখলাম। পান-পাতার মতন গড়ন। চোখ দুটিতে প্রতিমার সৌন্দর্য। চিবুক সুডৌল। ছোট ছোট দাঁত মুক্তোর দানার মতন দেখাচ্ছিল।

—তোমার নাম কি? আমি তার সঙ্গে আলাপ করবার মতন করে বললাম।

ও আমায় বড় বড় চোখ করে দু পলক দেখল। যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, আমি তার নাম জানি না।

—কি নাম? ও বলল।—আমার দুটো তিনটে নাম আছে।

—নাকি, দু তিনটে!...একটাই বল, ডাক নামটা।

—পরী।

—বা, চমৎকার নাম। খুব সুন্দর।

—তোমার নাম কি? পরী টেবিলের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল।

—আমার নামটা তোমার মতন ভাল না। মস্ত বড়, বিশ্রী নাম...

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে।

পরী যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দূরবর্তী সেই স্থান অনুমান করার চেষ্টা করল।

—আমায় একটু জল খাওয়াবে?

পরী সঙ্গে সঙ্গে একপাশে মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ করল। তার পরই চঞ্চল পায়ে চলে গেল জল আনতে। হাতের স্লেটটা তার হাতেই।

এখানকার সব কিছুই অদ্ভুত লাগছিল। এতক্ষণ বসে আছি কোন বয়স্ক লোকের সাড়া পেলাম না। আমি যে অনধিকার প্রবেশ করেছি কেউ দেখতে এল না।

আরও অবাক লাগছিল, অনধিকার প্রবেশ করেও আমার খুব একটা অস্বস্তি অথবা সঙ্কোচ হচ্ছে না।

পরী জল নিয়ে এল। তার বাঁ হাতে স্লেটটা আগের মত ঝুলছে। গ্লাসের সবটুকু জল খেয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম। পরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার জল খাওয়া দেখল।

—তুমি বুঝি পড়ছিলে? পরীকে শুধোলাম।

—না। পরী অবাক।

—তবে হাতে স্লেট যে...!

পরী তার টানা টানা টলটলে চোখে আমার দিকে এমন করে তাকাল যে মনে হল, আমার কথা শুনে সে আকাশ থেকে পড়েছে। চোখের ফুরফুরে পাতা ফেলল পরী, ঠোঁট ছড়িয়ে এমন করে মুখটা হাঁ করল, যেন বলতে গেল এ মা, তুমি কিচ্ছু জানো না!

আমি জানতাম না। পরীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পরী হাতের স্লেটটা আমার টেবিলে রেখে দিল।

—তুমি কিচ্ছু খাবে না? পরী জিজ্ঞেস করল।

—খাব না আবার। খুব খিদে পেয়েছে। এখানে দোকান কই?

—আমাদের বাড়িতে খাবার আছে। পরী তার স্লেট উলটে আমায় আঙুল দিয়ে দেখাল।—এই দেখ না, কত খাবার। বলতে বলতে পরী দেখল ঘুমন্ত ময়ূরটা জেগে উঠে জাফরির পাশ দিয়ে ওদিকের বারান্দা হয়ে মাঠে নেমে গেল। পরী চঞ্চল হয়ে উঠল, খুব ব্যস্ত: যেন তার আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই। বলল,—তুমি কি খাবে ঠিক করো, আমি আসছি।

কথাটা কোনো রকমে বলেই পরী তার ময়ূরের পিছু পিছু ছুটে চলে গেল।

পরীকে আর দেখা গেল না। আমার মজা লাগছিল, হাসি পাচ্ছিল। তার ছেলেমানুষি সারল্য এবং চঞ্চলতা যেন

স্নিগ্ধ গন্ধের মতন আমার স্নায়ু পরিতৃপ্ত করছিল।

স্লেটটা দেখলাম। আঁকাবাঁকা অক্ষর, সাদা দাগ কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট। যেন হাতে হাতে মুছে গেছে।

খাদ্যবস্তুর নাম দেখতে গিয়ে প্রথমটায় বুঝি একটি দুটি নামে তেমন মনোযোগ দিই নি, অন্যমনস্ক থাকার দরুণ বোধ হয়, তারপর আচমকা মনোযোগ পড়ল, আমি সকৌতুক কৌতূহলে খাদ্য তালিকা দেখতে লাগলাম, প্রথম থেকেই!

প্রথমটা 'সুখ'। একটু অস্পষ্ট হয়ে আসা সত্ত্বেও স্লেট পেন্সিলের লেখাটা পড়া গেল। 'সুখ' নামক খাদ্যবস্তুটির দাম মাত্র ছ পয়সা।

পরীকে আমি প্রশংসা করলাম। এ-রকম নাম আমি দেখি নি। কল্পনা করাও অসম্ভব, একটি খাবারের নাম 'সুখ' হতে পারে। আমার হাসি পাচ্ছিল, অশেষ কৌতুক অনুভব করছিলাম।

স্লেটের মসৃণ কালো গায় সাদাটে অক্ষরে একের তলায় অন্য খাবারের নামটিও লেখা। 'সুখ'-এর পর 'তৃপ্তি': দাম একটু বেশি, সুখের তুলনায়। তবু মাত্র দু আনা। দু আনার 'তৃপ্তি' পছন্দ না হলে আরও দামী খাবার রয়েছে, 'আনন্দ'; চার আনা। আনন্দের পর আরও চার পাঁচটা খাবার। পরীর জামায় লেগে সেই মূল্যবান খাদ্যবস্তুগুলো কেমন মুছে এসেছে, অনেকটা অস্পষ্ট। তবু নজর করে দেখে আমার মনে হল, ওই শেষের দামী খাবারগুলোর একটার নাম 'ভালবাসা', অন্যটা বুঝি 'শান্তি'; এবং শেষেরটা 'ভগবান'।

অনেকক্ষণ এই খাদ্যবস্তুগুলোর নাম দেখলাম। সমস্তটাই ছেলেমানুষি। তবু ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল, কারণ আমি এমন আশ্চর্য দোকানে আর কখনও যাই নি, খাবারের এমন অদ্ভুত নাম আর দেখি নি।

পরী আসছে না। বসে থেকে থেকে আমি উঠলাম; বারান্দা ধরে নীচে মাঠে নেমে গেলাম।

সামনেটা একেবারে ধু ধু। তৃণাচ্ছাদিত ঢালু মাঠ। সমস্ত মাঠ উচ্ছ্বল ও অফুরন্ত রোদে ডুবে আছে। মাঠের শেষসীমা মেঘের রেখার মতন। তারপর নদী।

পরী ওই মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছিল। তার আনন্দ কোথায়, কি বস্তু নিয়ে সে খেলছিল আমি এত দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। পরীকে দেখবার জন্যে, তাকে ডাকতে আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

শুকনো শক্ত মাটির এক ধরনের গন্ধ ও স্পর্শ আছে, রোদে ঘাস এবং অন্যান্য তৃণ তপ্ত হয়ে এলে তারও এক রকম ঘ্রাণ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। হয়ত আমি এই সব প্রাকৃতিক স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব করে খুশী হচ্ছিলাম। হালকা লাগছিল। 'পরী'কে ডাকতে গিয়ে দেখলাম আমার স্বর বাতাসে চতুর্দিকে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। পরীর কানে পৌঁছচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত পরীর কাছে পৌঁছতে পারলাম।

পরীর হাতে স্কিপিং রোপ। সে দড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুটছিল।

--পরী।

—উঁ। পরী হাঁফাতে হাঁফাতে সামনে

এসে দাঁড়াল। রোদে ছুটে ছুটে তার মুখ ঘামে ভিজে গেছে। নাকের ডগা ফোলা।

—আমায় বসিয়ে রেখে তুমি পালিয়ে এলে যে!

—বা রে, আমি কি তোমার কাছে বসে থাকব! পরী ফ্রকের হাতায় মুখ মুছল।

—তোমার স্লেট...

—তুমি খাও নি?

—না। কে খাবার এনে দেবে!

পরী যেন আমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝল না। সেই ভাবে তাকিয়ে থাকল। তারপর তার চোখে কেমন করুণা ফুটল। যেন বলল, তুমি কি বোকা, তুমি ভীষণ বোকা।

স্কিপিং রোপটা মাঠে ফেলে দিয়ে পরী বলল,—চল তোমার খাবার দিয়ে আসি।

পরীর সঙ্গে আমি হেঁটে চললাম।

—তুমি খাবার চাইলে ও দিয়ে যেত। পরী বলল।

—কে?

—দিদি।

—তোমার দিদিকে কই দেখতে পেলাম না ত।

—পাও নি!...তবে হয়ত কিছু করছে টরছে।

—তোমাদের বাড়িটা খুব সুন্দর। আমি বললাম।—এত সুন্দর বাড়ি আমি দেখি নি।

—এর চেয়েও সুন্দর বাড়ি আছে। পরী বলল।

—কোথায়?

পরী আকাশের দিকে হাত তুলে দেখাল। দেখিয়ে হাঁটতে লাগল।

আমি আকাশটা দেখলাম। রোদের আভায় ফিকে নীল আকাশ গভীর ও অনন্ত দেখাচ্ছিল।

—ওখানে আরও সুন্দর বাড়ি আছে? আমি হাসির গলায় বলবার চেষ্টা করলাম।

—হ্যাঁ।

—কে বলল?

আমি নীরব। মনে হল, কথাটা পরী বিশ্বাস করে। মনে হল, আমিও বিশ্বাস করি।

বাড়িতে পা দিয়ে দেখলাম, বারান্দা তেমনি নির্জন; টেবিল চেয়ার অবিকল সেই ভাবে পাতা।

স্লেটটা পড়ে আছে। আমি বসলাম। লেখাগুলো দেখছিলাম। এখন আর হাসি পাচ্ছিল না, কৌতুক অনুভব করছিলাম না। আশ্চর্য, আমি নিতান্ত বালকের মতন বিশ্বাস করছিলাম, এই সব খাদ্য এই বাড়ির অন্দরমহলে কোথাও রাখা রয়েছে। আমার লোভ হচ্ছিল, এবং ক্ষুধার বাসনা তীব্র হয়ে উঠছিল।

পরী বলল,—কই বলো, কি খাবে?

স্লেটের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দাগগুলো আমি কেমন অন্যমনস্ক ভাবে দেখছিলাম। কে জানে, আমি আমার প্রয়োজন ও স্বাদ অনুযায়ী খাদ্যগুলি পছন্দ করছিলাম কি না! বস্তুত আমার পছন্দ করার কিছু ছিল না। এই খাদ্যের কোনোটিই আমার আস্বাদিত নয়। আমি শুনেছি, লোকমুখে বারংবার শুনেছি। আমার লোভ হয়েছে; কাঙালের মতন লোভ করেছি।

—তাড়াতাড়ি বলো। পরী বলল।

কী আশ্চর্য, পরীর কথা কানে গেল না, আমার মনে হল আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার সেই তীব্রতায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ফাঁকা মনে হল, যেন ঝিম-ঝিম করছে, হা হা করছে।

সমস্ত, যা আছে সমস্ত আমি আনতে বললাম। ওই স্লেটে লেখা প্রতিটি খাদাই এখন আমার পক্ষে প্রয়োজন। আমি অতীব ক্ষুধার্ত।

পরী চলে গেল। তার স্লেট উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি বসে থাকলাম। জাফরির ছায়াগুলো দেওয়ালে নক্সা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বসে থাকলাম, বসে থাকলাম... বসে বসে ক্লান্ত হলাম। পরী এল না।

কখন বুঝি এ-বাড়ির বারান্দা মেঘলার মতন অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ এল না। কোনো সাড়া নেই। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এলে মনে হল বাইরে মাঠ বয়ে হু হু করে বাতাস আসছে।

অনুমান করলাম, বেলা মরে গেছে, বিকেল ফুরিয়েছে, সন্ধ্যা সমাগত। অপেক্ষা করার আর উপায় ছিল না। বিমর্ষ ব্যথিত চিত্তে আমি উঠে আসার কথা ভাবছিলাম। সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলে আমি এই অপরিচিত জায়গায় কোথায় যাব এই ভয় এবং উদ্বেগ আমায় বিচলিত করছিল।

আচমকা মনে হল কে যেন আসছে, বারান্দার অন্ধকার দিয়ে এগিয়ে আসছে। সেই ঘনছায়া জড়ানো, ভীষণ মেঘলার মতন অন্ধকারে আমি তাকিয়ে থাকতাম। আঁধারের প্রতিটি যবনিকা তার আগমনে কাঁপছিল যেন, মনে হচ্ছিল ভীরু মৃগের মতন তার পায়ে শব্দ হচ্ছে। আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

আমি তাকে শেষ অন্ধকারে দেখেছি কি দেখলাম না, দিনের আলো এসে আমার স্বপ্ন ভেঙে দিল। নিষ্ঠুরের মতন।

তবু, স্বপ্ন ভেঙে যাবার পরও অপেক্ষা করলাম। অনেকক্ষণ। কেউ এল না।

রেস্টুরেন্টে চা খেতে খেতে কালকের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। লক্ষ করলাম, এখানে যারা এসেছে সকলেই আমার মতন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।

[ চতুরঙ্গ

# ব্যথা রহস্য

রজত সেন

জন্ম থেকেই আপনার যদি যন্ত্রণাবোধ না থাকত, সেটা যে একটা ভীষণ মজার ব্যাপার হত তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ভাববেন না এমন লোক নেই। বাইশ বছর বয়স এমন একটি লোককে নিয়ে নিউ ইয়র্কের হাসপাতালগুলিতে রীতিমত হৈ চৈ বেঁধে গিয়েছিল। একদিন জানা গেল এই যুবকটি কোনো দিন যন্ত্রণা অনুভব করেনি, এবং যন্ত্রনাটা যে কি জিনিষ সেটা জানবার এর গভীর আগ্রহ।

একদিন সিগারেট ধরাতে গিয়ে এর হাতের মধ্যে দেশলাই-এর বাক্সটা জ্বলে যায়। সামলে নিয়েছিল, তাই গুরুতর কিছু ঘটেনি; হাতে বড় বড় ফোস্কা পড়েছিল, কিন্তু তা নিয়ে একবারও মাথা ঘামাতে হয়নি তাকে, বলল, 'আঙুলে মাছি ঘোরাফেরা করলে যেটুকু সুড়সুড়ি লাগে, তার বেশি কিছু নয়।' যতদূর তার মনে পড়ে, এর চাইতে বিশেষ কিছুই ঘটেনি তার জীবনে। আমরা যাকে বলি মাথা ধরা বা গায়ে ব্যথা—এসব ব্যাপার কোনো অভিজ্ঞতাই তার নেই। বোলতায় কামড়েছে, ছুরিতে কেটে গেছে ছরে গেছে সেই একই ব্যাপার, তার কোনো ব্যথা লাগেনা, কোনো যন্ত্রণা হয়না।

আরও মজার ব্যাপার আছে। কোনো দিন দাঁতে ব্যথা হয়নি। এর তিনটি দাঁত তোলা হয়েছে। দাঁতে গোলমাল দেখা দিয়েছিল অনেক দিন; আয়নায় দাঁতের অবস্থা দেখে সে দাঁতের ডাক্তারের কাছে হাজির হয়। দেখেশুনে ডাক্তার রায় দিল, তোমার দাঁত কটা তুলে ফেলতে হবে। দাঁত তোলা হল, কিন্তু কোনোই যন্ত্রণা পেলনা সে। বিশেষজ্ঞরা এ-নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, কিন্তু এখনও কোনো হদিস খুঁজে পাননি।

কিন্তু এই যন্ত্রণা-বোধহীন জীবন নিতান্তই বিপজ্জনক। হয়ত কিছুই ঘটছে না, কিন্তু হঠাৎ যদি কোনো মুহূর্তে চরম বিপদ দেখা দেয়, সেদিন আর কোনো উপায় না-ও থাকতে পারে। ব্যথাটা হচ্ছে বিপদের প্রাকৃতিক সংকেত, এই সংকেতের সাহায্যে বিপদ এড়ানো যায়, বিপদের সংগে লড়াই করবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যথা বা যন্ত্রণা একটা বিশেষ অনুভূতি, যেমন দেখা বা শোনা। আমাদের চামড়ায় হাজার হাজার ব্যথার জায়গা

রয়েছে জড়ানো, জট-পাকানো আর বীক্ষণ উপশিরার ছড়াছড়ি। পায়ের আংগুলে ঘাঁদ ঘষা লাগে, বিদ্যুতের মত ব্যথার বার্তা ছড়িয়ে পড়বে পায়ের শিরা দিয়ে মেরুদণ্ডে। এই শিরা-বাহিনী হচ্ছে ব্যথা পাঠাবার তার। মগজে খবর পৌঁছাবার আগেই মেরুদণ্ডের মাধ্যমে আমরা ব্যথা অনুভব করতে থাকি। মেরুদণ্ড পর্যন্তই যদি ব্যথার সমাপ্তি ঘটত, তাহলে জানা যেতনা শরীরের ঠিক কোন্ জায়গায় ব্যথাটা লাগছে। এই যে এ্যাস্পিরিন, মরফিয়া বা বেদনা-নাশক নানা রকমের ওষুধ —এরা যন্ত্রণার বিচ্ছুরণটা মাঝপথেই থামিয়ে দেয়।

যন্ত্রণার খবর বা অনুভূতি মগজে এক-জোড়া বাদামের মত জিনিষ পর্যন্ত পৌঁছোতে হবেই; এদের বলে অ্যালামাস্। তাও নয়, আরও এক ইঞ্চি কি দু' ইঞ্চি উপরে মগজ পর্যন্ত যতক্ষণ না ব্যথাটা স্পর্শ করছে, তখনও আছি এক রকম, তারপরেই সুরু হয় বাবা-রে, গেলুম-রে!

মাথার মধ্যে এই যে ধূসর-রঙের পদার্থ, যেখানে চলে অনুভূতির স্পর্শ, যেখানে পড়ে যন্ত্রণার আঁকিবুকি, এই কোটি কোটি শিরা-কোষকে বলে কোরটেক্স ব্যথা-বোধের নানা আশ্চর্য কাহিনী দিয়ে এই কোরটেক্সের-এর কার্যকারিতা বোঝা যায়। কয়েক বছর আগে ক্যান্সাস শহরের এক ভদ্রমহিলার সারা মুখে সাংঘাতিক যন্ত্রণা দেখা দিল। চিকিৎসা-শাস্ত্রে একে বলে ফেসিয়াল নিউরালজিয়া গালে আঙুল ঠেকাবার উপায় নেই। খোলা জানালা দিয়ে সামান্যতম হাওয়া এসে মুখে লাগলেও মনে হয় মুখের চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা প্রতিমুহূর্তেই মৃত্যুর প্রার্থনা করছেন। অন্ততঃ কিছু যন্ত্রণার উপশম দেওয়া যায়—এ-জন্য অস্ত্রোপচার করে মগজের কিছু শিরা কেটে কোরটেক্স থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। আশ্চর্য কাজ হল এতে। ভদ্রমহিলা চোখ মেলে ডাক্তারকে বললেন, বাঁচলাম। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, মুখের ব্যথা সম্পূর্ণ গেছে?

না, এখনও সম্পূর্ণ যায়নি, বললেন মহিলাটি। কিন্তু—ওঃ তেমন যন্ত্রণা আর নেই।

মহিলাটি শান্ত হলেন, কিন্তু মুখের ব্যথা রইল; তা থাক, কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন।

এমনি অনেক অস্ত্রোপচার ডাক্তাররা আজকাল করছেন। এতে এটা অন্ততঃ প্রমাণিত হয়েছে যে কোরটেক্স-এর সংগে যন্ত্রণার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সাধারণত ছোটখাটো আঘাত বা রক্তপাত থেকে আমরা দু'রকমের ব্যথা অনুভব করি; অবশ্য এটা নির্ভর করে ব্যথাটা মগজ পর্যন্ত পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগে, তার উপর। কাঁটা বা আলপিন ফুটলে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মত ব্যথা অনুভব করি। এই যে অনুভূতি, এটা মগজে পৌঁছায় কতকগুলি শিরার মাধ্যমে, এ-কথা আগে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এর গতির একটা হিসাব করেছেন, শারীরিক ভংগিতে।

অন্য অনুভূতি আসে এক মুহূর্ত পরে; একটা জ্বালা যেন; এটা থাকে প্রায় তিরিশ মিনিট, কিংবা একটু এদিক ওদিক; এ-যন্ত্রণা স্নায়ুর মধ্যে ছড়ায় ঘণ্টায় দুই থেকে তিন মাইল গতিতে। আগের সংকেতটা হচ্ছে: "সামাল!"

পরেরটা "ও কিছু নয়।" নিউ ইয়র্কের ডাক্তাররা ব্যথার গুরুত্ব মাপবার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রটি ম্যাগ্‌নি-ফাইইং গ্লাসের মত এক হাজার ওয়াটের সাহায্যে রোগীর কপালের মাঝখানে আলো নিক্ষেপ করে, একটি ডায়াল ঘুরিয়ে এই আলোর জোর আর উষ্ণতা বাড়ানো যায়। যন্ত্রের কাঁটায় যন্ত্রণার মাপ ওঠা নামা করে। খুব আস্তে আস্তে ডায়াল ঘুরিয়ে দেখা যায় কতটা বাড়ছে যন্ত্রণা। যন্ত্রের সংগে একটি মিটার লাগানো আছে, যন্ত্রণা মাপবার কুড়িটা ডিগ্রির দাগ এই মিটারে। এই ডিগ্রির নাম ডল শব্দটা এসেছে ডলর থেকে। ডলর মানে যন্ত্রণা বা ব্যথা। অল্প মাথা ধরা বা ঐ-জাতীয় মৃদু যন্ত্রণার মাপ এক থেকে দুই ডল; আলপিন ফোটা, পেশীর ব্যথা, বাত, পেটে ব্যথা দুই থেকে চার ডল; কেটে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া, দাঁতের ব্যথা তিন থেকে ছয়। এ্যাসপিরিনে কমছেনা এমন মাথা-ধরা, পায়ের গোড়ালী মচকানো, এ-সব জাতীয় হচ্ছে সাত থেকে নয়। পুড়ে যাওয়া, ছ্যাঁকা লাগা, প্রসব-ব্যথা বা হৃদরোগজনিত বুকের ব্যথা দশ ডল।

যন্ত্রণা সহ্য করবার একটা সীমা আছে। ব্যথা যখন দশ ডল-এ পৌঁছায়, তখন বুঝতে হবে আর সহ্য করবার ক্ষমতা নেই। ডিগ্রি হিসাবে গরম তেলের ছিটে বা প্রসব-বেদনার মাপ একই। তফাৎ হচ্ছে দ্বিতীয়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী এবং শরীরের অনেক অংশ অনুভূত হয়।

কঠিন আঘাত সব সময়েই যে যন্ত্রণা-দায়ক, এমন কোনো কথা নেই। বুলেটের আঘাতে প্রথমে যন্ত্রণাই হয়না, কেননা ঐ প্রচণ্ড ধাক্কাটা ব্যথা-বোধের স্নায়ুগুলিকে অসাড় করে ফেলে, মগজ পর্যন্ত পৌঁছায়-না; ক্লোরোফরম এবং ঐ-জাতীয় চেতনা-বিনাশক ওষুধ যেমন করে স্নায়ুকে বোধ-শক্তিরহিত করে তোলে।

এই যন্ত্রণা-মাপের যন্ত্রদ্বারা জানা গেছে চোখের কর্ণিয়া সব চাইতে বেশি ব্যথা-সচেতন, কর্ণিয়া হচ্ছে চোখের অতি-সূক্ষ্ম পাতলা আবরণ, এই আবরণের সংগে সংযুক্ত আছে সংকেত-সূত্র—যার দ্বারা সামান্যতম উষ্ণতাও আমরা ক্ষণিক অনুভব করতে পারি।

মানুষ কতটা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে? অনেক হৈচৈ সত্ত্বেও এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে: সহ্য ক্ষমতা কোন্ মানুষের কতটুকু এটা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। এটা নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনের কাঠামোর উপর: তার মন এবং মেজাজের উপর। বাবা মা-র মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া এই ব্যাপারে অনেকাংশে দায়ী। আজকের দিনে ব্যথা-বেদনা আমায় কতখানি কাতর করবে, বিচলিত করবে, তা নির্ভর করে একদিন আমার বাবা মা এমনি ব্যথা-বেদনায় কতখানি কাতর বা বিচলিত হয়েছিলেন তার ওপর। যদি তাঁরা ধীর শান্ত মনে সহ্য করে থাকেন, তা হলে, খুবই সম্ভব আমার দ্বারাও তা সম্ভব হবে। আবেগ বা ভাবপ্রবণতার ক্ষেত্রে অনুরূপ যুক্তি প্রযোজ্য। অত্যাধিক আবেগপ্রবণ পিতামাতার সন্তানদের দেখা যায় নাটকীয় স্বভাব, অল্পতেই ভেঙে পড়া।

এমেরিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তারের মতে আমাদের জীবিকা-পন্থার সংগে এই

ব্যথা-বেদনার যোগাযোগ আছে। অফিসে যাঁরা কাজ করেন, যাঁদের শরীরের ওপর দিয়ে কমই চোটপাট যায়, হঠাৎ কোনো গভীর আঘাত পেলে তাঁরা বেশি রকম "শক" পান; অন্যদিকে যাঁরা দিন-মজুর, ক্ষেতেখামারে কাজ করেন, বা যাঁদের খেলাধুলো করা অভ্যাস, তাঁরা হাসি-মুখেই যন্ত্রণা সহ্য করেন। শিশুদের যন্ত্রণাবোধ অনেক বেশি; যত আমাদের বয়স বাড়ে ততই যন্ত্রণাবোধ আমাদের কমতে থাকে।

তবে, সাধারণতঃ আমার এবং আপনার মধ্যে যন্ত্রণাবোধের তারতম্য খুব বেশি নয়। একবার এক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে কার যন্ত্রণাবোধ কম। স্বামী ফুটবল প্লেয়ার; স্ত্রীও কম যায় না, উঁচু হীলের জুতো পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। স্বামী বলে থাম, মেলা বকবক কোরোনা, একটুখানি কেটেকুটে গেলে তুমি হৈচৈ বাধিয়ে দাও, যা আমি ভ্রুক্ষেপও করি না। স্ত্রী বলে ওমা! চ্যাঁচাই তুমি একটু আহা, উহু করবে বলে, না হলে ওসব ব্যাপার আমি গ্রাহ্য করি না কি?

ঘরে ঘরে এমন তর্কের শেষ নেই; দু'জনের চিন্তাতেই গলদ আছে। যন্ত্রণা-মিটারে দু'জনেরই ব্যথার মাপ সমান হবে। অনুভবের ব্যাপারে কে জিতবে কে হারবে, বলা খুব কঠিন।

যন্ত্রণার আলোচনায় খারাপ ভাল-র প্রশ্নটা অযৌক্তিক। সেই যে ছেলেটিকে নিয়ে এ-প্রসঙ্গ সুরু হয়েছিল, সে একটি অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত, ব্যথার কোনো অনুভূতি তার নেই; তার মানে ভাল থাকা আর না থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তার কাছে; এটা বাস্তবিক বিপদের কথা। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক সংকেতের কোনো সাহায্যই সে পাবে না; এমনটি হওয়াও বিচিত্র নয় চরম বিপদের মুহূর্তে জীবন রক্ষা করবার সময় পর্যন্ত না থাকতে পারে। ব্যথা বা যন্ত্রণার সংকেত শরীরকে সুস্থ করে তোলবার সুযোগ, নিজেকে বাঁচাবার সুযোগ।

[ করোনেট

কেবল আত্মাগুলো নদীর স্রোতে নৌকোর মতো ভা

# কোন এক শরতে

**সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ**

কিংবা এগুলো স্বপ্নে ঘটেছিলো। পৃথিবী তখনো বেঁচে। তখনো আকাশে নক্ষত্রের রাত ছিল। চুইয়ে চুইয়ে অনেক শিশির জমে থাকতো ঘাসের পাতায়। নক্ষত্রের আলো এসে গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে যেতো। অনেক ঘাসফড়িঙ। অনেক পাখি ছিল। একটি কি দুটি প্রজাপতি! গুটিকয় ফুল। কিছু ধানের শীষ। কারুর আঙিনায় রাঙা মাটির স্তূপ। এবার শীত আসবে, খু-উ-ব শীত তারা বলতো। এবার শীতে কেউ বাঁচবেনা এবং কোন বুড়ো চাষা থ্যাবড়া হাতের মুঠিতে

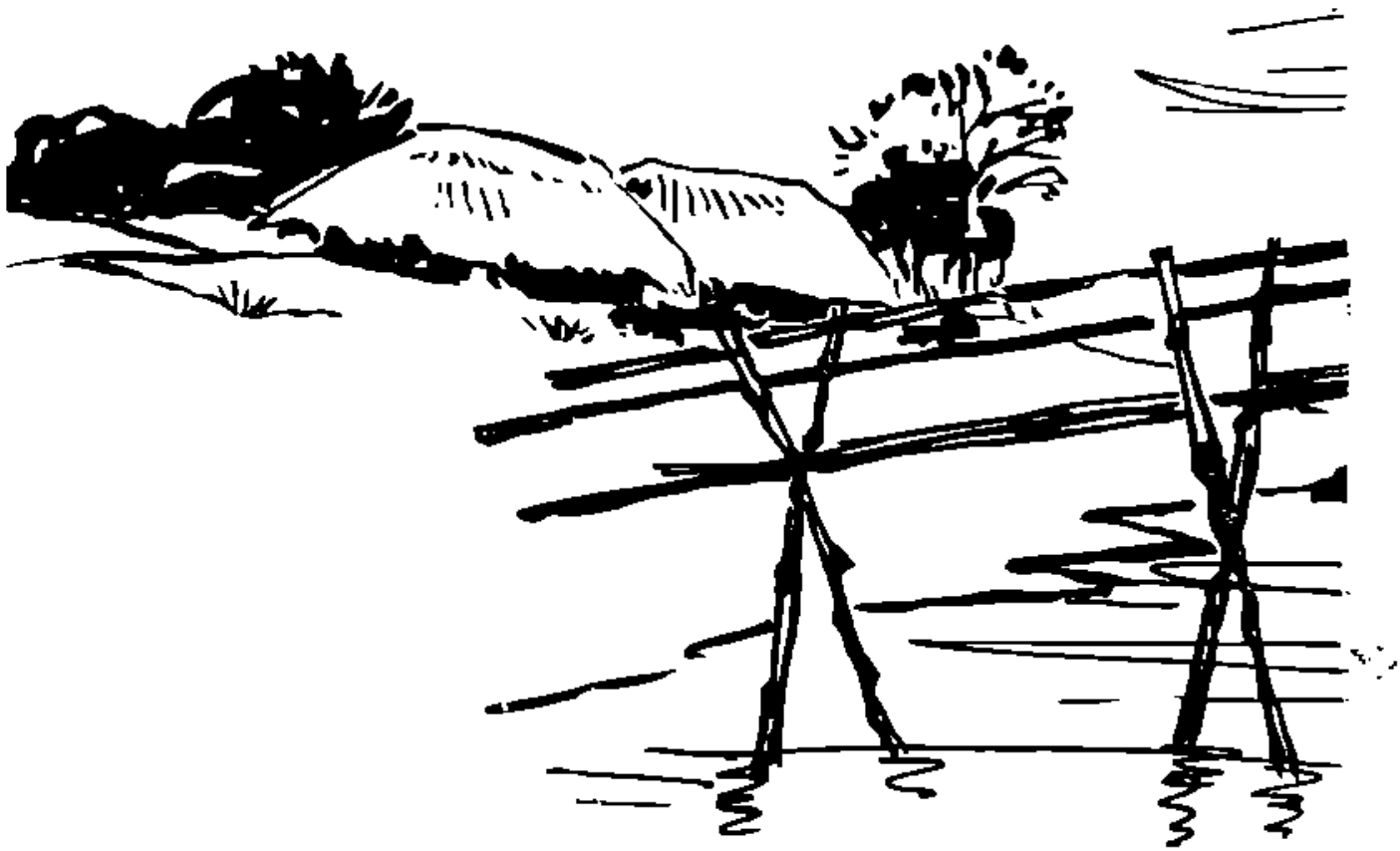

কাস্তের বাঁট চেপে ধরে জাম-জারুলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাঠ দেখে নিতো। ওসব আমি মানিনে। অনেক শীত আমি দেখেছি। আমার রক্ত জমিয়ে আমায় মেলার পুতুল বানাতে চায় সেই সব আশ্চর্য ধারালো শীত। চাঁদখানা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে। আমি তখন শুকনো ফাঁড়িঘাস খুঁজে এনে আগুন জেবলেছি। পৃথিবী তখনো বেঁচে। তারপরও বেঁচেছিলো। আমার মরাইয়ে তখনো কিছু ধান। কিছু সোনা-মুখি ধান। কিন্তু...কিন্তু এর পর আমি বাঁচিনি। আমার মৃত্যু হয়েছিলো। কেননা শীত চলে গেলে তার একটা থাবার নখ আমার মরাইয়ের নীচে পোকার মতো বাঁচলো. টের
পোকারা বড়
বড় হলো তার লম্পটে শুঁড়
টানলো।

পুতোর সেই বেয়াড়া
চাচা বললো, মরে গেলুম। কিন্তু আমার হাড়গুলো বেঁচে রইলো। হাড়-গুলো ভীষণ শব্দ করে ঘ। মাঠের মাটিতে ঘুরে বেড়ালো। তোরা সেই হাড়ের টুকরো জড়ো করে কোন মেয়েকে ডেকে এনে তার কপালে চন্দনের ফোঁটা, কয়েকটি ধান, দূর্বাঘাস, এক চিলতে

সে

ঘটেছে চিরদিন। পৃথিবী এমনি করে বাঁচছে। বাঁচবেই।

না, আর বাঁচবেনা। ওদের স্বর চাপা ওরা ফিসফিস করছে। শীত আসছে, খু-উ-ব শীত। এর পর পৃথিবী আর নেই। মানুষ নেই। বিনোটির থানায় সেই ঘণ্টাটা আর বাজবেনা। কেবল আত্মাগুলো নদীর স্রোতে নৌকোর মতো ভাসবে। ঘণ্টাটা বাজছে না। ওরা ডুবছে না। তখন কী হবে, কী হবে? আমি খেতে পাচ্ছিনে, আমার খিদে। আমি জন্মাবার জন্যে মেয়েদের মুখ খুঁজছি, কেউ নেই। নেই-ই। আমার ভালোবাসা আমার আগ্রহ, আমার অহংকার। ইচ্ছা তৃপ্তি অভিযোগ। এবং কান্না। এগুলো ঘটতেই থাকবে সব সময়।

এই সব বলাবলি হতে হতে বেলা ফুরিয়ে সন্ধে নামলো। গাভীর গলায় ঘণ্টা বাজলো বাছুরের ডাক। নইম সেখের আজান। নইম সেখের গলাটা কাঁপছে। মান্যবরের বৌ শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। এবং কোথাও ট্রেনের শব্দ। কোনখানে। বিনোটীর মাঠে সেই অনেক উঁচু নামটায় নীল আলো জেবলেছে। মান্যবরের বড় ছেলে বললো, শীতের শেষে বিনোটীতে শ্যামচাঁদের মেলা বসবে। ভা-রী ধুম। আমি রেলগাড়ি চেপে মেলায় যাবো। ( যদি বেঁচে থাকি ) আর ফণী পঞ্চায়েত— যে শীতের খবর সংগ্রহ করে এনেছিল, টায়রাচোখে হাসলো। সে শহর থেকে খবরের কাগজটা কিনে এনেছিলো। ফণী বললো যুথির বিয়েটা সুমুখে। আমি তো পাথর হয়ে আছি ভাবনায়। মস্তো ঘর। পাঁচটি মরাই। দুখানা লাঙ্গল। ওদের চারজোড়া বলদ। ভাবনায় দুবেলা খোল খায় আধমণ।

সন্ধের মুখে সুখি ফিরে এসেছে ওর বকুলের বাড়ি থেকে। ওর বকুল শ্বশুর-বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি বিয়োতে এলো। সুখি ওর বকুলের ঝুলেপড়া তলপেটে ভয়ে ভয়ে হাত বুলিয়েছে। ওরে বকুল, এর মধ্যিতে মানুষ আছে? থাকে নাকি? কী খায়? বকুল, তোর বুকের মুখদুটি কী কালো হয়ে গেছেরে। এসব কেন হয় বাপু। বেশ তো ছিলি।

তোর বর যখন তোকে চুমু খাবে, তখন তোরও হবে। পেটে একটা হাড় গজাবে—পাতলা মুটমুটে নরম হাড়। বকুল হাসলো। বকুলের বুক আর পেট দুলে উঠলো।

আমার হবে না। সুখি কিছু ভাবলো। আমি শিবপুজো করিনে। ব্রত করিনে। আমার মা আমায় মারে। আমি পিটুলির ঝোপে লুকিয়ে থাকি।

তুই কচি খুকিটি রয়ে গেলি। তুই বড়ো হবিনে ভাই। বেশ আছিস।

সেই তো ভালো আমি কোথাও যেতে চাইনে রে। কোথাও। কারুর ঘর নিকোবনা। কারুর দেয়ালে ছবি আঁকবোনা পদ্মফুল ধানের শীষ। লতা। আমার আতাগুলো পেকেছে। তোকে দিয়ে যাবো বকুল। আর জানিস ভাই, সিধুদের পুকুরে অনেক ন্যাকা ধরেছে। কিন্তু কোত্থেকে সব কানকুটোরি পোকা এসে গাছগুলো কালো হয়ে গেছে। আমার বড় ভয় করে। কানে ঢুকলে বাঁচবো না। একদিন ডুবতে ডুবতে কী কষ্ট—উঃ মানুষ ডুবে মলে বড় কষ্ট পায় বাপু।

সেদিন জানলুম। বকুল ফিস ফিস করে বললো যদি আমি মরে যাই।

ষাট, ষাট, থুঃ ওর আঁচলে এক ফোঁটা থুথু ছিটোল সুখি। মরবিনে। মা আমায় মরে যেতে বলে। আগে ভাবতুম যাই না মরে। ওরে বাবা সেদিন টের পেয়ে গেছি! কিন্তু সুখির চোখ ঘন হল বাবা রাত্তিরে ঘুমোয় না জানিস? বাবা বলে বেড়াচ্ছে এবার নাকি খুব শীত হবে খু-উ-ব। তখন আমরা কেউ বাঁচবোনা।

বিয়োতে খুব কষ্ট, ভাই আমি লুকিয়ে দেখেছি। বকুল বললো। প্রথম পোয়াতিরা নাকি অনেকেই বাঁচে না।

সুখি বললো (হবে!) আয় বকুল, আমরা একটু কেঁদে নিই। ওরা দুজন পরস্পর শরীর ছুঁয়ে কয়েকটি ফোঁটা চোখের জল ফেললো।

এবং এসবই ঘটেছিলো সেই আশ্চর্য শীতঋতু আসবার আগেই। পৃথিবীতে তখনো ধানের পাতা হলুদ হয়ে নুয়ে পড়েনি। কচি ধানের থোড়ে শিশিরের জন্যে অনেক তৃষ্ণা ছিলো। অনেক ইচ্ছে। বাঁশবনের শীর্ষে গাল ঘষে ঘষে চাঁদ হয়েছিলো কাচের মতো চকচকে। চাঁদের শরীরে কেউ তখনো কাস্তের ডগা খুঁজে পায় নি। চাঁদ তখনো ঝলসানো রুটির মতো ফ্যাকাসে আর ফাঁপা হয়ে ওঠেনি। চাঁদে সেদিন কোনো রূপসী বুড়ী রেশমী সুতো কাটছিলো। কাটছিলো। পাটের বনে চিরোল চিরোল পাতায় শালুক আর চড়ুইদের উচ্চকিত করে ফণী পঞ্চায়েত খুঁজতো সুখেশ্বরীকে। সুখি বাগদীবৌর গুগলি ভাঙ্গা দেখে ওদিকে থালের উপর বাঁশের সাঁকোয় বুক রেখে ভাবছে। সিধু চুলের গোছায় চিরুনি চালাতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। পাটের জমিতে ঘাস নিড়িয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এলো সিধু। সিধু এখন শুনলো ফণী হালদারের লম্বাটে স্বর শিশির জমতে থাকা মাঠের বুকে সোনা-ব্যাঙের মতো গ্যাঙাচ্ছে।

পৃথিবীতে দিনগুলো এসব নিয়েই কাটছিলো। এইসব চাষা বাগ্দীবৌ। সুখি, বকুল। আর, একদিন এক যাদুকর এলো গাঁয়ে। তার হাতে বাঁশী আর ডমরু। তিনটে ছিদ্রে নটি সুর বাজিয়ে অবাক করলো ওদের। তার ঝাঁপিতে শংখচূড় সাপ। তার ঝোলায় রাহু চণ্ডালের হাড়, সেই হাড় নড়ে। কাঁপে। কথা বলে। যাদুকর বললো। যাদুকর তার ঝোলা থেকে একটি আশ্চর্য পাথর বের করলো। সে-পাথর ছোঁয়ালে ভাল-বাসা—যাদুকর তার বিদেশী বুলিতে মিষ্টি করে বললো, বা-থা-রা জাগে ছেলের জন্যে মেয়ের, মেয়ের জন্যে ছেলের মনে। বুড়োরা বললো খবরদার বাপু। জোয়ানেরা বললো, আমরা চুপি-চুপি হাত বাড়াচ্ছি। তুমি টুপ করে ফেলে দাও যাদুওলা। কেউ দেখবেনা, যাদুকর হাসলো। একটি মাত্তর আছে। আর তো নেই। কারে দেবো, কে দুঃখু পাবে। কার মন রাখবো, কার হিংসে হবে। তাই একে রাখলুম। আর, এই দ্যাখো চোট্টু কসায়ের ছুরি। চোট্টু কসাই এই দিয়ে লক্ষ জীবের মুণ্ডু কেটেছে। চামড়া ছাড়িয়েছে। গর্দান আর রাঙের বাছা বাছা মাংস কেটে আলাদা আলাদা করে বিক্রী করেছে। চোট্টু কসাই একদিন মরে গেল।

তোমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল বুঝি?

ওরা বলল। তাই তোমায় দিয়ে গেল।

ভুলু, ভুলু। আচমকা চেঁচাল যাদুকর। ছুরি যখন জানতে পারলো চোট্টু কসাই মরবে, ছুরি ছুটলো, ছুটলো!

হ্যাঁ। পাহাড় পর্বত মাঠ নদী জঙ্গল পেরিয়ে ছুটলো। উত্তরে ছিলেন আমার গুরু। হিন্তালের লাঠি মেরে ছুরিটা ফেলে দিলে দুধনদীর জলে। দুধনদীতে মাছ ধরছিলো বিন্দু মেছনী, তার বুকে লাগলো ছুরি। দুধনদীর জল রক্তে লাল।

আহা!

নারীহত্যার পাতক লেগে ছুরি হলো অচেতন। ভাসতে ভাসতে সাগরে যায়।

আশ্চর্য!

তারপর...

থাক্ থাক্, খুব হয়েছে। ফণী পঞ্চায়েত ধমকালো। ফণী পঞ্চায়েত বললো, সব ভেল্কী আর বুজরুকী। ওরা মাথা নাড়লো, হবে, হবে। ফণী পঞ্চায়েত খবরের কাগজ পড়ে। ফণী পঞ্চায়েত শহরে যায়। ও অনেক কিছু জানে।

ফণী বললো, তোমার ছুরির কী গুণ, সেইটে প্রকাশ করো।

গুণ? যাদুকরের চোখ দুটো ভাঁটার মতো ঘুরতে থাকলো। মুখের একটি কথা—শুধু একটি পলক, এই ছুরি আসমানের লাস ফালাফালা চিরে দেবে, জমিনের বুকে খুনের দরিয়া বইয়ে দেবে। বিলকুল দুনিয়ার আদমী ঔর জানোয়ার সব স-ব খতম হয়ে যাবে। যাদুকর বিকট হাসলো কেউ থাকবে না। কিছু থাকবে না।

ও পঞ্চায়েত ছুরিটা চাঁদা করে কিনে নাও বাপু। শীতটা রুখবো। ওরা পরস্পর কথা বলতে থাকলো। এবং ছুরিটা সত্যি সত্যি পেলে শীতের গর্দান আর রাঙের মাংসগুলো আলাদা করে নিতে পারবে কিনা এ নিয়েও তর্ক করলো। ওদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধলো। কেবল বোকা সিধুটা ভাবলো, ছুরি নেবোনা। বরং ঐ ভালোবাসার পাথরটা পেলে শীতে মরতেও রাজী আছি। কেবল সুখি ভাবলো, রাহুচণ্ডালের হাড়টা নেবো। কাঁপবে। শুধু কাঁপবে। নড়বে। আমি কাপড়ের নীচে শক্ত করে ধরে রাখবো। বকুল কী চাইবে খুঁজে পেল না। শীতের আগেই সে বিয়োবে—তখনই মরবে। সময় কোথায় তার, একটু নিশ্চিত সময়! বকুল ভাবলো, তার জন্যে কিছু নেই। কিছু নেই।

ফণী পঞ্চায়েত তার পকেট থেকে কাগজটা বের করে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলো। আর লোকগুলো অমনি ছত্রখান হয়ে পড়েছে যাদুর আসর ভেঙ্গে। যাদুওয়ালার মুখ করুণ হয়েছিলো। যাদুওলা তার ঝাঁপিঝোলার মুখ এঁটে বাঁশী থামিয়ে ডমরুর ঘাড়ে হাতের মুঠো চেপে আসর গোটালো।

ঠিক সেই সময় শঙ্খনীর বিলে কোথাও আগুন জ্বলে ওঠা দেখতে পেল ওরা। ফণী হালদার বললো, রাখালেরা ব্যানাবনে আগুন জেবলেছে।

আগুন কি গাঁয়ে আসবে? কী আগুন, কী আগুন দ্যাখো।

তিতিরগুলো পুড়ছে। পোকা। সাপ শামুক সুখি আগুন দেখে বললো।

সিধু বললো, আখের কচি পাতা ঝলসে যাচ্ছে।

ওরা আগুন দেখতে থাকলো কাগজ

ফেলে। ফণী পঞ্চায়েতও করুণ হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এরা বড্ড বোকা। এরা এত বোকা।

এই ঘটনাগুলোর পর গাঁয়ের লোকগুলো পরস্পর একা হয়ে গিয়েছিলো। কেউ কারুর জন্যে ভাবতোনা। যাদুকরের ছুরি পাথর আর হাড় ওদের মনে আলাদাভাবে বুজকুড়ি তুলছিলো। প্রত্যেকেই পছন্দমতো একটি নিতে পারতো—এই ভাবনায় ওরা কাতর। আর বকুল, অভাগী বকুলও তার তলপেট চেপে ধরে ভয়ে ভয়ে চুপিচুপি কাঁদছিলো। যাদুকর, তোমার শঙ্খচূড় সাপটা আমায় দিয়ে গেলে না বাপু, তার গলা জড়িয়ে চুমু খেতুম।

খালের উপর বাঁশের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে সিধু বললো, কী এত খুঁজিসরে সুখি? বনেবাদাড়ে জলেকাদায়? সুখি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, তুমিও কী খোঁজ পাকে বনে ধানের গোড়ায়? ঘাসে?

আমি কিছু খুঁজিনা। আমি ধান আর পাটের গোড়া থেকে আগাছা আর ঘাস উপড়ে ফেলি। তবেই তো পাট হবে, ধান হবে রে। মরাই ভরবে। আমরা বাঁচবো। আর ঘাসগুলো খেয়ে আমাদের শ্যামলী বাঁচবে। আকন্দর রসের মতো সাদা দুধ শ্যামলীর। আমরা চুমুক দিয়ে খাবো।

সিধুদা, আমিও তাই খুঁজি। পানফল মানকাটা, কালো কালো আঁসটে, আতা আর মনিফল। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বাঁদীবৌর কাছে কাঁকড়াপোড়া খাই। আমার যে খুব ক্ষিদে—কিছুতেই পেট ভরে না। মা আমায় রাক্ষসী বলে।

ছ্যাঃ ছ্যাঃ! সিধুর ঠোঁটে তাচ্ছিল্য। সিধু থুথু ফেললো খালের নীচে জলের উপর। তার থুথুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া ছোট্ট মাছগুলো দেখতে দেখতে সিধু বললো তুই জংলী মেয়ে সুখি। ফণীকা তোকে মারবে। কি ভাবছিস্ রে?

শীতের পর গাছগাছালিতে আর ফল ধরবে কিনা। তারপর জলের কাঁকড়া...

ওরা কেউ বাঁচবে না। শীত তো সকলের জন্যে।

সত্যি কথা বাপু। তাই শেয়ালগুলো এখন থেকে কাঁকিয়ে কাঁদছে রাতবিরেতে।

যাঃ ওরা তো (...) ওরা বড়ো দুঃখু পাচ্ছে।

দুঃখু কী সিধুদা!

জানিস্ নে? তুই অবাক করলি সুখি। দুঃখুর নাম কান্না।

কি জানি। আমি কিন্তু আর কাঁদবোনা।

অনেক সময় ধরে এসব অদ্ভুত কথা বলতে থাকলো ওরা। সেখানে কেউ ছিলোনা। কেউ। খালের জলে কয়েকটি বুদবুদ ছিলো। একটি লেজঝোলা পাখিও।

মাত্র একটি ভালোবাসার পাথর—সিধু বললো মনে মনে। সুখি ভাবলো, একটি রাহু চণ্ডালের হাড়। নড়তো। কাঁপতো। পাখির বাচ্চার মতো। আমার গায়ের মাংস খুবলে লুকিয়ে রাখতুম। ওরা দুজনেই ভাবলো আমরা যাদুকরের খোঁজে যাবো।

ফণী হালদারের কাগজ আর যাদুকরের ছুরি হাড় পাথর শঙ্খচূড়ের ঝাঁপি গাঁয়ের মানুষগুলোকে এমনি করে তোলপাড় করেছিলো। বস্তুত পার্থিব অপার্থিব সব ঘটনা ও দৃশ্য, ইচ্ছা আর

প্রতিজ্ঞা ওরা ঐ জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে বিচার করতে থাকলো। এবং শীত আসবার আগেই এগুলো ঘটেছিলো।

বকুল, ওরে বকু তুই কাঁদিসনে। তোর পেটে রাহু চণ্ডালের হাড়টা রেখে গেছে যাদুওলা।

কী যা তা বলিস্! বরং সেই পাথরটা...

তোর কথার মানে বুঝিনে।

বুঝবি। তোর বর আসুক।

বর আমায় একটা হাড় দেবে।

দেবে। আগে পাথরটা তোর গালে ছুঁইয়ে দেবে।

সেই যাদুওলা যদি আমার বর হতো।

ছিঃ ওরা মড়াখেকো গুণিন।

(শীতের আগেই তার দেখা পেতুম! আমি শিবপুজো করবো। ব্রত করবো। মা আমায় মারবেন।)

হ্যাঁরে, গাঁয়ের লোকেরা সেই ছুরিটা নিয়ে রাখেনি? জানিস্ তুই?

দূর, বাবাই তো সব ভণ্ডুল করে দিলো।

তোর বাবা বড্ড কেমন যেন।

তোর বাবা খুব ভালো।

আমার মাও।

আমার মা আমায় খুব মারে বকুল। শীত এলে মাটা তো বাঁচবেই না।

তোর বড় দুঃখ ভাই।

তোরও।

হুঁ। পেটে কী যে এসে গেল...

আমার পেটে এলে আমি ভাবতুম না।

ইস্।

কী করে আসে রে?

বর চুমু খেলে।

বর এলে আমি তাকে চুমু খেয়ে দেখতুম।

তুই বড্ড বেহায়া।

সেই শরতে পৃথিবীর মাটিতে হাজার হাজার ক্ষুধা তৃষ্ণা আর ইচ্ছার কীট মানুষের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়েছিলো। অতো ক্ষুধা কোনদিনও আসে নি। অতো তৃষ্ণা। অতো ইচ্ছে। ভালবাসবার। প্রাণ ধারণের। বংশবহনের, শীতের আগেই একটা বৃহত্তর ধরনের পূর্ণতা চেয়েছিল পৃথিবী।

সিধুদা, সেই যাদুকর আর আসবে না?

কী জানি, তোর বাবা যতো নষ্টের শিরোমণি সুখি। আমি বুঝি। ওর কাগজটা নেহাত বাজে।

বাবা মরে যাবে, দেখে নিও। কিন্তু সিধুদা, সেই যাদুকর কি বাঁচবে?

কেন রে?

আমার চারটে আতা পেকেছে। সবগুলো দিয়ে হাড়টা নিতুম।

কী হবে মরা মানুষের হাড়ে! ওতো সেই ওপাড়ার বুড়োটার মতো মাঠে মাঠে নড়ে বেড়াবে। বিচ্ছিরি শব্দ করবে। হয়তো একদিন বেঁচে উঠবে। বুড়োটাও বেঁচেছিল। নৈলে কী মুশকিল হতো বল। মাঠ অনাবাদী থাকতো। ধান না আখ না পাট না। কীই বা জানি আমরা চাষবাসের!

আমি হাড়টা পেটের মধ্যিতে রাখতুম।

অবাক সুখি, আমি অবাক।

সত্যি সিধুদা।

আমি তবে সেই (ভালবাসার) পাথরটা দিয়ে...

কী করতে?

(কোন মেয়েকে চুমু খেতুম।)

বলবেনা?

কোন মেয়ের—ধর যাকে আমি সব-সময় দেখতে পাই, তার গালে ঠোঁটে বুকে...!

একটা ছাতিম গাছের নীচে ছায়ায় ঘাসের ফুল দলে ওরা বসলো। আর আশ্চর্য, ওরা একটি এলেও আসতে পারে এমন মানব শিশুর কান্না শুনলো কোথাও। ওরা কান পেতে খুঁজে ঠিকানা না পেয়ে এক সময় পরস্পরের বুকে মাথা রাখলো। সে সময় কেউ ছিল না। কেউ।

ইতিমধ্যে পাটকাটা হয়ে গেল কোনো কোনো জমির ফাঁকা বুক চষে শেষ মরশুমের ধান রোয়ার চেষ্টা চলছিলো। বুড়োরা বললো যতটা পারো ফসল ফলিয়ে রাখো শীতের আগেই। আমরা যখন থাকবোনা কোথাও একটি পোয়াতি বেঁচে থাকে। কোনখানে। সিধু বললো, আমরা থাকবো না, ধানগুলো থাকবে। সে বড় বিচ্ছিরি দেখায়। বরং বুড়োরা বিমর্ষ ভাবে মাথা নাড়লো। যদি ছুরি-খানা পেতুম শীতের মুণ্ডু কেটে গাছে ঝুলিয়ে রাখতুম। ফণী পঞ্চায়েত খুব মন্দ লোক। সেইতো যাদুওলাকে তাড়ালো।

কিন্তু যাই বলো, ফণী পঞ্চায়েত শীতের খবরটা আগে ভাগে জোগাড় করেছে।

সুখির বকুলও একদিন বললো: দ্যাখ ভাই, আমি ভেবেছি শীতের আগে আমি বিয়োব না। চেষ্টা করে দ্যাখনা।

যাঃ। কোন মানে হয় না তোর কথার।

আমি এদিকে ভেবে সারা।

কেন রে?

সিধুদা বলছিল, শীত আসবার আগে...

কোথাও চলে গেলে বেশ হয়। যেখানে শীত আসবে না। সেখানে। সিধুদার হাতে পাথর। আমার পেটে হাড়।

তাই যাস্। কিন্তু শীত তো সব-খানেই আসবে।

এমন দেশ কি কোথাও নেই রে?

কী জানি। হয় তো যাদুকর জানতো। সে গেছে সেই দেশে। তোর বাবা বড্ড বিশ্রী কাণ্ড করে ফেলে বাপু।

আমরা কী করবো বকুল? আমার কি মনে হয় জানিস, সিধুদা হয়তো সেই পাথরটা পেয়ে গেছে, কখন আমার গালে ছুঁয়ে দিয়েছে কেবল আমিই কী বোকা, কিছু পেলুম না। আর পাবোনা কোনো-দিনও। বকুল, আমার মাথা কুটে কাঁদতে ইচ্ছে করে ভাই।

আয়, তবে দুজনে একটু কাঁদি। ওরা দুজনে গলা জড়িয়ে ধরে চোখের কফোঁটা জল ফেলল। পৃথিবীতে সেই ভয়ংকর শীত ঋতু আসবার আগেই এভাবে সবখানে প্রস্তুতি চলছিল। ওরা গভীর ভাবে বিমর্ষ ওদের আতংক জমেছিল অপরিসীম। অথচ ওরা কাজ করছিলো জমিতে জমিতে। মনে মনে। কোলাহলে এবং নির্জনে। প্রস্তুত হচ্ছিল একটা চরমকে বরণ করার জন্যে। যাদুকরের ছুরিটা ওদের জন্যে একটা বাস্তব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অথচ যাদুকর উধাও। কোন দূরে দূরা-ন্তরে। কোথায় তার বাঁশের বাঁশী, ডমরু, হাড় পাথর শংখচূড়ের ঝাঁপি।

এবং পৃথিবী তখনো বেঁচে। তখন এগুলো ঘটেছিলো। বাস্তবে কিংবা স্বপ্নে।

[ ঘরোয়া

মানুষ কি আজো যোগ্য হয়েছে সেই অস্ত্র হাতে পাবার

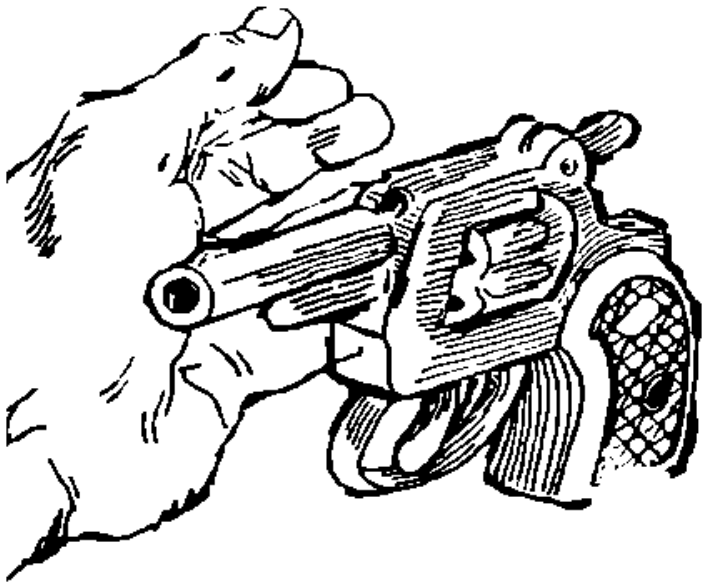

# ব্রহ্মাস্ত্র

ফ্রেডরিক ব্রাউন

সন্ধ্যার প্রথম আবছা অন্ধকারে ঘরখানা একেবারে চুপচাপ। একটা জরুরী পরিকল্পনার প্রধান বিজ্ঞানী ডাঃ জেমস গ্রাহাম নিজের প্রিয় চেয়ারটিতে ডুবে আছেন চিন্তায়। ঘরখানা এত চুপচাপ যে পাশের ঘরে তার ছেলেটি যে ছবির বই নাড়াচাড়া করছে সেই পাতা উল্টাবার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল।

আজ রাতে তার মন যেন আর কাজ করবে না। বার বার কেবলি মনে হচ্ছিল মনের দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া তার একমাত্র ছেলেটির কথা। পাশের ঘরেই বসে আছে সে। বছর কয়েক আগে ছেলেটির অবস্থা যেদিন তিনি জেনে-ছিলেন সেদিন সে তীব্র যন্ত্রণা মনে মনে অনুভব করেছিলেন আজকের চিন্তায় তার কিছুমাত্র চিহ্ন ছিল না। এক প্রবল স্নেহ আজ আচ্ছন্ন করে আছে চিন্তা। ছেলেটি যে সুখী সেই কি সবচেয়ে বড় কথা নয়? যে চিরকাল শিশুই থাকবে, যে তাকে ছেড়ে যাবার জন্য কোনদিনই বড় হয়ে উঠবে না এমন ছেলে ক'জনের জোটে! অবশ্য বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেই এ কথা মনে হচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করায় ক্ষতি কি যখন—। দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল।

গ্রাহাম প্রায় অন্ধকার সেই ঘরের আলো জেবলে দিলেন। আজ রাতে, এ

মুহূর্তে বিরক্ত হওয়া তার পক্ষে যেন অসম্ভব। বরং চিন্তায় বাধা পড়ুক এই তিনি চাইছিলেন।

খুলে দিলেন দরজা। একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়েছিল। বলল, "আপনিই তো ডাঃ গ্রাহাম? আমার নাম নিমান্ড। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। বলবো?"

গ্রাহাম তার দিকে ভাল করে তাকালেন। লোকটি দেখতে ছোটখাটো, অদ্ভুত চেহারার। নিরীহ মানুষ—খুব সম্ভব খবরের কাগজের রিপোর্টার কিংবা লাইফ ইন্সিওরেন্সের দালাল।

গ্রাহাম বলে ফেললেন, "নিশ্চয়ই, ভেতরে আসুন মিঃ নিমান্ড।" নিজের মনে হলো কয়েক মিনিট চিন্তার ব্যাপারে অদলবদল হলে মন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

"বসুন, একটু গলা ভেজাবেন কি?"

নিমান্ড বলল, "না ধন্যবাদ।" সে বসল নিজের চেয়ারে, আর গ্রাহাম সোফায়।

লোকটি আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল লাগিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল। বলল, "ডাঃ গ্রাহাম, বিজ্ঞানীদের মধ্যে আপনাকেই দায়ী করা চলে যার বিজ্ঞানচর্চার পরিণাম পৃথিবীতে মানুষের টিঁকে থাকার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ করতে যাচ্ছে।"

গ্রাহাম ভাবলেন আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গেছে। লোকটিকে ঘরে ঢুকতে দেবার আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কেন সে এসেছে। একটু দেরীই হয়ে গেছে সে কথা বুঝতে। রূঢ়তা একেবারেই তার পছন্দ নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে রূঢ়তাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বলে মনে হলো তার।

"ডাঃ গ্রাহাম, যে অস্ত্র নিয়ে আপনি গবেষণা করছেন—"

লোকটি থামল। মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেল শোবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে এসেছে একটি পনেরো বছরের ছেলে। ছেলেটি নিমান্ডকে লক্ষ্য করেনি। সোজা চলে গেল গ্রাহামের কাছে।

"বাবা, তুমি কি এখন পড়ে শোনাবে আমাকে?" চার বছরের শিশুর মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল পনেরো বছরের কিশোরের মুখে।

গ্রাহাম ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলেন। একবার তাকালেন আগন্তুকের মুখে। ভাবলেন ছেলেটি সম্পর্কে সে কিছু জানে কি না। নিমান্ডের মুখে কোন অবাক ভাব ফুটে উঠল না দেখে নিশ্চিত হলেন যে সে সবই জানে।

"হ্যারি," স্নেহের উত্তাপ যেন ঝরে পড়ল গ্রাহামের কণ্ঠস্বর থেকে, "বাবা এখন ব্যস্ত। একটু অপেক্ষা করো। তোমার ঘরে চলে যাও। আমি এক্ষুনি এসে তোমাকে পড়ে শোনাব।"

"তুমি আমাকে ছোট মোরগ ছানাটা পড়ে শোনাবে তো?"

"তোমার যদি ভাল লাগে, তাহলে নিশ্চয় পড়ব। এখন যাও। অপেক্ষা করো। হ্যারি, ইনি মিঃ নিমান্ড।"

আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ছেলেটির মুখে ফুটে উঠল লাজুকে হাসি। নিমান্ড জিজ্ঞেস করে, "কি খবর হ্যারি!"

সেও হেসে তাকালো ছেলেটির দিকে, তার দিকে এগিয়ে দিল হাত। তা লক্ষ্য করে গ্রাহাম এখন আরো নিশ্চিত হলেন

যে নিমান্ড সব জানে। শরীরে বেড়ে উঠলেও, মনের বয়সে সে যে একেবারে শিশু তা ছেলেটির হাসি আর ভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

নিমান্ডের হাত নিজের হাতে তুলে নিল ছেলেটি। মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে বুঝি নিমান্ডের কোলে উঠে বসবে। গ্রাহাম তাকে ধীরে পেছন দিকে টানলেন। বললেন, "হ্যারি, এখন তোমার নিজের ঘরে চলে যাও।"

ছেলেটি লাফাতে লাফাতে নিজের ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ না করেই।

গ্রাহামের সঙ্গে নিমান্ডের চোখাচোখি হলো। বলল, "ছেলেটিকে আমার ভাল লাগে।" তার কণ্ঠস্বরে সৎ আন্তরিকতা বেজে উঠল। বলল, "আশা করি তাকে যা পড়ে শোনাবেন তা যেন সব সময়েই সত্যি হয়।"

গ্রাহাম তার কথা বুঝতে পারলেন। নিমান্ড বলল, "আমি মোরগ ছানার কথাই বলছি। চমৎকার গল্প—কিন্তু..."

ছেলেকে নিমান্ডের ভাল লেগেছে জেনে গ্রাহামেরও হঠাৎ নিমান্ডকে ভাল লেগেছিল। কিন্তু এখন তার মনে হলো যে এই সাক্ষাৎকার তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়াই ভাল। বিদায় করে দেবার জন্যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, "আমার তো মনে হয়, আপনি নিজের এবং আমার, দুজনেরই সময় নষ্ট করছেন। মিঃ নিমান্ড, আপনি যে সব যুক্তি দেবেন তার সব ক'টিই আমার জানা আছে। হাজার বার সে সব কথা শুনেছি। হয়তো আপনার বিশ্বাস মিথ্যা নয়। কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি এক-জন বিজ্ঞানী, আমার পরিচয় তো বিজ্ঞানী হিসেবেই। সবাই হয়তো জানে আমি একটা অস্ত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি, শেষ অস্ত্র। বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সেই এগিয়ে যাওয়ার পথে এই অস্ত্র আবিষ্কার মাত্র একটি পরোক্ষ ফল।"

"কিন্তু ডাঃ গ্রাহাম, মানুষ কি আজো যোগ্য হয়েছে সেই অস্ত্র হাতে পাবার?"

গ্রাহামের ভ্রু কুঁচকে গেল, "মিঃ নিমান্ড, আপনাকে আমার বক্তব্য বলা হয়ে গেছে।"

নিমান্ড চেয়ার ছেড়ে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। বলল, "বেশ, আপনি যদি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আর আলোচনা করতে না চান, তবে আর কিছু বলব না।"

কপালে হাত রেখে বলল, "আমি চলে যাচ্ছি ডাঃ গ্রাহাম, আচ্ছা, জল ছাড়া আর কোন বিকল্প পানীয়ের ব্যবস্থা আছে নাকি?"

গ্রাহামের বিরক্তি দূর হলো। বললেন, "নিশ্চয়ই, হুইস্কি আর জল চলবে তো?"

—"চমৎকার হবে।"

গ্রাহাম তার অনুমতি নিয়ে ভাঁড়ারে ঢুকলেন। একটা ডিকান্টারে হুইস্কি, আরেকটাতে জল, বরফের টুকরো, গ্লাস এই সব নিলেন।

যখন ফিরে এলেন চোখে পড়ল নিমান্ড সেই মুহূর্তে তার ছেলের শোবার ঘর থেকে চলে যাচ্ছে। শুনলেন নিমান্ড বলছে, "গুড নাইট, হ্যারি।"

হ্যারির কণ্ঠস্বরও শোনা গেল, "গুড নাইট, মিঃ নিমান্ড।"

গ্রাহাম পানীয় প্রস্তুত করলেন। কিন্তু নিমাণ্ড দ্বিতীয় বারে আপত্তি জানাল। পা বাড়ালো যাবার জন্য।

নিমাণ্ড বলল, "ডক্টর! আপনার ছেলের জন্য ভরসা করে সামান্য উপহার এনেছিলাম। আপনি যখন হুইস্কি আনতে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাকে উপহার দিয়ে এসেছি। আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। গুড্‌নাইট।"

গ্রাহাম দরজা বন্ধ করে দিলেন। গেলেন হ্যারির ঘরে। বললেন, "হ্যারি, এবার আমি তোমাকে পড়ে শোনাব—"

হঠাৎ তার কপালে ঘাম দেখা দিল। জোর করে মুখে এবং গলার স্বরে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যারি, দেখি কী ওটা।" তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখার সময় তার হাতদুটো থরথর করে কাঁপছিল।

ভাবলেন, অপরিণত মস্তিষ্ক একটা জরশগবের হাতে যে গুলিভরা রিভলবার দেয় তাকে পাগল ছাড়া আর কি বলা চলে!

অনুবাদ গৌরীশঙ্কর দে

[ আশ্চর্য

# জন্ম ও অজন্ম

মানুষের শরীরে কয়েকটি গ্রন্থী আছে—যাদের কাজ বন্ধ হলে বা ব্যাহত হলে কারুরই পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতনা; এই অত্যাবশ্যক গ্রন্থী থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মানুষের প্রাণ-বস্তু। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা আজকাল কৃত্রিম উপায়ে এই হরমোন তৈরী করছেন। এই হরমোন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এক নতুন ওষুধ: এর নাম Enovid. নানা রকম রাসায়নিক পরীক্ষার পর Enovid খাবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ইদানীং। প্রজনন-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করবার ব্যাপারে Enovidকে যুগান্তকারী ওষুধ বলে মনে করা হচ্ছে।

রসায়ন-পদার্থ থেকে আজ পর্যন্ত যত ওষুধ তৈরী হয়েছে, এমন কার্যকরী আর একটিও নয়। এই পিল সাময়িক-ভাবে জননক্ষমতা স্থগিত রাখতে পারে। এতদিন পর্যন্ত ডাক্তারী-শাস্ত্রসম্মত সমস্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার একটি মাত্রই উদ্দেশ্য ছিল শুক্রকীটকে স্ত্রী-ডিম্বে মিলিত হতে না দেওয়া। এছাড়াও অনেকে "নিরাপদ কাল" পন্থায় বিশ্বাসী; (প্রায় দৈবে বিশ্বাসী হবার মত।)

জন্মনিয়ন্ত্রণে সাধারণতঃ যে-সব জিনিষ ব্যবহৃত হয়, এর চল বহুদিন থেকে, এবং ক্রমশঃই এর ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে এগুলি কার্যকরী এমন কথা জোর করে না বলাই ভাল। ১৯৫৭ সালে একবার ১১৬৫ জন দম্পতীর হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছিল ৭২ থেকে ৮০টি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ সফল হয়েছিল।

ভারত, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ার মত অত্যাধিক লোকসংখ্যার দেশগুলিতে, দেখা যায় এর বিফলতার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সংসারী, অল্পশিক্ষিতা মেয়েরা "নিরাপদ কাল"-এর হিসাবটাই ঠিক মত রাখতে পারেননা, (যদি অবশ্য নিরাপদ কালে যৌন-সংসর্গ সত্যিই নিরাপদ হয়।) তারপর এই নিয়ন্ত্রণ-বস্তুগুলির ঠিক মত ব্যবহার এবং রাখাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশেষ করে সেই-সব সংসারে, যেখানে একই ঘরে এক সংগে অনেককেই শুতে হয়। আর লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের এর জন্যে পয়সা খরচ করবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই।

এই সব কারণে ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীরা এমন কোনো জিনিষের কথা ভাবছিলেন —যা নিরাপদ, সহজে ব্যবহার করা যায়

এবং সস্তা। খুব গরীব পরিবারেও যে-জিনিষ সহজলভ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এরই মধ্যে শরীর-রসায়ন পণ্ডিত, জীবাণ্বিক এবং স্ত্রী-রোগ পারদর্শীরা ভিন্ন এক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকলেন। জন্মটাকে বাধা দেবার পরিবর্তে তাঁরা বন্ধ্যাত্বের কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন, যে-কারণে প্রতি দশটির মধ্যে একটি দম্পতী পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

এই অনুসন্ধানের সূত্র ধরে বিজ্ঞানীরা জটিল জন্ম-বৃত্তান্তের অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন। আর—মজা হচ্ছে এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলেই জন্মনিয়ন্ত্রণের নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের মধ্যেই জন্ম-রহস্যের অনেক মূল তথ্য বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন: জন্ম-পদ্ধতির ধারাবাহিকতায় প্রায় এক ডজনের বেশি যে দুর্বল যোগ-সূত্র রয়েছে, এ-সম্বন্ধে তাঁদের আর কোনোই সন্দেহ নেই। এই যোগ-সূত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতই ক্ষীণ এবং অকর্মণ্য যে স্বভাবতঃই সন্তান-জন্ম সম্ভব নয়। এটা প্রকৃতিগত ত্রুটীতে। এমন দৃষ্টান্ত অনেক যেখানে বাস্তবিকই বিশেষ কোনো গ্রন্থী অকেজো হয়ে যাবার দরুণ পুরুষ বা মেয়ের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। এমন সব গ্রন্থী কৃত্রিম উপায়ে দুর্বল বা অকেজো করে সন্তান-জন্ম রহিত করা যেতে পারে।

এমেরিকার পরীক্ষামূলক জীবতত্ত্বের ডাক্তার গ্রেগরী পিঙ্কাশ এ-ব্যাপারে মৌলিক গবেষণা সুরু করেন। ইনি নূতন ধরনের হরমোন আবিষ্কার করেন, যার নাম Steroid hormones. এই হরমোন প্রয়োগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, এই ধারণায় ১৯৫১ সালে তিনি পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন। জরায়ুতে প্রাণের স্পন্দন সুরু হবার সংগে সংগেই জরায়ুর আকার বাড়তে থাকে, যে-সব রমণীর স্বভাবতঃই সন্তান নষ্ট হয়ে যায়, এই সময়ে progesterone হরমোন প্রয়োজনাতিরিক্ত নিঃসৃত হবার দরুণ জরায়ুর আভ্যন্তরীণ প্রাণ-বীজ বাড়তে পায়না। আবার এটাও জানা গেছে progesterone হরমোনের কোনো প্রতিক্রিয়ার দোষও নেই। এ-সব মেয়েদের বলা হয় "habitual aborters." ডাঃ পিঙ্কাশ করলেন কি, এই হরমোন থেকে ওষুধ বার করে ইনজেকশন দিতে লাগলেন; তাতে সন্তান নষ্ট হওয়া বন্ধ হল বটে; কিন্তু সুস্থ মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সন্তান-সম্ভাবনাটা বন্ধ করতে পারা গেলনা। এর থেকে খাবার ওষুধ তৈরী করলেন তিনি আরও উন্নত প্রণালীতে। মেয়ে খরগোসকে এই ওষুধ খাইয়ে পুরুষ খরগোসের খাঁচায় রেখে পরীক্ষা করা হল। পাঁচ মিলিগ্রামের বেশি খাওয়ানো হলে, দেখা গেছে, খরগোস বাচ্চা প্রসব করছে না।

তারপর, খরগোস থেকে ইঁদুরের উপর এই পরীক্ষা চালানো হল, কেননা ইঁদুরের জন্মপদ্ধতির ধারা মোটামুটি মানুষের মতই। পাঁচ বা তার চাইতে বেশি মিলিগ্রামের progesterone খাওয়ালেই দেখা গেছে আশাতীত ফল পাওয়া যাচ্ছে।

মেয়েদের বেলায় কি এমন ফল পাওয়া যাবে? হারভার্ডের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জন রক-এর স্মরণাপন্ন

হলেন ডাঃ পিঙ্কাস। ডাঃ রক মেয়েদের হাসপাতালে বন্ধ্যাত্ব নিবারণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বন্ধ্যা মেয়েদের উপর পিংকাশের এই পরীক্ষা চালাতে তাঁর কোনো আপত্তি রইল না। এই ওষুধে menstruation বন্ধ করা যাবে কিনা, এই হচ্ছে পরীক্ষা। ২৯টি মেয়েকে progesterone বড়ি খাওয়ানো হল। তাঁরা দেখলেন menstruation বন্ধ করা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জন্ম বন্ধ করতে হলে অন্ততঃ প্রতিদিন ৩০০ মিলিগ্রাম করে ওষুধ খাওয়ানো দরকার; এটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ; তা ছাড়াও শতকরা ৭৫ থেকে ৮০টি ক্ষেত্রে এটা কার্যকরী হবে। অতএব দেখা গেল এখন পর্যন্ত এটা যাকে বলে foolproof জন্মনিয়ন্ত্রের ওষুধ বলে মনে করা যেতে পারেনা।

আবার চলল গবেষণা। আবার খোঁজাখুঁজি চলল অন্য কোনো steroid হরমোন, যেটা অনেক কম ডোজ-এ কাজ করবে, সহজে কাজ করবে। দু'বছর ধরে শেষ রাত্রি পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়ে ল্যাবরেটরীতে অন্ততঃ ১৭৫টি হরমোন পরীক্ষা করলেন ডাঃ পিংকাশ। সব চাইতে নিরাপদ এবং শক্তিশালী হরমোন তিনি আবিষ্কার করলেন, যার নাম Enovid, progesterone-এর তিরিশ ভাগের এক ভাগ ব্যবহার করলেই সুফল পাওয়া যায়। Menstruation-এর চার দিন পর থেকে পঁচিশ দিন প্রত্যহ দশ মিলিগ্রাম করে খেতে প্রতি ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়েছে। আবার Enovid বন্ধ করে প্রত্যেকেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেছে। কিন্তু এই পরীক্ষা হয়েছে সেই হাসপাতালের বন্ধ্যা মেয়েদের উপরে। ব্যাপক ভাবে Enovid-এর প্রভাব পরীক্ষা চলছিল অনেক দিন থেকেই।

ফ্যামিলী প্ল্যানিং এ্যাসোসিয়েশন-এর ডাইরেকটর ডাক্তার এড্রিস রাইস-রে ১৯৫৬ সালে San Juan সহরের এক বস্তিতে প্রথম পাকাপাকিভাবে Enovid প্রয়োগ করে ফলাফল পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলেন। অনেক মহিলা, যাঁরা বহু সন্তানের জননী, যাঁরা আর সন্তানের প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন, তাঁরা এই মহিলা ডাক্তার এড্রিস রাইস-রে-কে ঘিরে ধরল Enovid-এর জন্য। জানুয়ারী ১৯৫৭-তে ২২১ জন মহিলাকে Enovid খেতে দেওয়া হল। নভেম্বর ১৯৫৮ পর্যন্ত মেয়েদের সংখ্যা হল ৪০৮। পরে আরও কয়েকটি জায়গায় প্রায় ১২০০ মেয়ে। উনপঞ্চাশের শেষের দিকে Enovid নিশ্চিতভাবে ফলপ্রসূ বলে ঘোষণা করলেন ডাক্তাররা। যেখানে জন্মের হার ছিল এক বছরে শতকরা সত্তর, সেখানে এই ওষুধ সেবনের পর দেখা গেল একটিমাত্র মহিলা সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল ইনি Enovid সুরু করবার আগেই সন্তানবতী হয়েছিলেন।

এমন কি যাঁরা নিয়ম করে এক মাসে পাঁচটা পিল খেতে পারেননি, তাঁদের মধ্যেও শতকরা দশটির বেশি সন্তানবতী হননি।

যখন প্রথম এই পরীক্ষা সুরু করা হয় জীবতাত্ত্বিকরা আশঙ্কা করেছিলেন দীর্ঘকাল Enovid সেবনের ফলে Menstruation চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ১৭৪ জন সহবাসের চারদিন পরে ইঁদুরকে এই

সন্তান কামনায় ওষুধ বন্ধ করে দেন, এঁরা প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে জননী হতে পেরেছেন।

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মনে করেছিলেন এমন একটি শক্তিশালী ওষুধের বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা, এমন কি ক্যানসারও দেখা দিতে পারে। এর জন্য Puerto Rican হাসপাতালে Enovid সেবন-কারিণীদের নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা করা হত; কখনই এর ব্যতিক্রম হয়নি। একজনের শরীরেও কোনো রকম রোগের সূচনা দেখা দেয়নি, ক্যানসার দূরে থাকে। যে পরিমাণ ওষুধ খেলে কাজ হয়, তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ ওষুধ খাইয়েও দেখা গেছে কোনো মন্দ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়নি।

অবশ্য হাসপাতাল থেকে কেউ কেউ মাথা ঘোরা, এবং এজাতীয় সামান্য শরীর খারাপের কথা জানিয়েছেন, বিশেষ করে প্রথম মাসে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসব উপসর্গ মনস্তাত্ত্বিক।

এই হরমোন জন্মনিয়ন্ত্রণের বিশেষ কার্যকরী সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রস্তুতকারকরা যাতে সাধারণের লভ্য হয়, তেমন দাম এঁরা কমাতে পারেনি। তেমন ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করবার সুবিধা হলে আশা করা যায় এর দাম কম করা সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রনের আরও নানা রকম সহজ উপায়ের কথা ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। Rockfeller Institute-এর কয়েকজন ডাক্তার আরও একটা ওষুধ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা তাঁদের বিশ্বাস জন্ম-নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ঠ সুফল পাওয়া যাবে। ল্যাবরেটরীতে ইঁদুরের উপর এর পরীক্ষা হয়ে গেছে। সহবাসের চারদিন পরে ইঁদুরকে এই ওষুধ খাইয়ে জন্ম বন্ধ করা গেছে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই ওষুধ কতটা কার্যকরী হবে, সে-সম্বন্ধে এখনও গবেষণা ভারত এবং ইজরাইলে পরীক্ষা চলছে জরায়ু থেকে সাময়িক ভাবে ovum-কে বিচ্ছিন্ন রাখা যায় কিনা। এতে জন্মটা বন্ধ হওয়া সম্ভব হতে পারে। কোনো কোনো জায়গায় শুক্রকীটের অবস্থানটা আটকানো যায় কিনা, তা নিয়েও পরীক্ষা চলছে। কিছু বিজ্ঞানী মাথা ঘামাচ্ছেন কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা যায় কিনা যার দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রীকে বন্ধ্যা করে দেওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে, আমাদের আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।

[ রীডার্স ডাইজেস্ট

বিবাহের অভিধানগত অর্থ হল বিশেষ ভাবে বহন করা

# বিচিত্র বিবাহ

গৌর পাল

'নিশীথ'দের বেলায় বলি 'বিয়ে করছে'। 'তন্দ্রা'দের বেলায় কিন্তু বলি 'বিয়ে হচ্ছে।' বিয়ের বা 'বিবাহে'র অভিধানগত অর্থ হল—বিশেষভাবে বহন করা। আমাদের সমাজে নিশীথরা তাই বাহন। তন্দ্রারা ভর্তৃকা। মঙ্গল কাব্যের যুগ থেকে আমরা দেবীদের নানা বাহনদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসছি। একালের দেবীরাও 'সেই ট্র্যাডিশান সমানে' বজায় রেখেছেন—দু'চারটি ক্ষেত্র ছাড়া। ইদানীং বাহনদের নাম স্বামী নামে গোবেচারা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। এই বহন-দায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য তাঁরা অবশ্য আগেই মোটা পারিশ্রমিক আদায় করে নেন। যাকে আমরা ভদ্র ভাষায় পণ বলি।

ব্যাপ্তার্থে 'বিবাহ' হল দুটি নরনারীর যুগ্ম জীবনযাপন ও সংসার প্রতিপালন সদিচ্ছার সামাজিক ও শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ই উভয়ের সমানাধিকারী। এঁদের কেউ যদি ভিন্ন নর বা নারীর প্রতি আসক্ত হন তবে সেটা হবে সমাজের চোখে ব্যাভিচার। আমাদের সমাজে পুরুষদের এক্ষেত্রে সাতখুন মাপ। আর ওদেশে বর্তমানে দুজনেরই আইনসঙ্গত দায়মুক্তি।

বিবাহের ব্যঞ্জনার্থ হল কমলাকান্তের ভাষায় আত্মোদর থেকে মুক্তি। রবীন্দ্র-নাথ বিশ্বসত্তার মধ্যে আত্মসত্তা বিলীন করার যে পথনির্দেশ করেছিলেন, 'বিবাহ' সম্ভবতঃ তারই প্রথম সোপান। অন্ততঃ যে বিবাহের মূলে আছে প্রেমের অঙ্গীকার। যদি কেবল আত্মকামনা কেন্দ্রিক মনোভাব বিবাহের পিছনে আত্ম-গোপন করে থাকে তবে তা সুখের বদলে দুঃখকেই বহন করে আনবে। যেমন দেখি দুষ্মন্ত শকুন্তলার বিরহ-জীবনে একালের বাঙালীর সংসারের-রণক্ষেত্রে।

সভ্যতা বলতে আমরা মূলতঃ সূক্ষ্মতাকে বুঝি। সভ্যতার বিকারকে নয়। আদিম যুগের জীবন যাপনের বর্বরতার ওপর সভ্যতা মানুষকে সূক্ষ্মতা আরোপ করেছে নানা দিক থেকে। যখন যৌন সঙ্গী নির্বাচনে আদিম বৃত্তির ওপর সূক্ষ্মতা আরোপ করা হলো তখন থেকেই বিবাহের সূত্রপাত। যৌন স্বেচ্ছাচার

দমনের এই প্রয়াসে অবশ্য নানা মানসিক ও দৈহিক জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক বিবাহ সভ্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের দান। এর পিছনে নারী-পুরুষের সংখ্যাগত হারবৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কিছু প্রভাব থাকতে পারে।

আর্য সমাজে সাধারণতঃ গুরুজনের সম্মতি নিয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে পত্নী গ্রহণ বা পতি বরণের রীতি প্রচলিত ছিল। মাঝে মাঝে যে গুরুজনের অজ্ঞাতসারে মন দেওয়া নেওয়া ঘটতো না, এমন কথা 'দেবযানী'র উপাখ্যান জানার পর জোর করে অস্বীকারের উপায় নেই। সে যাই হোক সংস্কৃত কাব্য-নাটকের যুগে আর্য বা অনার্য বিবাহ রীতির কোনোটিই পরস্পরের প্রভাবে বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারে নি। তাই মহাকাব্যের যুগ থেকে হিন্দু পুনরুত্থানের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে নানা ধরনের বিবাহ রীতির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

বিবাহ রীতিগুলিকে মোটামুটিভাবে আট ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক, 'দৈববিবাহ' রীতিমতো যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপার ছিল। পাত্র পুরোহিত হিসেবে গণ্য হতেন। দক্ষিণাস্বরূপ তাঁর হাতে কন্যা সম্প্রদান করা হত। বিশেষ করে বৈদিক সমাজে আর্যঋষিদের ক্ষেত্রে এই রীতির প্রচলন ছিল। দুই, 'আর্যবিবাহ' পরবর্তীকালে আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তখন কন্যাকে গ্রহণ করার ঋণ হিসেবে পাত্রপক্ষকে ঋণ শোধ করতে হত। সম্ভবতঃ নারীর সংখ্যাল্পতাই এর মূলে কার্যকরী। বহু কন্যার জনক এতে সে যুগে লাভবান হতেন, এখনকার মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে অকালে বুড়িয়ে যেতেন না।

তিন, 'প্রজাপত্য বিবাহ'রীতিও আর্য সমাজের গোড়ার দিকে চালু ছিল। এই রীতির মূলে ছিল স্বামীস্ত্রীর একত্রে ধর্ম জীবন যাপনের আদর্শ। 'যদিদং হৃদয়ম্ মম'—তোমার হৃদয় আমার হোক—আমার হৃদয় তোমার হোক—এই সংকল্পের কার্যকরী সূচনা সম্ভবতঃ এই সময় থেকেই। মহাকাব্যের যুগে দেখা যায় ধর্মসঙ্গিনী গান্ধারী অন্ধ স্বামীর জন্য নিজেও অন্ধত্বের স্বেচ্ছাকষ্ট ভোগ করছেন।

চার, অসুর বিবাহ সম্ভবতঃ অনার্য সমাজ থেকে আগত। বিশেষ করে যে সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব তখনও জবরদস্ত। ব্রাত্য আর্য সমাজেও এই রীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। দুই সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগে আর্য সমাজের একাংশ অসুর বিবাহকে গ্রহণ করেছিল। এ ক্ষেত্রেও পাত্রের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করার রেওয়াজ ছিল।

পাঁচ, 'গান্ধর্ব বিবাহ' রীতি আর্য ও অনার্য দুই সমাজেই নিহিত ছিল। এই প্রথার মধ্যে দু'টি নরনারীর স্বাধীন নির্বাচনকে এবং হৃদয়গত আকর্ষণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কালিদাসের নাটকে দুষ্মন্ত শকুন্তলার গোপন বিবাহ এবং শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্টে' মিরান্দা ফার্দিনান্ডের পারস্পরিক আকর্ষণ—এই পর্যায়ে পড়ে। গান্ধর্ব রীতির মধ্যে যেমন হৃদ্গত শুচিতা রয়েছে, তেমনি রোমান্সও বিদ্যমান। আজও এই রীতির প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক স্বপ্নিল ঝোঁক রয়ে গেছে।

ছয়, 'রাক্ষস বিবাহে' বীরভোগ্যা-বসুন্ধরা নীতির অনুবর্তন লক্ষণীয়। এই রীতি মূলতঃ অনার্য সমাজ থেকে আর্য সমাজে সঞ্চারিত। 'সুভদ্রাহরণ' কিংবা 'সংযুক্তাহরণ' খানিকটা এই পর্যায়ে পড়ে। তবে সব ক্ষেত্রেই যে পরস্পরের পূর্ব অনুরাগ থাকে, তা নয়।

সাত, 'পিশাচ বিবাহ'কে ঠিক বিবাহের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ এর মধ্যে সেই শুচিস্মিত প্রত্যয় নেই যা অল্প-বিস্তর অন্যান্য রীতির মধ্যে বিদ্যমান। এটিও সম্ভবতঃ অনগ্রসর অনার্য সমাজ থেকে আগত। কারণ এর মধ্যে রয়েছে সেই প্রচণ্ড আদিম জৈবিক লিপ্সা যা পশু-প্রবৃত্তিকেও লজ্জা দেয়। এ ধরনের অস্বাভাবিক বিবাহ পদ্ধতি কিন্তু সব দেশে সব কালেই ঘটে এবং সামাজিক সুস্থ মানুষ একে উৎপীড়ন আখ্যা দিয়ে থাকে। তুর্কী আক্রমণের পর এদেশে ধর্মান্তরিত নারীর সংখ্যা এইভাবে কিছুটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। রামায়ণে বন্দিনী সীতার প্রতি রাবণের মনোবৃত্তি কতকটা অনুরূপ। এই রীতিতে রমণীর অজ্ঞাতে তার কুমারীত্ব হরণ করে তাকে পত্নী বা উপপত্নী হিসেবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়। এই পৈশাচিক পদ্ধার আশ্রয় নিয়ে অস্বাভাবিক বৃত্তির ক্ষমতাশালী মানুষেরা চিরকাল আকাঙ্ক্ষিত নারীকে বশীভূত করার প্রয়াস পেয়েছে। এরই আধুনিক সংস্করণ 'বশীকরণ'-এর রকমফের হয়ে 'পঞ্জিকা'র বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি করছে।

আট, স্বয়ংবরা বিবাহরীতি যুগপৎ আর্য সমাজে এবং কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে অনার্য সমাজে প্রচলিত ছিল। এই রীতির মধ্যে একাধারে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের উদারতা এবং নারী স্বাধীনতার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাকাব্যের যুগে 'দময়ন্তী' এবং 'পাঞ্চালী'র উপাখ্যানে এই রীতির সুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে। রাজপুতানার কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও দেখা যায় যে পূর্ব নির্ধারিত পাত্রের সঙ্গে কয়েকজন বরবেশী ব্যক্তিও বিবাহ সভায় উপস্থিত হন। সেখানে স্বয়ংবরার অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। পাত্রীকে অবশ্য আসল ব্যক্তিটিকে চিনে নেবার জন্য দময়ন্তীর মতো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না, কিংবা পাত্রকেও অর্জুন কিংবা রামচন্দ্রের মতো পরীক্ষা দিতে হয় না। নির্ধারিত পাত্রকে বরমালা অর্পণ করতে উপস্থিত অন্যান্য বরবেশী ব্যক্তিরাও 'হতভাগ্য' কর্ণের মতো অপমানও বোধ করেন না।

প্রাক্ তুর্কী যুগে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির যে সমস্ত সাধারণ লক্ষণগুলি দেখা যেত কাল বৈগুণ্যে তার অনেকগুলি বিলুপ্ত হয়। বরং উদারতা হারিয়ে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির মূল ধারাটি ক্রমশঃ সংকীর্ণ লোকাচার কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। তবে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন পদ্ধতির স্মৃতি ভিন্ন উপকরণে আজকের হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে রয়ে গেছে। বর্তমানে যে পদ্ধতি প্রচলিত তার মধ্যে যুগপৎ আর্য ও অনার্য দুই পদ্ধতিরই ছাপ পাওয়া যায়। স্বাধীন ক্ষত্রিয় সমাজে কন্যা অপহরণের যে প্রথা অনুসৃতি জনপ্রিয় ছিল, তা আজও ক্ষত্রিয় সমাজে দৃষ্ট হয়ে থাকে। বরানুগামীরা সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। পাত্র যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে মুক্ত কৃপাণ হাতে বিবাহ

সভায় উপস্থিত হন। কন্যাপক্ষ বাধা-দানের ছদ্ম আচরণ ক'রে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করেন।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে প্রচলিত নানা রকমের বিবাহ পদ্ধতির কৌতুককর এবং কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায়। হোমারের যুগে গ্রীস দেশে নিরুদ্দিষ্ট অডিসিয়ুসের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে সপুত্র পেনিলোপেকে বিভিন্ন দেশের রাজা বিবাহ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। অনুনয় বিনয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের হুমকীকে পেনিলোপে সুকৌশলে ব্যর্থ করে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। এ ধরনের বিবাহ গ্রীস্ দেশে সমাজসম্মত ছিল।

পেরিক্লিসের যুগে রচিত নাটকে নিহত রাজার পত্নীকে বিজয়ী রাজা কর্তৃক পত্নী হিসেবে গ্রহণ করার সামাজিক অনুমোদনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের বিবাহ করার ফলে রাজা ঈদিপাসের জীবনে নিয়তি লাঞ্ছিত বিভ্রম ও ট্র্যাজেডী সূচিত হয়েছিল।

আমাদের দেশেও রামায়ণে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক বিধবা ভ্রাতৃবধূকে পত্নী-হিসেবে গ্রহণ করার সামাজিক বিধির সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। তার ফলেই সুগ্রীবের পক্ষে নিহত বালীর পত্নীকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ ক'রতে বাধে নি। এর মধ্যে আদিম সমাজ ব্যবস্থা ও নারী সংখ্যাল্পতার আভাস পাওয়া যায়। আবার এই রীতি থেকেই সম্ভবতঃ 'দেবর' বা দ্বিতীয় বর সম্পর্কের উদ্ভব।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশে মানুষের শাশ্বত সম্পর্ক ও রীতি-নীতির মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। 'বিবাহ' সম্পর্কেও এ কথা বোধ করি বলা বাহুল্য হবে না। নানা কারণে অন্যান্য জটিলতার সঙ্গে সমাজে দাম্পত্য জটিলতাও বেড়ে গিয়েছে। 'পুরাবৃত্তে ক্রিয়তে ভার্যা'র পরিবর্তে সম্ভবতঃ আমাদের যুগ নতুনতর কিছু ভাবছে। পূর্বে মেয়েরা যেখানে স্বামী বা অন্য পুরুষের নির্ভরশীল ছিলেন সেখানে নিঃসন্দেহে অবস্থান্তর ঘটেছে। এমন বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। উনিশ শতকের রেনেসাঁ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারী জাগরণ। ফলে মধ্যযুগীয় কৌলিন্য বিবাহ রীতি, বাল্যবিবাহ, সহমরণ প্রভৃতির সংস্কারের জন্য অগ্রনায়ক রামমোহন বিদ্যাসাগরের তেজস্কর প্রয়াসের কিছু কিছু ফল এখন ফলছে। যদিচ, এখনও আমাদের সমাজের বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির ঘটনা নিতান্ত অঙ্গুলীমেয়।

বাঙালী সমাজে মোটামুটি ভাবে চারটি বিবাহ পদ্ধতি এখন দেখা যায়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়, ব্রাহ্ম পদ্ধতি। এ ছাড়া কিছু ক্ষত্রিয়, কিছুটা আদিবাসী রীতি এবং গান্ধর্ববিবাহের আধুনিক সংস্করণ রেজিস্ট্রী ম্যারেজও আমাদের তালিকা বৃদ্ধি করতে পারে। সাধারণ ভাবে ব্রাহ্ম পদ্ধতির মধ্যে একটা সমন্বয়ী ধারা ও শুচিতা পরিলক্ষিত হয়। যদিও এই পদ্ধতির প্রচলন অত্যন্ত মুষ্টিমেয় জনমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রেম অথবা বিবাহ সম্বন্ধে বার্নার্ড শ'র মত হচ্ছে মিসআণ্ডারস্টেণ্ডিং বিটুইন টু ইডিয়টস্। কার্ল মার্ক্সের

মন্তব্য আরও কঠোর। তথাপি তাবৎ হতাশা সম্পৃক্ত যৌনস্বেচ্ছাচারের রূপ-তার মধ্যে বিবাহ ক্ষণিক হলেও কিছুটা যে বলিষ্ঠ জীবনাচরণের ইঙ্গিত বাহী এবং পবিত্রতা-দ্যোতক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর মূল্যও খুব কম নয়। আত্মকেন্দ্রিক মৌমাছি বৃত্তি থেকে 'বিবাহ' মানুষকে জীবনে জীবন যোগ করতে শেখায়। অর্থনৈতিক, মানসিক বা যে কোনো জটিলতা থেকে 'বিবাহ' সম্পর্কে ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের অনীহাবোধ জন্মালেও, একথা মানতে হবে যে সাধারণ মানুষের জীবন পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হলে—বিবাহ ছাড়া আর গতি নেই। বিশেষতঃ আমাদের মতো জলো আব-হাওয়ার দেশে যেখানে রুগ্ন স্বার্থপর মানুষের বাস সেখানে 'বিবাহ'ই শেষ সিদ্ধান্ত—'নান্যপন্থা বিদ্যতে।'

সুতরাং বিবাহ যখন করতেই হবে—দাসী আনবার জন্যে নিরীহ জীবের মতো সুড়সুড় করে পিঁড়িতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠতেই হবে তখন অনর্থক বিলম্ব করে লাভ কি? সংবাদ পত্রের পাত্রপাত্রী কলমে চোখ বুলিয়ে কিংবা প্রজাপতি অফিসের আশায় দিন গুনলে, পরে হয়ত পস্তাতে হবে। তখন 'দিনের পরে যায় যে দিন' বলে ককালেও দিন ফিরবে না। বিবাহিত বন্ধুরা প্রায়ঃশই বলেন 'বিয়েটা দিল্লীকা লাড্ডু'। কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়। তবে আমরা বলি কি খেয়ে পস্তানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

বাঙলাদেশে একসময় বিবাহ না দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের সচেতন করে দিতে বিরাগী হয়ে যাবার ভয় দেখানো হ'ত। কিছুকাল আগে অনেক অভিমানী রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে যেত। এখন সেটা যুগ পরিবর্তনের ফলে কবিতা লেখা কিংবা টিউটোরিয়াল হোম খুলে বসায় রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং মাভৈ! বাঙলাদেশে লাখেলাখে তরুণ কবি সাহিত্যিক ও টিউটোরিয়াল হোমাধিকারী আছেন। এ'দের দুপাঁচজনকে বাদ দিলে দেখা যাবে বাকী সকলেরই মনে গূঢ় ইচ্ছা ঐ 'অন্বিষ্ট' পাত্রী সন্ধান—যার শেষ কথা বিবাহ। বাঙলাদেশে তাই 'প্রজা-পতির নির্বন্ধাতিশয্য' আজও রয়েছে কেবল সামান্য পদ্ধতি বদল করেছে মাত্র। জীবিকা নির্বাহ এবং বিবাহ এখন পরি-পূরক।

তাছাড়া, আমাদের বীরত্বের স্বপ্ন, দুঃসাহসিক অভিমান সবই একটি বিশেষ চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের রোমান্স নারীনদীর হৃদয়দ্বীপে নোঙর করার মধ্যেই নিঃশেষিত। অজানা জগতে পদার্পণ মানেই স্বল্প পরিচিতা কিংবা সদা পরিণীতার অন্দর মহলে উঁকি ঝুঁকি দেওয়া। আর ওটাই আমাদের জীবনে যেন সব চেয়ে বড় ঝুঁকির কাজ। ওইটুকুর মধ্যেই আমরা কেউ ভাস্কোডা-গামা, কলম্বাস, স্কট, হিলারী। আমাদের সাহিত্যেও ওই রোমান্সের জয়যাত্রা। 'অন্যো কা কথা' এমন যে বিপ্লবী শরৎ-চন্দ্র, তিনি পর্যন্ত বিবাহ সংস্কারকে ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন না। যৌবনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন মধ্যযুগীয় রেনেসাঁর প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য। তিনিও দুটি বিবাহ করেছিলেন। আর তাঁর বাল্যকথায় দেখি তাঁর সম্পর্কে স্নানার্থিনীরা অভিযোগ করছেন শচীমাতার কাছে—'কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।'

শিশু বয়সে আমরা যে রূপকথা শুনতে অভ্যস্ত তার উপসংহার হচ্ছে 'ধুমধাম করে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল কাজলরেখার সঙ্গে। মেয়েরা জ্ঞান হওয়া ইস্তক শিবের মতো পতি কামনা করতে শেখে। বৃষ্টি পড়লে ছেলে-মেয়েরা ছড়া কাটে শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিনটি কন্যা দান।'

সুতরাং বাইরে যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করি না কেন, অবিবাহিত প্রায় সকলেই প্রজাপতি পকড়াবার জন্য এক পা বাড়িয়ে রেখেছি। আর মনে মনে সংকল্প পাঠ ক'রে চলেছি—বিবাহের জন্য আমরা সবাই বলি প্রদত্ত। অথবা কখনো কোরাস গাইছি, বিয়ের জন্য জন্ম যেন বিয়ের জন্য মরি। তা নাহলে অনেক দর্শন বিজ্ঞানের কথা আওড়ে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ কমলাকান্তকে সখেদে বলতে হ'ল কেন—'তোমরা কমলাকান্তের একটা বিবাহ দিতে পার?

# বীরবলের কৌতুক

বরুরুচি

একবার বীরবলকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

দিল্লী থেকে অনেক দূরে মালয়ল নামে নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। তার রাজা ছিলেন যেমন খেয়ালী তেমনি জেদী আর কাণ্ড-জ্ঞানহীন।

হঠাৎ একদিন সম্রাট আকবর সেই রাজার কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন। চিঠিতে লেখা আছে "এই লিপিতে চারটি জিনিসের এক তালিকা দিলাম। এই চারটি জিনিস একই সময়ে একই সঙ্গে আমার চাই। তিনমাসের মধ্যে জিনিসগুলি আমায় পৌঁছে দিতে হবে। তা না পারলে, আজ থেকে ঠিক নব্বুই দিন পরে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবেন আপনি। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব। তালিকাটি এই :—(১) উচ্চকুলে জন্ম অথচ নীচমন, এমন একজন মানুষ। (২) হীনবংশে জন্ম অথচ অতি উচ্চমন, এমন একজন মানুষ। (৩) একটি রাস্তার কুকুর। (৪) সিংহাসনারূঢ় গর্দভ। শুধু তাদের আমার সামনে হাজির করলেই হবে না, তাদের পরিচয় প্রমাণিত করে আমায় সন্তুষ্ট করতে হবে। ইতি, বসম্বদ ও আপনার একান্ত অনুগত —মালয়ল-রাজ।"

চিঠি পড়ে সম্রাট হাসবেন কি রাগবেন ভেবে পেলেন না। কিন্তু কিছু চিন্তিত হলেন। মালয়ল-রাজ তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করবেন, সে জন্যে নয়। মালয়ল অতি নগণ্য রাজ্য। নিতান্তই হীনবল। যুদ্ধ একদিনের বেশী চলবে না।

কিন্তু তাতে তো অনর্থক লোকক্ষয়। চিন্তা সেই কারণেই। মালয়লের রাজা শুধু নির্বোধ নয়, অত্যন্ত খামখেয়ালী স্বভাব-স্বল্পস্থ। সম্রাট যদি ঠিকমত একটা ব্যবস্থা না করেন, তাহলে হয়তো বোকা-অহঙ্কারী রাজাটা সত্যি সত্যিই সৈন্য সামন্ত নিয়ে হৈ চৈ লাগিয়ে দেবে। তাতে তার রাজ্যের এবং আশেপাশের অনেক লোক দুর্দশা-গ্রস্ত হবে। মালয়লের নিরীহ প্রজারা অনর্থক কষ্ট ভোগ করবে। সম্রাট তো এ সব কোনমতেই চান না। তাই তিনি স্থির করলেন, যা হয় একটা উপায় ঠাওরাতেই হবে—যুদ্ধ নয়।

ডাকলেন বীরবলকে। মালয়ল রাজের পত্র শোনালেন।

হাসলেন বীরবল। এমন কি শক্ত কাজ। নিশ্চয় পারবেন তিনি। বীরবলের অভয় বাক্য শুনে সম্রাটের দুর্ভাবনা দূর হল, মুখ প্রফুল্ল হল। তা হলে কী ভাবে কী করা হবে?

বীরবল বললেন, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। আপাতত তাঁকে এ বিষয়ে নানা আয়োজন করতে হবে। সে জন্যে লাখ-খানেক টাকা চাই। আর, মাস দুই বীরবল রাজধানী থেকে অনুপস্থিত থাকবেন।

আকবর আনন্দিত হলেন। তখনই কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বীরবলকে লক্ষ টাকা দিতে হুকুম করলেন। টাকা নিয়ে উধাও হলেন বীরবল।

কয়েকদিন পরে মালয়ল-রাজ্যের সীমানায় এক সাহুকরকে দেখা গেল। ভিনদেশ থেকে এসেছেন। সঙ্গে হাতী ঘোড়া আরও কত সব জিনিস আর দু'তিনজন ভৃত্য। শোনা গেল, সাহুকর একজন বড়দরের ব্যবসায়ী। খুব কম সুদে টাকা ধার দেন তিনি। তাঁর নাকি অগাধ টাকা। রাজধানীর প্রান্তে যে বড় বাড়িখানা খালি ছিল সেখানা চড়া দরে ভাড়া নিলেন তিনি। তারপর লাল নীল দামী দামী পরদা দিয়ে তাকে সাজালেন। রাতের বেলায় বাতির সার জেবলে দিলেন অলিন্দে অলিন্দে। তল্লাটের লোক তাঁর এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁর সম্বন্ধে নানারকম গুজোব রটাতে লাগলো।

সেই রাস্তায় কিছু দূরেই শহর-কতোয়ালের বাড়ি। তার কানেও সাহুকরের খবর গেল। একদিন সে নিজেই সাহুকরের সঙ্গে আলাপ করতে এল। টাকাওয়ালা বিদেশী। দেখা যাক না, কিছু সুবিধে হয় কি না।

তা সুবিধে হল বৈকি! সাহুকর তাকে ভোজ খাওয়ালেন। তারপর ভেট। কতোয়াল তো আনন্দে আত্মহারা। বন্ধুত্ব পাতালো সাহুকরের সঙ্গে। গভীর আবেগের সঙ্গে জানালো, যতদিন বাঁচবে ততদিন সে সাহুকরকে ভুলবে না; আর, সাহুকরের যদি দৈবাৎ কোন দুঃসময় আসে তা হলে কতোয়াল নিজের জীবন দিয়েও সাহুকরকে সাহায্য করবে।

বলা বাহুল্য, বীরবলই সাহুকর সেজে মালয়ল-রাজ্যে এসেছিলেন।

কতোয়াল একদিন জিজ্ঞাসা করলে—"বন্ধু, গান-বাজনায় আপনার শখ নেই?"

নেই আবার! গানবাজনা পেলে তো সাহুকর আহার নিদ্রা ভুলে যান।

তাই নাকি! বলতে হয় এতদিন! কতোয়াল জলসার আয়োজন করলেন ঘরে। নগরের সেরা বাঈজী এসে নাচ-গানের আসর বসালো।

ভারী সুশ্রী চেহারা বাঈজীর। নাম রম্ভা। বীরবল বললেন, সার্থক তাঁর নাম। তার নাচ দেখে আর গান শুনে বীরবল তাকে সোনার হার বখশিশ দিলেন। কিন্তু বখশিশ ফিরিয়ে দিলে রম্ভা। বললে, সে যদি সারাজীবন সাহুকরের কাছে থাকবার অনুমতি পায় তাহলে সে আর কিছু চায় না। এই বলে রম্ভা বীরবলের পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলে। বীরবল বললেন—"সুন্দরী, তুমি আমার সঙ্গে জীবন কাটাতে চাও। আজ আমার সুখের দিন, কিন্তু যখন দুঃখের দিন আসবে তখনো কি থাকবে আমার পাশে। না, পালাবে?"

হাসল রম্ভা। এক লহমায় যে তার বিলাসবৈভব আর হাজার টাকা রোজগার ছেড়ে আসতে পারে তাকে পরীক্ষা করে দেখুন শেঠজী। বীরবল বললেন—"বেশ তাই হোক। দেশে ফেরবার সময় তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

রম্ভা বাড়ি ফিরে গেল। সেদিন থেকে বীরবল প্রত্যহ রম্ভার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে লাগলেন।

এদিকে সাহুকর অবিবাহিত জেনে তাঁর কতোয়াল বন্ধু তাঁর জন্যে পাত্রী খুঁজতে লাগল এবং সত্যি সত্যিই তাঁর জন্যে এক পাত্রী ঠিক করে ফেলল। কুলেশীলে বংশমর্যাদায় মেয়েটি বিশেষ গ্রহণযোগ্যা তাতে সন্দেহ নেই। তার ওপর অশেষ সৌন্দর্যবতী। নাম মনোরমা। বীরবল আপত্তি করলেন না। বিবাহ হয়ে গেল।

বিয়ের পর স্ত্রীকে ঘরে এনে তার স্বামীভক্তি আর মনের গতি পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে বীরবল অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন। তার প্রতি অত্যন্ত অবহেলা দেখাতে লাগলেন এবং সময় সময় কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে লাগলেন।

তারপর একদিন তিনি এক বিষম কাণ্ড করলেন। বাজার থেকে একটা পাকা দুফালা তরমুজ কিনে তাকে একটা বড় রুমালে বেঁধে বাড়ি এসে ঘরের এক কোণে রাখলেন। তরমুজের রক্তের মত লাল রঙ রুমাল ভেদ করে বেরিয়ে পড়ছে। মনোরমাকে ডেকে বীরবল উত্তেজিত রুক্ষভাবে বললেন,—"দেখ, আমি এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছি। এখানকার এক রাজপুত্রের মাথা কেটে ফেলেছি। মাথাটা আমি সঙ্গে এনেছি! ঐ যে দেখ! মুণ্ডটাকে আমি বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে রেখে যাচ্ছি। খবরদার, একথা কাউকে বলো না, তাহলে তোমার মাথাও কেটে ফেলবো। আমি এখন চললাম। রাত্রে ফিরবো। কালই আমরা এখান থেকে পালাবো।"

এই বলে বীরবল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা মহা চীৎকার জুড়ে দিলে, পাষণ্ড সয়তান খুনে, সর্বনাশ করেছে। ডাক কতোয়ালকে। তার নির্দেশে একজন ভৃত্য গিয়ে কতোয়ালকে ডেকে নিয়ে এলো। তার কাছে কাঁদতে কাঁদতে মনোরমা জানাল যে কতোয়াল তাকে এক মহা দুর্বৃত্তের হাতে অর্পণ করেছে। মনোরমার প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে সে। শুধু তাই নয়, লোকটা এক সাংঘাতিক খুনে, এক রাজপুত্রের মাথা কেটে এনে বাক্সের মধ্যে রেখে গেছে। ঐ দেখ রক্তের দাগ।

মনোরমার কাহিনী শুনে কতোয়াল তো রেগে আগুন। মানুষ খুন! সুতরাং তার শাস্তি অবধারিত।

ছুটে বেরিয়ে গেল কতোয়াল। তার আদেশে চারজন বরকন্দাজ ছুটল সাহুকরের খোঁজে। এবং অনতিবিলম্বে তাঁকে ধরে নিয়ে এলো। তারপর সকলের সামনেই তাঁকে বেদম প্রহার করলে।

সকাতরে বীরবল কতোয়ালের উদ্দেশ্যে বললেন, "বন্ধু! শুধু শুধু আমায় এমন অপমান আর মারধোর করছ কেন! আমি কিছু করিনি।"

কতোয়াল ভেঙিয়ে উঠল, "বন্ধু!

শয়তান খুনে কোথাকার! চল, তোমায় মজা দেখাচ্ছি।"

বীরবলকে তারা রাজার কাছে নিয়ে গেল। কতোয়াল বললে, "প্রভু! এই বিদেশী লোকটা এক ভীষণ শয়তান। রাজকুমারকে হত্যা করে তার কাটামুণ্ড নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে আর পাছে তার স্ত্রী একথা ফাঁস করে দেয় সেজন্য তাকে বিষম প্রহার করেছে।"

রাজা তো কতোয়ালের কথা শুনেই এক নিমেষে ক্ষেপে গেলেন। বললেন, "লোকটাকে, এই দণ্ডে শূলে দাও। নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে। এখনি।"

একদল প্রহরী অতঃপর বীরবলকে মশানে নিয়ে চলল। কতোয়াল তাদের পুরোভাগে। বীরবলের ভৃত্য পথে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ডেকে তিনি বললেন —"শিগগির বাড়ি যাও। মনোরমাকে এই দুঃসংবাদের কথা বলো। বলো যে আমি মরতে চলেছি। সে কি উত্তর দেয় দেখে এসো।"

ভৃত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে মনোরমার কাছে গিয়ে বীরবলে কথা জানালো। শুনে মনোরমা একটুও দুঃখিত বা বিচলিত হল না। বললে, "ঠিক হয়েছে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। মরুক গে।"

ভৃত্য ফিরে এসে মনোরমার জবাব বীরবলকে জানালো। বীরবল তাকে বললেন—"এইবার ছুটে চলে যাও রম্ভার বাড়ি। তাকে এই সংবাদ দাও।"

ভৃত্য আদেশ পালন করতে দৌড়ল। বীরবল তখন অনুনয় করে কতোয়ালকে বললেন যে তাঁকে যেন রম্ভার বাড়ির সামনে দিয়ে মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। রম্ভাকে তিনি একবার শেষ দেখা দেখতে চান।

কতোয়াল বললে, "আচ্ছা, তা হতে পারে।"

হাতে হাতকড়া কোমড়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় বীরবল রম্ভার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। রম্ভা অলিন্দে দাঁড়িয়ে অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল। ছুটে নীচে নেমে এল। বীরবলের অবস্থা দেখে কেঁদেকেটে আকুল হল। তারপর কতোয়ালের মুখে ঘটনা শুনে তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে রম্ভা তার কণ্ঠের বহুমূল্য রত্নহার খুলে কতোয়ালের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, "এই হারের দাম পাঁচ হাজার টাকার কম নয়। আপনাকে দিলাম। আপনাকে আরও পাঁচ হাজার দেব। দয়া করে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন। আমি রাজার কাছে ওঁর প্রাণ ভিক্ষা করতে যাব। যতক্ষণ না ফিরি ওঁকে মশানে নিয়ে যাবেন না।"

মোটা ঘুষ হাতে পেয়ে এবং আরও পাবার আশায় কতোয়ালের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাত কচলে বললে, "তোমার হুকুম কি ফেলতে পারি রম্ভা! তুমি চট্‌পট্‌ ফিরে এসো।"

মনোমোহিনী বেশে রম্ভা পৌঁছলো রাজার কাছে। বিলোল কটাক্ষে রাজার দিকে তাকিয়ে রম্ভা তার দেহলতা এলিয়ে রাজাকে প্রণাম করলে। বিচিত্র ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে বসে বললে, "মহামান্য রাজাধিরাজ! দাসীর প্রার্থনা আছে।"

মালয়ল-রাজ তখন প্রায় বেসামাল। বললেন, "কি চাই বল। তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না।"

রম্ভা বললে, "মহারাজ, এদেশে এক সাহুকর এসে বাস করছিল কিছুদিন। কতোয়ালের অভিযোগে আপনি তাকে শূলে চড়াবার হুকুম দিয়েছেন। লোকটা যদিও অপরাধী, তাহলেও সে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তার মৃত্যু ঘটলে দারুণ ব্যথা পাব। তাই প্রার্থনা, এযাত্রা তাকে নিষ্কৃতি দিয়ে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দিন। আমি আপনার চির-কালের কেনা-বাঁদী হোয়ে থাকবো মহারাজ, যখন যা হুকুম করবেন হাসি-মুখে তা পালন করব।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন মালয়লরাজ। রম্ভার লীলায়িত যৌব-নোৎফুল্ল তনুলতা তাঁর পায়ের কাছে। তাকিয়ে বললেন, "তোমার কথা মিথ্যে হবে না তো। যখন যা হুকুম করব...।"

মাথা হেলিয়ে রম্ভা বললে—"তাই পালন করব! আমার কথা কখনো মিথ্যে হবে না, মহারাজ!"

তখন নির্বোধ রাজা একজন অমাত্যকে যথাযথ আদেশ দিয়ে পাঠা-লেন। রম্ভাও সঙ্গে গেল। অনতি-বিলম্বে বীরবল মুক্তি পেলেন। রম্ভা বীরবলের দু হাত ধরে বললে—"এখন চলুন আমার ঘরে। বিশ্রাম করবেন। অনেক কষ্ট হয়েছে আপনার।"

রম্ভার বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, তার সঙ্গে নানা সলাপরামর্শ করে বীরবল সেই দিনই মালয়ল ছেড়ে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন।

যথাসময়ে রাজধানীতে পৌঁছে সম্রাট সকাশে হাজির হয়ে বীরবল জানালেন, মালয়ল-রাজ যে চারটে জিনিস চেয়েছেন তা সংগ্রহ করেছেন তিনি।

সংবাদ শুনে সম্রাট আকবর মহাখুশি। বললেন, "কোথায় সেই চার দুর্লভ বস্তু। দেখি।"

বীরবল বললেন, "তারা মালয়লরাজের রাজধানীতে আছে সম্রাট। আপনি আমায় এক পরিচয়পত্র দিয়ে দিন আর তাতে জানিয়ে দিন যে আমি তাঁর প্রার্থিত জিনিসগুলি তাঁকে অর্পণ করবার জন্যে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁর কাছে যাচ্ছি।"

পত্র লিখে দিলেন আকবর। সেই পত্র এবং সঙ্গে বহু লোকলস্কর নিয়ে মহা আড়ম্বরে বীরবল মালয়ল-রাজ্যে পৌঁছে লোক মারফত রাজার কাছে খবর পাঠা-লেন যে সম্রাট আকবরের লেখা তাঁর পত্র অনুযায়ী সম্রাটের প্রতিনিধি প্রার্থিত জিনিস চারটে মহামান্য মালয়ল-অধি-পতিকে অর্পণ করতে এসেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজসভায় তাঁর ডাক পড়ল। পরিচয়লিপি পড়ে মালয়ল-রাজ বললেন, "আপনারই নাম বীরবল, আমি আপনার নাম শুনেছি। এখন, কই, কোথায় আমার প্রার্থিত জিনিস?"

রাজার কথার উত্তরে মাথা নুইয়ে বীরবল বললে, "এখনি হাজির করছি মহারাজ।" এই বলে তিনি তাঁর সেই পুরাতন ভৃত্যটিকে ডেকে তাকে রম্ভা ও মনোরমার কাছে পাঠালেন, বলে দিলেন, তারা যেন এখনি রাজসভায় হাজির হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রম্ভা আর মনোরমা রাজসভায় উপস্থিত হল। চারিদিকে কৌতূহল ও বিস্ময়। এ তো সেই সাহুকর যে শূলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল।

চারিদিকে বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে

বীরবল বলতে আরম্ভ করলেন, "মহানুভব মালয়ল-রাজ! আমি মাত্র কয়েকদিন আগে এক সাহুকর রূপে আপনার রাজ্যে এসে কিছুদিন ছিলাম। সেই সময় শহর-কতোয়ালের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। এবং তারই পরামর্শে আমি মনোরমা নামে এই মেয়েটিকে বিবাহ করি। মনোরমা আমার প্রতি কতখানি অনুরাগী, তার স্বামিভক্তি কতখানি গভীর তা যাচাই করে দেখবার জন্যে আমি একদিন একটা পাকা তরমুজ রুমালে বেঁধে বাড়ি এনে মনোরমাকে দেখিয়ে বলি যে আমি রাজার ছেলের মাথা কেটে এনেছি, কাটা মাথাটাকে আমি বাক্সর মধ্যে রাখছি, এবং একথা যেন মনোরমা ঘুণাক্ষরে কারুর কাছে প্রকাশ না করে। এই বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা কতোয়ালকে ডেকে পাঠিয়ে আমায় ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। তারপর আমার শূলের হুকুম হয়েছে শুনে সে আনন্দ প্রকাশ করে বলে যে বেশ হয়েছে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। এই হল মনোরমার চরিত্র। এই তার স্বামীর প্রতি অনুরাগ! সুতরাং উচ্চ কুলে জন্ম হলেও সে নীচমনা। ঠিক নয় মহারাজ?"

মাথা নেড়ে মালয়ল-রাজ বললেন, "বহুৎ বহুৎ ঠিক। আমি সন্তুষ্ট। তারপর, দ্বিতীয় মানুষ কোথায়?"

বীরবল রম্ভাকে দেখিয়ে বললেন—"এই যে মহারাজ, আপনার সামনে, এই মেয়েটি। যদিও এ একজন পেশাদার গায়িকা ও নর্তকী, হয়ত হীনবংশে এর জন্ম, তাহলেও এর মন উদার, অন্তঃকরণ মহৎ, ভালবাসার মর্যাদা রাখতে জানে। রম্ভা কেমন করে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে মহারাজ, তা আপনার অজানা নেই। সুতরাং নীচ কুলে জন্ম হলেও রম্ভা উচ্চমনা।"

রাজা বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে একমত। তৃতীয় জিনিস?"

বীরবল আঙুল দেখিয়ে বললেন—"ওই যে বসে আছে শহর কতোয়াল। এই আপনার তৃতীয় প্রার্থিত বস্তু।"

বীরবলের কথা শুনে কতোয়াল লাফ দিয়ে উঠল—"কি! আমি রাস্তার কুকুর। এত বড় আস্পর্ধা।"

রাজা বললেন, "এ আপনি কি বলছেন, বীরবল শেঠ?"

বীরবল বললেন, "আমার কথা শুনুন মহারাজ! রাস্তার কুকুরের স্বভাবটা কিরকম? যখন যার কাছে খেতে পায় তখন তার খুব অনুগত, খেতে না দিলেই অন্যত্র চলে যাবে। এই কতোয়াল আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল, বলেছিল, দুঃসময়ে সে আমায় প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু আমি বেকায়াদায় পড়তেই সে আমাকে পরিত্যাগ করলে, শুধু তাই নয়, তদন্ত করে দেখলে না যে সত্যিই আমি কাউকে খুন করেছি কিনা। অপরের কথা শুনেই আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করলে। বন্ধুর কি এই কাজ! তারপর রম্ভার কাছে ঘুষ পেয়ে সে তার কর্তব্যে অবহেলা করলে, আমায় মশানে নিয়ে গেল না। এখন মহারাজ, এই লোকটার চরিত্র রাস্তার কুকুরের সামিল কিনা।"

একটু ভেবে মালয়ল-রাজ বললেন—"আপনার যুক্তি অকাট্য; এখন বলুন আমার চতুর্থ বস্তুটি কোথায়?"

বীরবল বললেন, "ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব, নরনাথ?"

"নির্ভয়ে বলুন! এ বুদ্ধির পরীক্ষা! আপনার কোন ভয় নেই।"

হাত জোড় করে বীরবল বললেন, "এই বিশেষণটি আমি আপনার ওপরেই আরোপ করছি মহারাজ! কতোয়ালের কথা শোনা মাত্রই আপনি আমার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন। কতোয়ালের কথা কতখানি সত্যি তা পরীক্ষা করে দেখলেন না। একজন মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবার আগে অনেক সাবধানতা অনেক বিচারের প্রয়োজন হয়। রাজা হচ্ছেন লোকপালক, তিনি হবেন সকলের প্রতি সমদর্শী ন্যায় বিচারক এবং স্থিতবুদ্ধি। নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মতোই কাজ করলেন। তাই আমি আপনাকেই আপনার প্রার্থিত চতুর্থ বস্তুরূপে গণ্য করেছি। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।"

সভাস্থলে সূচিভেদ্য স্তব্ধতা। লোকটা বলে কি...

একটু থেমে বীরবল বললেন—"এখন, আমি যখন আপনার প্রার্থিত চারটে জিনিসই আপনার কাছে হাজির করে দিয়েছি এখন দয়া করে তাদের প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি লিপি দিন। সেই লিপি আমি সম্রাট আকবরের কাছে পেশ করব।"

সিংহাসন থেকে নেমে এসে মালয়ল-রাজ বীরবলকে আলিঙ্গন করে বললেন, "বুদ্ধির যুদ্ধে আমার শোচনীয় পরাজয় ঘটলেও আপনার সঙ্গে পরিচয় করে আমি ধন্য হলাম। আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন। দয়া করে কয়েকদিনের জন্য আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

কয়েকদিন মালয়ল-রাজ্যে থেকে বীরবল তাঁর দুই স্ত্রী নিয়ে দিল্লী ফিরলেন। সম্রাট আকবর বীরবলের এই কৃতিত্বে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করে তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

[ গল্প ভারতী

# কার্মেলিতা

থিয়ফিল গতিয়ের প্রণীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

১৮৪০, জুন মাসের কোন সোমবারে, একটি সুশ্রী যুবাপুরুষ কিন্তু দেখিলে মনে হয় মেজাজটা বড়ই খারাপ—বীরভূমি মাদ্রিদ্ নগরে সান্ বের্ণার্ডো রাস্তার ধারে অবস্থিত একটা গৃহের অভিমুখে চলিতেছিল।

এই গৃহের একটি জানলার ভিতর দিয়া পিয়ানোর সঙ্গীত-স্বরলহরী বাহির হইতেছিল। যে অসন্তোষের ভাব যুবকের মুখে প্রকাশ পাইতেছিল, এই সঙ্গীত শ্রবণে তাহা যেন আরও বর্ধিত হইল। মনের সমস্ত বিতৃষ্ণাকে অতিক্রম করিয়া, যুবক দ্বারের অর্গল খুলিল—অর্গলের শব্দ হইবামাত্র, একজন তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

কিন্তু এ-সব কিছুই নহে। সে প্রতিদিন একবার করিয়া ডনা-ফেলিসিয়ানার দরবারে হাজিরি সই করিত।

যুবতী ডনা-ফেলিসিয়ানা উচ্চবংশের রমণী; দেখিতে বেশ সুশ্রী, যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি আছে; ইহার সহিত ডন্-আন্দ্রের শীঘ্রই বিবাহ হইবার কথা।

মেজাজ হাজার খরাপ হইলেও কৃত্রিম হাবভাব প্রকাশ করিতে কোনো বাধা হয় না। আন্দ্রে সিঁড়িতে উঠিবার সময়েই মুখের চুরোটটা ফেলিয়া দিয়াছিল। এবং মুখের বিরক্তি ভাবটা অপসারিত করিয়া ওষ্ঠাধরে মৃদু মধুর একটি হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াই তার ভাবনা হইল—যদি ফেলিসিয়ানার মাথায় আসে,—যে যুগল-বন্ধ গানটা সেদিন শেষ হয় নাই, সেই গানটা আবার আমার সহিত একসঙ্গে ২০ বার করিয়া গান করিবে। তাহা হইলে ষাঁড়ের লড়াইয়ের আরম্ভটা আমার দেখাই হইবে না।

ফেলিসিয়ানা একটা টুলের উপর

বসিয়া ঈষৎ সম্মুখে হেলিয়া, স্বরলিপি পত্রের যে অংশটা অতি দুরূহ ও জটিল, সেই অংশটা দেখিতেছিল আর পিয়ানোয় তাহা বাজাইতে চেষ্টা করিতেছিল।

ফেলিসিয়ানা তার কাজে এরূপ ব্যাপৃত যে, আন্দ্রে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

ফেলিসিয়ানা পিয়ানোর সহিত যুঝা-যুঝি বাজনায় বাধা দেওয়া উচিত কিনা--এই কথা আন্দ্রে যতক্ষণ মনে মনে ভাবিতেছে—ততক্ষণ এই ঘটনার স্থানটা একনজরে যদি আমরা দেখিয়া লই, তাহা হইলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একরকম অনুজ্জ্বল ফিকে রঙে দেয়াল রঞ্জিত। জানলা ও দরজার চারি-ধারে কৃত্রিম ঢালাই কাজ, ধূসর রঙের অলীক ফ্রেম। কালো ঘোড়ার বালাপ্তির গদি-বিশিষ্ট সোফা-কৌচ, কতকগুলি কেদারা, একটা আলমারি, একটা খোদাই কাজকরা মেহগনি কাঠের টেবিল, একটা দেয়াল-ঘড়ি, দুইপাশে দুইটা বেলোয়ারি ঝাড়—ইত্যাদি সুরুচিব্যঞ্জক আসবাবে ঘরটি সজ্জিত।

শার্শি—জানলা—ফুল-কাটা সুইস্-মস্‌লিনের পর্দায় বিভূষিত। তা-ছাড়া, কাচের কতকগুলি কুকুর, চিনামাটির কতকগুলি মূর্তিপুঞ্জ (গ্রুপ); মিনার কাজকরা ফুলে বিভূষিত, রূপালী তারের কাজকরা ঝুরি; অ্যালাবাস্টার পাথরের কাগজ চাপা; স্পা-নগরের প্রসিদ্ধ রং-করা বাক্সো—এই সব উজ্জ্বল বিলাস-দ্রব্যে ঘরের দাঁড়ানো-শেলফ্-তাক্ ভারাক্রান্ত।

ফেলিসিয়ানা প্যারিসে শিক্ষিতা, সুতরাং প্যারিসের সমস্ত প্রচলিত ঢং তিনি পুরোমাত্রায় অবগত ছিলেন।

ফেলিসিয়ানার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার পিতা পুরাতন আসবাব সকল বাজে জিনিষের গুদাম-ঘরে চালান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী ফেলিসিয়ানা দুই বৎসর পূর্বেকার সৌখীন ঢং-এর পরিচ্ছদে বিভূষিতা; বলাবাহুল্য, তাঁর সাজসজ্জায় স্পেনদেশীয় কিছুই ছিল না। তাঁহার পরিচ্ছদের রং খুব ফিকে ও অস্পষ্ট;—ফুলকাটা কিন্তু ফুলগুলি প্রায় অদৃশ্য। এই কাপড় আসলে ইংলণ্ড হইতে আমদানি হইয়া থাকে। তাঁহার বুক-কটা আঁটাসাঁটা অঙ্গ রাখার খোলা অংশ হইতে অর্ধব্যক্ত ভীরু সৌন্দর্যরাশি একটা জরির পাড়-বিশিষ্ট একপ্রকার উত্তরীয়-বাসে সলজ্জভাবে আবৃত। পায়ের গঠনানুরূপ পায়ে সরু বুট-জুতা; পা যেরূপ ক্ষুদ্র ও সুবক্র, তাহাতে তাঁহার বংশ সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

তাঁর নীল চোখ, কটা চুল, সমস্ত মুখের রং গোলাপী;—নভেল প্রভৃতি পাঠ করিয়া স্পেন-রমণী সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহার সহিত উক্ত লক্ষণগুলির মিল হয় না।

তিনি কখনই ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে যাইতেন না; মনে করিতেন, উহা একটা বর্বরোচিত তামাসা; পক্ষান্তরে, তিনি ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত প্রহসনাদি এবং ইটালীয় সঙ্গীতাদি শুনিতে থিয়েটারে যাইতেন। সায়াহ্নে তিনি সাক্ষাৎ প্যারিস্ হইতে আনীত টুপী পরিয়া, সাধারণের হাওয়া খাইবার জায়গায় গাড়ি করিয়া বেড়াইতে যাইতেন।

তরুণী ফেলিসিয়ানা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রথানুগামী কায়দা-দুরস্ত ছিলেন।

আন্দ্রে মনে মনে ভাবিতেন, যদিও স্পষ্ট করিয়া মুখে ব্যক্ত করিতে পারিতেন না:—"সম্পূর্ণরূপে কায়দা-দুরস্ত বটে, কিন্তু বড়ই বিরক্তিজনক।"

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কেন আন্দ্রে, যাহাকে তেমন ভাল লাগে নাই, তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। ইহা কি ধনের লোভে। না; এই অল্পবয়স্ক দুই ব্যক্তির পিতামাতারাই এই বিবাহটা স্থির করিয়াছেন পাত্র ও পাত্রী তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই এইমাত্র, এই ক্ষেত্রে, ধন-সম্পত্তি, বংশ, বয়স, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আশৈশব বন্ধুত্ব—সমস্তই একত্র মিলিত হইয়াছিল।

ফেলিসিয়ানা, জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দেই তাহার ভাবী পতির উপস্থিতি অবগত হইয়াছিলেন; তিনি না ফিরিয়াই বলিলেন—"ও! তুমি আন্দ্রে! আন্দ্রে, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ; যে যুগল-বন্ধ গানটা মার্কিসের ওখানে আজ আমাদের গাইতে হবে, সেইটে আর একবার অভ্যাস করব মনে করছিলুম।"

আন্দ্রে উত্তর করিল—"আমার মনে হয়, আমার যেন একটু সর্দি হয়েছে।"

ডনা ফেলিসিয়ানা তাহার ওজর আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া, অতি নিষ্ঠুরভাবে বলিলেন—"ও কিছুই নয়; ঐ গানটা আর একবার আমাদের একসঙ্গে গাইতে হবে।"

বেচারা আন্দ্রে ঘড়ির দিকে একবার বিষণ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। হতাশ-ভাবে, হস্তিদন্তের পর্দার উপর হাত ফেলিল। বেশী আড়ম্বর করিয়া যুগল-বন্ধটা শেষ করিয়াই আন্দ্রে আবার ঘড়ির দিকে তাকাইল। ফেলিসিয়ানা আড়চোখে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। ফেলিসিয়ানা বলিল—"আজ দেখছি তোমার মনের টান ঘড়ির দিকেই বেশী—ঘড়ি ছেড়ে তোমার দৃষ্টি আর কোথাও যায় না।"

"ও দৃষ্টিতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না—সহজভাবেই ঘড়ির উপর আমার চোখ পড়েছিল।"

এই কথা বলিয়া, সসম্ভ্রমে ফেলিসি-

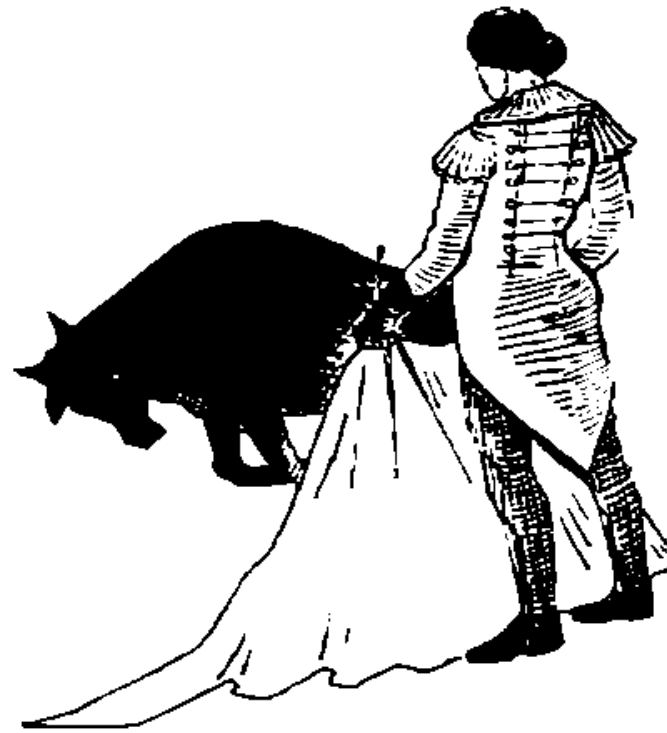

য়ানার হস্তের উপর আলগোছে একটি চুম্বন স্থাপন করিবার জন্য আন্দ্রে ফেলিসিয়ানার হস্তের উপর রসিক-জনের ধরণে মস্তক অবনত করিল।

"সোমবার ষাঁড়ের লড়ায়ের দিন; আর দেখ আন্দ্রে, এটা তুমি অস্বীকার কর্তে চেষ্টা কোরো না যে, আমার পিয়ানোর সম্মুখে বসে থাকার চেয়ে এই এই সময়ে ঐ লড়ায়ের জায়গায় উপস্থিত থাকতে তোমার বেশী ভাল লাগবে। তবে কি, তোমার এই ভীষণ আসক্তিটা কখনই ঘুচবে না? যখন আমাদের বিবাহ হয়ে যাবে তখন আমি সভ্যরকমের নিরীহ-ধরনের আমোদ-প্রমোদে তোমাকে আবার ফিরিয়ে আন্তে পারব।"

"সেখানে উপস্থিত হবার স্পষ্ট কোন মৎলব আমার ছিল না···গাভিরা প্রদেশের থেকে বড় বড় ষাঁড় এসেছে...বেশ ভয়ানো রকমের তাদের গল-কম্বল, পা শুকনো ও সরু, চন্দ্রকলার মত শিং, আর এমন হিংস্র, এমন বুনো যে, একজন বৃষ চালককে গুঁতিয়ে ঘায়েল করেছিল! ...আন্দ্রে খুব উৎসাহের সহিত এই কথা-গুলি বলিল।

"তোমার উপরেই চিকন্‌চাকন, আসলে তুমি একজন আস্তো বর্বর। তোমার ঐ বুনো জন্তুদের বর্ণনা শুনে আমার গা শিউরে শিউরে উঠছে—আর তুমি ঐ ভীষণ কাণ্ডগুলো কেমন আনন্দের সঙ্গে বলচ—যেন অতি সুন্দর জিনিস।"

বেচারা আন্দ্রে মাথা হেঁট করিল; কারণ সে ইতিপূর্বে এই মল্লক্রীড়ার বিরুদ্ধে কতকগুলি ভীরু ও বীর্যহীন বাক্তির অসার বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিল; অর্ধ বিদ্রূপাত্মক একটু মুচকি হাসি হাসিয়া ফেলিসিয়ানা বলিল "দেখ আন্দ্রে, গাভিরার বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে পারি—এ অভিমান আমার নাই; কিন্তু তোমার এই আমোদে আমি তোমাকে বঞ্চিত করতে চাইনে; তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম, কিন্তু শুধু এই সর্তে যে, তুমি সেই মার্কিসের সঙ্গীত উৎসবে সকাল-সকাল এসে যোগ দেবে।"

কোন বিদেশী লোক দেখিলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হইত যে, পথিকেরা সবাই এক দিকেই যাইতেছে; যাইতেছে সবাই, আসিতেছে না কেহই। সহরের লোক-চলাচলের এই অদ্ভুত দৃশ্য প্রতি সোমবারে ৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত লক্ষিত হয়। আন্দ্রে চলিতে চলিতে আর একটা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। রাস্তার দুই ধারে ধবধবে সাদা বাড়ির সার। রাস্তাটা শেষ হইয়াছে দ্বারের মত একটা ফুকরে আসিয়া; সেই ফুকরের ফাঁকের শেষসীমা পর্যন্ত বিচিত্র বর্ণের জনতা যেন পিপীলিকার সারি-ক্রমে স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া চলিয়াছে। চারিদিকে ধুলা উড়াইয়া, পাদচারী, অশ্বারোহী, গাড়ি, আড়া-আড়িভাবে চলিয়াছে, ঠেলা-ঠেলি ও জড়াজড়ি করিয়া চলিয়াছে।

আন্দ্রে খুব স্ফূর্তির সহিত দ্রুত পদে চলিয়াছে। এইরূপ দ্রুত চলা, স্পেনবাসীদিগের একটা বিশেষত্ব। তাঁর পকেটে কিছু টাকা-পয়সা ও ছায়া-স্থানে বসিবার একটা টিকিট্ আছে, তাঁর স্থানটা বেড়ার খুব নিকটে। এই স্থানটা দড়ি দিয়া ঘেরা—পাছে ষাঁড়গুলা দর্শকদের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে।

বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও আন্দ্রে, লেস-দেওয়া মখমল কিংবা রেশমী কাপড়ের অবগুণ্ঠনে স্বল্পাধিক মুখ-ঢাকা সুন্দরীদিগের মুখচন্দ্র দর্শনসুখে আপনাকে কখনই বঞ্চিত করিত না। কোন সুন্দরী রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, অমনি সে দ্রুত পা বাড়াইয়া তাহাকে এক-নজরে দেখিয়া লইত, এবং তখনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, অবসর-মত সেই সুন্দরীর অর্ধাবৃত মুখশ্রী মনে মনে ধ্যান করিত।

আজ, এই সুন্দরী সন্দর্শন কাজে সচরাচর অপেক্ষা আন্দ্রের যেন একটু বেশী যত্ন লক্ষিত হইল।

বিগত সোমবার আন্দ্রে মল্লরঙ্গভূমির এক বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট একটি বালিকাকে দেখিয়াছিল, তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য এবং তাহার মুখের ভাবটি অতি অপূর্ব। যদিও আন্দ্রে স্বল্পক্ষণ-মাত্র তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, তথাপি তাহার মুখশ্রী আন্দ্রের মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তরুণী "মানোলা" নামক নিম্নশ্রেণীর বলিয়াই মনে হয়। তা-ছাড়া তরুণী আন্দ্রেকে দেখিয়াছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবারও কোন হেতু আন্দ্রের ছিল না। তরুণীর দৃষ্টি রঙ্গভূমিতেই নিবদ্ধ ছিল।

এই ঘটনাটা শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবার কথা, কিন্তু ইহা আন্দ্রের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে ভুলিতে পারে নাই।

আন্দ্রে রঙ্গভূমির তোরণদ্বারের খিলান-পথ দিয়া যখন চলিতেছিল, তখন দেখিতে পাইল, জনতা ভেদ করিয়া একটা গাড়ী যাইতেছে—আর চারিদিক হইতে লোকেরা তাহার উপর সমস্বরে অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে।

এই গাড়ির সাজ-সজ্জায় উল্লাসের বাড়াবাড়ি লক্ষিত হয়; দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, অশ্বতর যেন একটা চলন্ত ফুলের তোড়ায় যোজিত হইয়াছে।

ভীষণ দর্শন এক কোচ্‌ম্যান—লম্বা হাতা কামিজ-পরা, কাঁধে জরির কাজকরা চামড়ার পটি-লাগানো, চালকের আসনে বসিয়া, অশ্বতরের অস্থিময় পৃষ্ঠ ভাগের উপর এমন সজোরে চাবুক মারিতেছে যে, তাহারা আঘাতে অধীর হইয়া অশ্বতর আবার নবোদ্যমে চার পা তুলিয়া ছুটিয়াছে।

এই ষাঁড়ের রঙ্গাঙ্গনে খালি গাড়ি প্রায় আসিতে দেখা যায় না। এই গাড়ির ভিতর দুইটি লোক ছিল।

প্রথম একটি বৃদ্ধা, বেঁটে ও স্থূলাকার, সেকেলে ধরনে কালো পোষাক-পরা; তার এক-আঙ্গুল খাটো গাউনের নীচে হইতে হলদে রঙের ঘাগ্‌রার ধার দেখা যাইতেছে;—বৃদ্ধার মুখ চওড়া, চ্যাপ্‌টা, সীসবর্ণ; নিতান্ত সাধারণ ধরনের মুখ বলিয়া মনে হইত—যদি চোখের চারিধারে ভুষা রঙের রেখামণ্ডল-বিশিষ্ট জ্বলন্ত-অঙ্গারের মত দুইটা চোখ এবং ওষ্ঠাধরের উপর অঙ্কিত সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা মুখে একটা হিংস্র ভীষণ ভাব আনিয়া অনন্যসাধারণ করিয়া না তুলিত।

ইহা সম্ভব নহে যে, এই অপরূপ সঙ্গিণীটির বদনচন্দ্র দর্শনে আন্দ্রের মুখে একটা সন্তোষের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি ১৬ বৎসর কিংবা ১৮ বৎসরের তরুণী ১৬ বৎসর -এর হওয়াই বেশী সম্ভব। একটা হাল্‌কা ধরনের রেশমী "মাণ্টিলা"—ওড়না একটা উচ্চ ঝিনুকের চিরুণীর উপরে বিন্যস্ত। তরুণীর বিপুল কেশ-জালে রচিত চাঙ্গারী আকারে খোঁপা; চিরুণী, খোঁপার চারিধারে ঘিরিয়া আছে। ওড়নার বেষ্টনের মধ্য হইতে তরুণীর ঈষৎ পীতাভ সুন্দর নেত্রবিমোহন মুখ-খানি দেখা যাইতেছে। গাড়ির মধ্যে সম্মুখ দিকে পা ছড়ানো-ছোট্ট পা-দুখানি; পায়ে ফিতা-ওয়ালা সাটিনের জুতো; পাতলা সুকুমার হাত-দুটি যদিও একটু রোদে পোড়া। ইহাই তরুণীর সমগ্র পরিচ্ছদ—এই পরিচ্ছদ একেবারে নিছক স্পেনদেশীয়।

যে মুখখানি আটদিন ধরিয়া আন্দ্রের নয়নে অহর্নিশি জাগিতেছে সেই মধুর মুখখানি আন্দ্রে দেখিয়াই চিনিতে পারিল।

রঙ্গভূমির প্রবেশ-দ্বারে গাড়ী উপনীত হইবামাত্র, আন্দ্রে খুব দ্রুত চলিয়া একই সময়ে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। এই দুই রমণী আসন গ্রহণের জন্য কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আন্দ্রে উহাদের পিছনে পিছনে চলিল।

সুরসিকা ভাগ্যলক্ষ্মী, আন্দ্রের আসন দৈবক্রমে সেই তরুণীর আসনের পাশেই পড়িয়া গেল।

চুনকাম-করা একটা মস্ত দালান—বিষাদময় ও নগ্ন। কেবল দেয়ালে ঝোলানো মেরী দেবীর ধূমায়িত চিত্র রহিয়াছে—মাতৃদেবীর সম্মুখে ছোট ছোট মোমবাতির পীতাভ বিকম্পিত শিখা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। সকলেরই মনে মৃত্যুর আশঙ্কা; মল্লগণ দেবীর একান্ত ভক্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; প্রত্যেকেরই এক-একটা রক্ষাকবচ আছে; প্রায় বারো-জন মল্ল রণস্থলে প্রবেশ করিল। উহাদের মধ্যে কেবল একজন পরমারাধ্যা দেবী চিত্রের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কোন প্রকার ভক্তির চিহ্ন প্রদর্শন না করিয়া, একান্তে পৃথকভাবে বসিয়া আছে। দেখিলে মনে হয় যেন কি এক সর্বগ্রাসী চিন্তায় নিমগ্ন।

লোকটির বয়স ২৫ হইতে ২৮ বৎসরের মধ্যে। মুখের রঙ রোদে পোড়া, চক্ষুদ্বয় জেট পাথরের মতো কালো, চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া। এই সমস্ত লক্ষণে আণ্ডালুজ প্রদেশের লোক বলিয়া বুঝা যায়। সাহসী যুবকবৃন্দের জন্মভূমি সেভিল শহর হইতে আসিয়াছে। ওরূপ বলিষ্ঠ শরীর ও সুগঠিত অংগপ্রত্যংগ প্রায় দেখা যায় না।

এই মল্লবীরের নাম জুয়াংকো। এক বৎসর হইতে জুয়াংকোর এইরূপ মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ যদি উহার সহিত ভাব করিতে অগ্রসর হইত, সে তাহাতে বাধা দিত না—কিন্তু নিজে কাহারও সহিত গায়ে-পড়িয়া বন্ধুত্ব করিত না। অনাসময়ে অপরিমিত সুরাপানে মত্ত হইয়া শুঁড়িখানায় গোলমাল করিত। তাণ্ডব-নৃত্য করিত, এবং অনর্থক ঝগড়া বাধাইয়া ছোরা চালাইতেও কুণ্ঠিত হইত

না; তাহার পর যখন নেশার ঝোঁক চলিয়া যাইত, আবার সে মৌনভাব ধারণ করিত, আবার কি-এক চিন্তায় মগ্ন হইত।

বৃষযুদ্ধের নির্দিষ্ট সময় আসন্ন হইল। জুয়াংকো ছাড়া আর সব মল্লেরাই আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। একটি গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সকলের শেষে জুয়াংকোর গাত্রোত্থান করিল। তাহার ললাট হইতে চিন্তামেঘ অপসৃত হইল। তাহার চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশেই যেন বুক ফুলাইয়া সদর্পে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ, উহার পোষাকও তেমনি জমকালো।

যখন জুয়াংকো রাণীর নির্দিষ্ট আসনের সম্মুখে নতজানু হইল, তখন জুয়াংকোর উদ্দেশে দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে একটা বাহবা-সূচক গুঞ্জন সমুত্থিত হইল।

আন্দ্রে যুদ্ধ-ক্রীড়ার এই সব গৌর-চন্দ্রিকার দিকে বড় একটা লক্ষ্য করে নাই। আন্দ্রের পাশে যে তরুণী বসিয়াছিল, আন্দ্রে তাহার দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। যুবক আন্দ্রে একেবারে আনন্দে-আত্মহারা হইয়া মনে মনে তরুণীর পার্শ্বে মুখের তারিফ করিতেছিল। কি সুন্দর মুখের ডৌল; যেন ভাস্কর পরিষ্কাররূপে পাথর হইতে খুদিয়া বাহির করিয়াছে। ইহা খাঁটি গ্রীক সৌন্দর্য, কিন্তু আরব-চরিত্রযোগে যেন আরও একটু পরিমার্জিত—সেই একই বিশুদ্ধতা, কিন্তু উহার সহিত যেন একটু বুনোভাব মিশ্রিত; সেই একই রূপমাধুরী, কিন্তু উহাতে যেন একটু নৃশংসতার আমেজ আছে।

আন্দ্রেকে তরুণীর ধ্যানে অবিচলিত-ভাবে নিমগ্ন দেখিয়া, বৃদ্ধার চাপা কোপ ক্রমশঃ বর্ধিত হইল; আপন বেঞ্চে বসিয়া একটু ছটফট করিতে লাগিল। আন্দ্রে আপন-মনে অস্ফুটস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল 'ডাইনী বুড়িটা জাহান্নামে যাক!'

জুয়াংকোর বৃষবধ করিবার পালা এখনো আসে নাই—রঙ্গাঙ্গনের মধ্যে সে অবজ্ঞা ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।—জুয়াংকো তাহার সুন্দর জ্বলজ্বলে কালো চোখের দৃষ্টিতে সকল আসনগুলি পরে-পরে একবার দেখিয়া লইল। মনে হয়, জুয়াংকো যেন দর্শকদিগের মধ্যে কাহাকে খুঁজিতেছে। উহার দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া, অবশেষে যেখানে তরুণী ও বৃদ্ধা বসিয়াছিল, সেই নিম্নশ্রেণীর আসনে আসিয়া উপনীত হইল, তখন বিদ্যুতের ন্যায় তাহার শ্যামল মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল; এবং সকলের দৃষ্টিগোচর না হয়—এইভাবে একটু মাথা নোয়াইল।

বৃদ্ধা মৃদুস্বরে বলিল, 'মিলিতোনা, জুয়াংকো আমাদের দেখতে পেয়েছে। সাবধান, বেশ ভদ্র হয়ে বোসো। জান তো জুয়াংকোর কি রকম সন্দিগ্ধ মন!'

মিলিতোনাও মৃদুস্বরে উত্তর করিল, 'তাতে আমার কি যায় আসে? আমি তো ঐ লোকটির দিকে তাকাই নি?'

কিন্তু একবারও আন্দ্রের দিকে তাকায় নাই—মিলিতোনার এই কথাটি একটি ছোটখাটো মিথ্যা কথা। আমরা সত্য

ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি। অতএব সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তরুণীর আন্দ্রেকে একজন সুপুরুষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তরুণীর সহিত কথাবার্তা শুরু করিবার একটা উপায় স্বরূপ আন্দ্রে একজন ফল ও মোরব্বা-বিক্রেতাকে ইসারা করিয়া ডাকিল। আন্দ্রের পার্শ্বে একজন পরম রূপসী উপবিষ্টা দেখিয়া, একজন বিক্রেতা উহার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল।

আন্দ্রে একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া মোরব্বার খোলা বাক্স তরুণীর সম্মুখে ধরিল—'আপনার কিছু লজেঞ্জিস চাই?'

তরুণী চট করিয়া আন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত আন্দ্রেকে দেখিতে লাগিল।

মিলিতোনা সহসা মনস্থির করিয়া তাহার ছোট ছোট আঙুলগুলি বাক্সের মধ্যে দিল এবং একমুঠো লজেঞ্জিস বাহির করিয়া লইল।

জুয়াঙ্কোর এইবার বৃষ মারিবার পালা। যে বৃষকে জুয়াঙ্কো বধ করিবে, সে বৃষটা বড়ই ভীষণ। জুয়াঙ্কোকে চমৎকার দেখিতে হইয়াছে। অবিচলিত সঙ্কল্প তাহার মুখে প্রকাশ পাইতেছে, নেত্র-নিঃসৃত অদৃশ্য কিরণচ্ছটা তীরের মত বৃষকে বিদ্ধ করিতেছে। জুয়াঙ্কো যেমন এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল, পশুটা তেমনি এক এক পদ পিছাইতে লাগিল। উপরিস্থ সোপানের উচ্চ আসন সমূহ হইতে যে প্রশংসাধ্বনি হইতেছিল, তাহার তুমুল শব্দে রঙ্গশালার ছাদ যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। জুয়াঙ্কো মিলিতোনার দিকে একবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

সময়টা ঠিক বাছা হয় নাই। মিলিতোনার হাত হইতে হাত-পাখাটা পড়িয়া গিয়াছিল। আন্দ্রে তাড়াতাড়ি ব্যগ্রভাবে উহা কুড়াইয়া দিল। তরুণী মৃদুমধুর হাসিমুখে বিকাশ করিয়া এবং একটু মাথা নোয়াইয়া আন্দ্রেকে ধন্যবাদ জানাইল। এই মৃদু হাসি জুয়াঙ্কোর নজরে পড়িল। জুয়াঙ্কোর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, সে ছোরার হাতলটা খুব কসিয়া ধরিল। জুয়াঙ্কোর মোহিনী দৃষ্টির প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বৃষটা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে অগ্রসর হইল; জুয়াঙ্কোও সেই সময় আত্মরক্ষণে বিরত ছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই ভয়ংকররূপে কমিয়া আসিল।

দর্শকদিগের চীৎকারে জুয়াঙ্কোর জড়তা বিদূরিত হইল। সে চট করিয়া একটু পিছু হটিল। রণাঙ্গনে জুয়াঙ্কো আবার স্বকীয় প্রভুত্ব ফিরিয়া পাইল। দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া, বৃষের মাথা নত করাইবার জন্য, অনেকবার তাহার সম্মুখে ছোরার আস্ফালন করিল। তাহার পর অন্ধভাবে এলোধাবাড়ি রকমে ছোরার আঘাত করিতে লাগিল। ছোরাটা একটা হাড়ে ঠেকিয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। জুয়াঙ্কো এখন নিরস্ত্র এবং বৃষটা ভীষণ উদ্যমে পূর্ণ। রক্ষিগণ সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসল, মিলিতোনার মুখ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইল। লোকেরা জুয়াঙ্কোর এই অপ্রত্যাশিত অদক্ষতা লক্ষ্য করিয়া খুব চীৎকার ও কোলাহল করিতে লাগিল। এইরূপ কোলাহল করিতে স্পেনের লোকেরা খুব মজবুৎ।

জুয়াঙ্কো এই গালিবর্ষণের মধ্যে

অটলভাবে দাঁড়াইয়া, আপনার ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল। শীঘ্রই আপনাকে সামলাইয়া লইল, এবং কি যেন একটা মতলব আঁটিয়া, ছুটিয়া গিয়া ভূপতিত অসিটা কুড়াইয়া লইল। এইবার জুয়াঙ্কো দস্তুরমতো নিয়মানুসারে পশুটাকে অসির দ্বারা সজোরে আঘাত করিল। পশুটার সর্বশরীর একবার কাঁপিয়া উঠিল, এবং চার পা আকাশে তুলিয়া ভূতলে গড়াইয়া পড়িল।

আন্দ্রে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, পার্শ্বসহচরীকে বলিল—'জুয়াঙ্কো এইবার খুব প্রতিশোধ নিয়েছে। এ বিষয়ে শ্রীমতীর মত কি?'

মিলিতোনা প্রায় ঠোঁট না খুলিয়া ও মাথা না ফিরাইয়াই খুব তাড়াতাড়ি বলিল! 'আপনাকে অনুনয় কচ্ছি, মশায় আমার সঙ্গে একটি কথাও করেন না।'

আন্দ্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিল।

লড়াই এর শেষ পর্যন্ত জুয়াঙ্কো দর্শকদিগের আসনের দিকে আর দৃষ্টিপাত করে নাই। পর-পর দুই দুইটা প্রচণ্ড বৃষকে যমসদনে পাঠাইয়াছে। পূর্বে যেমন দর্শকবৃন্দ ধিক্কার দিয়াছিল, এখন আবার সকলেই উচ্চৈঃস্বরে জুয়াঙ্কোর স্তুতিবাদ করিতে লাগিল।

আন্দ্রে একটি কথাও আর বলে নাই। এমন কি বৃষ যুদ্ধ শেষ হইবার একটু পূর্বেই আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। সোপান-ধাপ দিয়া নামিবার সময় একটি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর ছোকরাকে মৃদুস্বরে দুই চারিটা কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। দর্শকবৃন্দ সবাই প্রস্থান করিলে, জনতার মধ্যে দিয়া ঐ ছোকরাটি মিলিতোনা ও বৃদ্ধার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। গাড়ির পিছনে কোন প্রকারে ঝুলিয়া রহিল। গাড়ি ধুলোজাল উড়াইয়া সশব্দে ছুটিয়া চলিল।

আন্দ্রে সেই ছোকরাটাকে যে কাজের ভার দিয়াছিল সেই কাজ হাসিল হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আন্দ্রে একটা গলিতে অপেক্ষা করিতেছিল। সার্কাসের সেই তরুণীর ভালবাসা পাইয়াছে মনে করিয়া আন্দ্রে মনে মনে নানাপ্রকার সুখের কল্পনা করিতে লাগিল।

আন্দ্রে যখন এইরূপ সুখ-স্বপ্নে ভোর হইয়া কল্পিত করতালের তালে তালে তুড়ি দিতেছিল, তখন সূর্য দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়া অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ভোজনের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। আন্দ্রের দূত এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। এতক্ষণে তাহার আসা উচিত ছিল। বিলম্ব দেখিয়া আন্দ্রে বিস্মিত হইল, তাহার দূতকে আবার কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল, 'হয়তো, পথে তাহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করা যাক।

আসল কথা আন্দ্রের দূত সেই অদ্ভুত ধরনের ছোকরাটা গাড়ির পিছনের স্প্রিং ধরিয়া কোন রকমে ঝুলিয়াছিল, এ-গলি সে-গলি পার হইয়া গাড়ি যখন একটা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল, কোচম্যান জানিতে পারিল গাড়ির পিছনে একটা লোক ঝুলিয়া আছে, জানিতে পারিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক কসাইয়া দিল।

ছোকরাটা চাবুক খাইয়া কাঁদিতে লাগিল—তখন গাড়িটা একে বারে রাস্তার শেষে গিয়া পড়িয়াছে। ছোকরার নাম পেরিকো। পেরিকো সকল স্পেনীয় ছোকরেরই মত খুব দৌড়াইতে পারে। তাহার দৌত্য-কার্যের গুরুত্ব হৃদয়ংগম করিয়া সে খুব ছুটিয়া চলিল, সে আবার যখন বাঁকটায় ফিরিল, তখন গাড়িটা অন্তর্হিত হইয়াছে। পেরিকো অলিগলি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। আন্দ্রে যাহা বলিয়াছিল যদিও তাহা পেরিকো করিতে পারে নাই তথাপি সে সব রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পেরিকো রাস্তার ধারের ফোয়ারার জলে চোখ ধুইয়া, যেখানে আন্দ্রের অপেক্ষা করিবার কথা, সেই দিকে চলিল। আরও কয়েক মিনিট সেখানে থাকিলে, পেরিকো দেখিতে পাইত, আর একটা গাড়ি, বাড়ির সামনে আসিয়া—একটি লোক গাড়ি হইতে লঘুভাবে লাফাইয়া পড়িল—তার এক পায়ের রেশমী লম্বা মোজায় রক্তের দাগ লাগিয়াছে। এ জুয়ান্কো ভিন্ন আর কেহ নয়।

একটা সুচাগ্র চতুষ্কোণ স্মৃতি-স্তম্ভের নিকট অপেক্ষা করিয়া থাকিতে আন্দ্রে পেরিকোকে বলিয়াছিল, পেরিকো সেই সংকেত স্থানের অভিমুখে চলিল। আন্দ্রে একা ছিল না। ফেলিসিয়ানা তাহার গাড়ি হইতে ভাবী পতিকে দেখিয়া নিকটে গেল। পেরিকো কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া উহাদের চারিদিকে ঘুরপাক দিতে লাগিল। সে বিস্মিত হইল, এমন সুন্দরী মহিলাদের সহিত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিনা একজন আলখাল্লাধারী নিম্নশ্রেণী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

আন্দ্রে ইসারা করিল—যাহার অর্থ, —আমি যখন একা থাকব তখন এখানে আবার ফিরে আসবি।

আন্দ্রের কষ্ট এইখানেই শেষ হইল না। ফেলিসিয়ানা বলিলেন, 'এমনিই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আমাদের সংগে গাড়িতে উঠে পড়।'

আর পিছাইবার উপায় নাই। আন্দ্রে গাড়ির সম্মুখ আসনে গভর্নেসের পাশে গিয়া বসিলেন। পেরিকোর আনীত সংবাদ শুনিতে পাইলেন না বলিয়া তিনি রাগে গরগর করিতেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, পেরিকো সমস্ত সন্ধান লইয়া আসিয়াছিল।

বস্তুতঃ আন্দ্রের গুপ্তচর যে রাস্তাটা আঁচিয়াছিল, মিলিতোনা সেই রাস্তাতেই বাস করে। মিলিতোনার বাড়িটা অদ্ভুত রকমে নির্মিত। সম্মুখের জানালাগুলো অসমান। বাড়ির সম্মুখে সমস্ত প্রাচীর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং স্বীয়-ভাবে দমিয়া গিয়াছে, বসিয়া গিয়াছে। মিলিতোনা এখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন, সিঁড়ির ধাপগুলো খুব খটখটে শক্ত, সিঁড়ির গরাদে ঝিকমিক করিতেছে। একটা দেবদারু কাঠের দরজা—দরজার সম্মুখে একটা দড়ি ফেলা আছে, তরুণী দড়ির আগাটা উঠাইয়া লইল এবং চাবি লইয়া দরজাটা খুলিল। এমন দীন ধরনের কামরা দেখিয়া কোন চোর প্রলোভিত হইতে পারে না। মিলি-তোনা যখন বাহিরে যাইত তখন ঘরটা খোলাই থাকিত, এক ক্ষুদ্র কোটরটিতে একটি বহুমূল্য রত্ন নিহিত—চোরের

চোখে উহা রক্ত না হউক, প্রেমিকের চোখে রক্ত বটে।

চারি দেওয়ালে ঘেরা এই কামরাটির ভিতর সবই বেশ নয়নানন্দকর, হাস্যময় ও উজ্জ্বল। বৃদ্ধা এতক্ষণে হাঁস ফাঁস করিয়া কোনপ্রকারে কোটরটিতে প্রবেশ করিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

এই দুই রমণীর মধ্যে কথাবর্তা চলিতেছে, এমন সময় লোহার আঘাতের মত দরজায় একটা জোরালো ঘা পড়িল। কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। বৃদ্ধা উঠিয়া দেখিতে গেল। রন্ধ্র দিয়া জুয়াংকোকে দেখিতে পাইল। তাহার রৌদ্রে-দগ্ধ মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা আলদল্লা দরজার কপাট খুলিয়া দিল। জুয়াংকো প্রবেশ করিল।

জুয়াংকো স্বভাবতঃ অভিমানী লোক। যুবাপুরুষ মিলিতোনার সহিত কথা কহিতেছে দেখিয়া তাহার রোষ চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল, এবং রণাঙ্গন হইতে বাহির হইয়া কখন সেই যুবককে পাকড়াও করিবে সে ছটফট করিতেছিল। একটি মাত্র চিন্তা যাহা তাহার মনকে দখল করিয়া বসিয়াছিল তাহার দ্বারা চালিত হইয়া জুয়াংকো মিলিতোনাকে বলিল, 'তোমার পাশে যে যুবকটি বসেছিল সে কে?

'তার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ; আমার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় নেই।

'সেই লোকটাকে আমি খুন করব।'

'জুয়াংকো, তুমি যে পাগলের মতো কথা বলছ, কারো উপর সন্দেহ করবার অধিকার কি আমি তোমায় দিয়েছি? হাব-ভাব দেখিয়ে তোমার মন ভোলাতে আমি কি কখন চেষ্টা করেছি? আমি কখনো তোমার কাছে অঙ্গীকারে বদ্ধ হই নি। তোমাকে বরাবরই বলে আসছি, 'আমাকে ভুলে যাও।'

'কিন্তু আমি যে মিলিতোনা তোমাকে ভালবাসি, তোমা ছাড়া আমি যে জগতে আর কাউকে দেখি না। তুমি যদি আমার না হও, অন্তত তুমি আর কারও হতে পাবে না।' একটু থামিয়া টেবিলে সজোরে একটা ঘা মারিয়া জুয়াংকো এইরূপ উত্তর করিল। তাহার পর চট করিয়া উঠিয়া এই কথা-গুলি গুনগুন করিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল, আমি তাকে পাকড়াও করবই করব আর তার বুকে তিন ইঞ্চি ছোরা না বসিয়ে ছাড়ব না।

এখন আবার আন্দ্রের নিকট ফিরিয়া যাওয়া যাক। আন্দ্রে পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া সেই গানের অংশটা বেসুরো গাহিতেছে। কিন্তু আন্দ্রের কিছুই ভাল লাগিতেছে না।

মিলিতোনার প্রেমে আত্মহারা হইয়া আন্দ্রে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য আন্দ্রে যে রাস্তা দিয়া চলিতেছিল, সেই রাস্তায় কে যেন পিছন হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল। সে পেরিকো। ছোকরাটি বলিল: 'কর্তা, পোভার রাস্তার ডান দিকের তিনটে বাড়ির পরে তার বাড়ি।' নিদ্রাকালেও মিলিতোনার মধুর মূর্তি-খানি আন্দ্রের চিত্তাকাশে দুই একবার দেখা দিয়াছিল। কপোতীর নীড়টির সন্ধান পাইলেই যথেষ্ট হইবে না—তাহার নিকট উপনীত হওয়া চাই। কি করিয়া করিয়া সেখানে যাওয়া যায়?

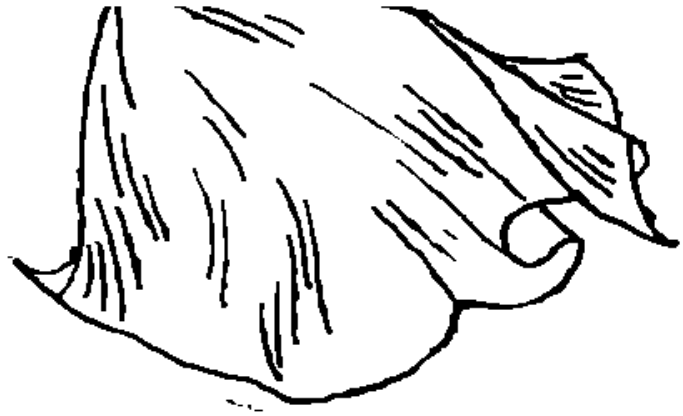

নানাপ্রকার ফন্দি ভাবিতে ভাবিতে আন্দ্রে একটা পুরাতন কাপড়ের দোকানে আসিয়া পড়িল। এখানকার কাপড়গুলা পুরাতন হইলেও ভদ্রলোকের অব্যবহার্য নহে। উহারই মধ্য হইতে ম্যানোলা শ্রেণীর টুপি কোর্তা আন্দ্রে বাছিয়া লইল। দোকানদারকে বলিল, 'সন্ধ্যার সময়ে দোকানে আসিয়া এই পরিচ্ছদ পরিধান করিব।'

যে রাস্তায় মিলিতোনা থাকে, আন্দ্রে গৃহে ফিরিবার সময় সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। বাহির দিক হইতে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না।

মিলিতোনা বাড়ি হইতে বাহির হয় নাই। সেলাই করিতে করিতে মিলিতোনা সেই যুবাপুরুষের কথা ভাবিতেছিল। আমার উপর তার যদি কিছু ভালবাসা পড়ে থাকে সে একটা ক্ষণিক খেয়াল বই কিছুই না; এরই মধ্যে সে আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে।

নিশ্চয়ই তার কোন প্রেয়সী আছে, বাগদত্তা ভাবী পত্নী আছে—সে তরুণী, সে সুন্দরী, রূপলাবণ্যবতী। মিলিতোনা আপন মনে এইরূপ বলিয়া যাইতেছিল এবং মুগ্ধ হৃদয়ের মায়াজাল বুনিয়া, আন্দ্রেকে নিজ শ্রেণীসুলভ পোষাক পরাইতেছিল।

বৃদ্ধা আসিয়া দরজায় ঘা দিল। বলিল, 'তুই যদি তাকে ভুলে গিয়ে থাকিস, সে তোকে ভোলে নি, আমি বেশ বলতে পারি।'

আন্দ্রের ভালবাসা এই বৃদ্ধার সাক্ষ্যে আরও দৃঢ়ীভূত হইল।

জুয়াংকোর হৃদয় এই সব কোমল ভাব হইতে বহুদূরে। সে বুঝিতেই পারে না মিলিতোনা কেন তাকে ভালবাসে না। এই তরুণীর অবিচলিত ঔদাস্য তাহাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে।

আন্দ্রেকে পাকড়াইতে হইলে, এখানকার প্রধান প্রধান নাট্যশালায়, সৌখীন কাফির আড্ডায় এবং অন্যান্য স্থানে তাহার খোঁজ করা আবশ্যক। সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে সব বস্ত্র পরিধান করে মতলব হাসিল করিবার জন্য সে ঐ সব কাপড় কিনিবার জন্য একটা পুরাতন কাপড়ের দোকানে গেল। আন্দ্রে যে সময়ে পুরাতন কাপড়ের দোকানে গিয়াছিল, জুয়াংকোও ঠিক সেই সময়েই গিয়াছিল।

সায়াহ্নকাল সমাগত। জুয়াংকো হাল ফ্যাসানের পরিচ্ছদ পরিধান করায়, জুয়াংকোকে এখন চেনা দুষ্কর। জুয়াংকো রাস্তা দিয়া, জ্বর রোগীর ন্যায় অসমান সদক্ষেপে চলিতে চলিতে পথ চলতি লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সঙ্গীত স্থান, স্টেজ-বকস্, কাফির আড্ডায় সকল দলের রাজনৈতিক দিগের সহিত কবিদিগের সহিত মিশিতে লাগিল। কিন্তু মিলিতোনার সহিত সেদিন সার্কাসে কথা কহিয়াছিল, তাহার মত কাহাকেই দেখিতে পাইল না।

আন্দ্রে সেই কাপড়ের দোকানে, তাহার খরিদ করা সেই ছদ্মবেশের পোশাকটা পরিতে গিয়াছিল; সেখান থেকে ফিরিয়া মিলিতোনার বাস-গৃহের সম্মুখে পেরিকোর সাহায্যে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। মিলিতোনা আপন জানলার কোণটিতে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও সে আন্দ্রেকে সম্মুখস্থ দোকানে বসিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল না জানি কি মৎলবে আন্দ্রে ওখানে আড্ডা গাড়িয়াছে।

আন্দ্রে খুব মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল কে কে মিলিতোনার গৃহে প্রবেশ করে। ক্রমে রাত্রি আসিয়া পড়িল; মিলিতোনার দেখা নাই।

আন্দ্রের দূত আন্দ্রেকে মিলিতোনার যে ঠিকানা দিয়াছিল, হয়তো তাহা ভুল—এইরূপ আন্দ্রে মনে মনে ভাবিতেছিল—এমন সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জানলাটা আলোকিত হইয়া উঠিল; এবং দেখা গেল কামরায় লোক আছে।

আন্দ্রে পেন্সিল দিয়ে এক টুকরো কাগজের উপর দুই চারিটা কথা লিখিয়া পেরিকোকে ডাকিল।

পেরিকো খুব সতর্কভাবে দরজায় দুইবার করাঘাত করিল। তরুণী খড়খড়ি খুলিয়া চিঠিখানা লইল। চিঠিতে লেখা ছিল

'একজন তোমাকে ভুলতে পারে না, ভুলতে ইচ্ছাও করে না, সে তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চায়।...'

কয়েক মিনিটের পর, প্রদীপটা অন্তর্হিত হইল, জানলাটা খুলিয়া গেল। মিলিতোনা মগ নীচে নিক্ষেপ করিল। মৃত্তিকার মধ্যে কি একটা সাদা জিনিস ঝিকমিক করিতেছে আন্দ্রে দেখিল।

নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করিল

'ওখান থেকে চলে যাও...কাল দশটার সময়...হাঁসিড়োর গির্জায় থাকব। আমার কথা শোনো, এখানে থাকলে প্রাণ যাবে।'

রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য। আন্দ্রে ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিতেছে এমন সময় একটা লোকের মূর্তি তাহার নেত্রগোচর হইল। বস্ত্রের নীচে তীক্ষ্ণ কোণবিশিষ্ট একটা গিতার যন্ত্র রহিয়াছে। আন্দ্রে একটা অন্ধকার কোণে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল।

লোকটা গিতার যন্ত্রটা সামনে আনিল, এবং গিতারের তার টানিয়া তালে তালে একটা গুঞ্জন ধ্বনি বাহির করিতে লাগিল।

আন্দ্রে গাছের ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিল,—গাছের ছায়া হইতে যেই একটু মুখ বাড়াইয়াছে জুয়াংকোর সজাগ দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। জুয়াংকো আন্দ্রের অভিমুখে ছুটিয়া গেল—আন্দ্রের মুখ তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। রোষ-কম্পিত-স্বরে জুয়াংকো বলিল 'এ সময়ে তুমি এখানে কি করতে এসেছ?' 'আমি তোমার সঙ্গীত শুনচি।'

'আমি যখন গান করি সে সময় এ রাস্তায় আসা সকলেরই নিষেধ।'

আন্দ্রে নির্বিকারচিত্তে শান্ত ভাবে উত্তর করিল 'স্বভাবত আমি বড়ই অবাধ্য।'

'আজই তোমার স্বভাব বদলে যাবে।'

কোন প্রকারেই না; আমার স্বভাব আমার অত্যন্ত প্রিয়।'

'আচ্ছা বেশ, আপনাকে হয় রক্ষা কর, নয় কুকুরের মত মর।'

আন্দ্রেও ক্ষিপ্রতার সহিত সতর্ক হইল, এবং আত্মরক্ষার্থ এমন একটা উত্তম প্রণালী দেখিয়া বৃষভমল্ল বিস্মিত হইল।

জুয়াংকো খুব একটা চেষ্টা করিয়া শত্রুর উপর বাঘের মতো লাফাইয়া পড়িল। আন্দ্রে চীৎপাত হইয়া ধরাশায়ী হইল। এই সময় মিলিতোনা-গৃহের অদৃঢ়-বন্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। জুয়াংকো ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিল। ঐ রাস্তায় কোণ দিয়া নৈশ প্রহরী যাইতেছিল।

আন্দ্রে মরিয়াছে কি শুধু আহত হইয়াছে, ইহা ঠিক নির্ধারণ না করিয়া, নৈশ প্রহরীর হাঁক শুনিয়াই জুয়াংকো প্রস্থান করিল; সে মনে করিয়াছিল আন্দ্রে নিশ্চয়ই নিহত হইয়াছে।

একটা গোলমালের শব্দ শুনিবামাত্র মিলিতোনা জানলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং যুদ্ধের সমস্তক্ষণ তাহার যেরূপ ভাবনা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়।

যে সময় আন্দ্রে মাটিতে পড়িয়া যায় ঠিক সেই সময় মিলিতোনা আসিয়া দ্বারের কপাট খুলিয়াছিল। মিলিতোনা আন্দ্রের হৃদপিণ্ডের উপর হাত দিয়া দেখিল, অতি ক্ষীণভাবে স্পন্দিত হইতেছে। সেই সময় নৈশ প্রহরী সেইখান দিয়া যাইতেছিল। মিলিতোনা সাহার্যার্থ তাহাকে ডাকিল। প্রহরী ছুটিয়া আসিল।

ঐ প্রহরী একটা হাঁক দিয়া ডাকিবা মাত্র তাহার সাহার্যার্থে তাহার এক জুড়িদার আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দুজনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া মিলিতোনার গৃহের সিঁড়ি দিয়া উঠাইতে লাগিল।

অবশেষে অস্ত্র-চিকিৎসক আসিলেন এবং আহতের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাতটা খুব গুরুতর নহে, ভয়ের কোন কারণ নাই। ক্ষতস্থানের ধারে ডাক্তারের শলাকা স্পর্শ হইবামাত্র আন্দ্রের জ্ঞান হইল। চোখ খুলিয়া আন্দ্রে প্রথমেই দেখিল, মিলিতোনা হাত বাড়াইয়া ডাক্তারকে একটা ক্ষত বন্ধনের কাপড় দিতেছে।

ডাক্তার পটি বাঁধা শেষ করিয়া কাল

আবার আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

আন্দ্রে অস্ফুটস্বরে দুই চারিটা কথা কহিবার চেষ্টা করায় মিলিতোনা বলিল

'কথা কইবার চেষ্টা করবেন না, ডাক্তার নিষেধ করেছেন।' মিলিতোনা যুবকের রক্তহীন ঠোঁটের উপর স্বীয় হস্ত স্থাপন করিল। আন্দ্রে মিলিতোনার নিকটে যাইবার জন্য পূর্বে কত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু এই উপায়টা কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় নাই।

তরুণী জাগিয়া উঠিল। তারপর রোগীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কেমন বোধ করিতেছেন।'

আন্দ্রে প্রেম ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে মিলিতোনার পানে চাহিয়া উত্তর করিল, 'ভাল।'

আন্দ্রে বাড়ি ফিরিল না দেখিয়া আন্দ্রের ভৃত্যেরা মনে করিল কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। বাড়ি গিয়া ফেলিসিয়ানা তাহার পিতাকে বলিল, 'আজ আন্দ্রের দেখা পাওয়া গেল না।'

তাহার পরদিনও আন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। দুইদিন হইতে তাহাকে কেহ দেখে নাই। এই দুর্বোধ্য অন্তর্ধানের আর কি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? আত্মহত্যা?

ইহার ভিতর একটা কিছু রহস্য আছে—যাহার উদ্‌ভেদ একমাত্র পুলিসের লোকেরাই করিতে পারে। ডন জেরোনিমো ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পুলিসেরই শরণাপন্ন হইলেন।

পুলিসের কর্তা নাকে চশমা লাগাইয়া রেজিস্টারি-বই দেখিতে লাগিলেন; তাহাতে কিছুই পাইলেন না। যেদিন আন্দ্রে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই তারিখের রাত্রিটা খুব শান্ত ছিল। রেজিস্টারি বই বন্ধ করিবার পূর্বে, গম্ভীর ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, 'কেবল এক জায়গায় খুন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র; ব্যাপারটা তেমন কিছু গুরুতর নহে। যাকে খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার গায়ে তামাটে রং-এর একটা হাতকাটা মেরজাই ছিল, নীল রঙের জামা, ধূসর রঙের কাপড়ের চওড়া পেণ্টুলুন; বাছুরের চামড়ার সাদা জুতো—এই বর্ণনা থেকে কি তাকে চিনতে পারছেন?'

ডন জেরোনিমো দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উত্তর করিলেন, 'একটুও না...কিন্তু কি করে তার সন্ধান পাওয়া যায়?'

'তার জন্য চিন্তা নাই; দুই গোয়েন্দাকে আমি তার পিছনে লাগাচ্ছি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এর একটা কিনারা করবই।'

ডন জেরোনিমো ধন্যবাদসহ নমস্কার করিয়া খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বাহির হইলেন। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত কন্যাকে বলিলেন। ফেলিসিয়ানা তাহার ভাবী পতির জন্য একটু অশ্রুপাত করিলেন। ২৪ ঘণ্টা কখন অতিবাহিত হইবে, কখন গোয়েন্দাম্বয়ের সফল অনুসন্ধানের রিপোর্ট আসিবে তজ্জন্য ডন জেরোনিমো অধৈর্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ঐ দুই চতুর গোয়েন্দা প্রথমে আন্দ্রের গৃহে গিয়া, আন্দ্রের অভ্যাসাদির কথা খুব

নিপুণতার সহিত আন্দ্রের ভৃত্যদের মুখ হইতে বাহির করিল।

দুই বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিল। একই সময়ে একজন ভদ্রলোক একজন নিম্নশ্রেণীর লোকের আংরাখা এবং একজন নিম্নশ্রেণীর লোক একজন ভদ্রলোকের ফতুয়া কি মতলবে পরিয়াছিল তাহা এই প্রহরীদ্বয় কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ম্যাজিস্ট্রেট প্রহরীদ্বয়ের রিপোর্ট যথোচিত মনোযোগ সহকারে শুনিয়া উহাদিগকে বলিলেন কিন্তু তোমারা তো জানতে পার নি; চলে যাবার পর সেই বদমাইসদের শেষে কি হল?'

'আমরা আবার তাদের খুঁজে বের করব।'

এই সময় ডন জেরোনিমো কোন নূতন খবর আছে কিনা জানিবার জন্য আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বেশ একটু শুষ্কভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন 'এরূপ প্রকাশ্যভাবে এতটা দরদ দেখিয়ে ডন আন্দ্রের খোঁজ-খবর নেওয়াটা আপনার পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হচ্ছে না। ডন আন্দ্রে একটা মস্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত আছেন, আমরা দুদিন থেকে তারই সন্ধান করচি।'

ডন জেরোনিমো বলিয়া উঠিলেন, 'আন্দ্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত!'

একজন পুলিসের কর্মচারী বলিল 'হা তিনিই।'

ফেলিসিয়ানা যখন জানিল যে, বহু-শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট একটা বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের নেতা তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য এত সাধা সাধনা করিতেছে, তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আন্দ্রের খুব মনের জোর আছে বলিতে হইবে, সে এমন উচ্চতর রাষ্ট্র-নৈতিক কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও কিছু কাহাকেও জানিতে দেয় নাই—এই সবের উপর আর কি বিশ্বাস করা যায়!

এখন আবার জুয়াঙ্কোর নিকট ফিরিয়া যাওয়া যাক। আন্দ্রের সহিত যখন তাহার যুদ্ধ হয় সেই সময় আমরা জুয়াঙ্কোকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। এক ঘণ্টা পরে জুয়াঙ্কো বাঘের মতো নিঃশব্দে পা ফেলিয়া, যুদ্ধ ঘটনার স্থলে আবার আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, আন্দ্রের মৃত শরীর ঐখানেই সে দেখিতে পাইবে। কিন্তু দেখিতে না পাইয়া জুয়াঙ্কো যার পর নাই বিস্মিত হইল। তবে কি আহত অবস্থায় যন্ত্রণার আবেশে নিজের শরীর-টাকে টানিয়া-টানিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে? জুয়াঙ্কো কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। এখন এখানে থাকে, না, এখান হইতে পলায়ন করা শ্রেয়? শীঘ্রই সহরের সীমা ছাড়াইয়া পল্লীগ্রামের বিষণ্ণ মাঠময়দানে আসিয়া পড়িল। সে কল্পনা করিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আরোগ্যলাভ করিয়া এতক্ষণে স্মিত হাস্যাননা মিলিতোনার আলিঙ্গন পাশে বন্ধ হইয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইলে মল্লবীর, আস্তিন বিরহিত খাটো আলখাল্লা পরিধান করিয়া ও টুপিটা চোখের উপর নামাইয়া দিয়া, রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে শুনিতে আসিল। জানিতে পারিল, যুবকটি মরে নাই; এবং বহিয়া লইয়া

যাইবার অবস্থা নহে বলিয়া মিলিতোনা তাহাকে নিজ কক্ষে রাখিয়া দিয়াছে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিলিতোনার পালংকে। খুব দৃঢ়সংকল্প হইয়া জুয়াংকো মিলিতোনার গৃহে প্রবেশ করিল; এবং প্রবেশ করিয়া গুরুপদক্ষেপে ও সশব্দে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

একথা সত্য জুয়াংকোর মতো বলিষ্ঠ লোক প্রায় দেখা যায় না। গ্রীবা, থামের মতো গোলাকার ও সুদৃঢ়; মল্লসুলভ স্কন্ধের সহিত তাহার শক্তিমান মস্তক সংযুক্ত। সিঁড়িতে উঠিবার সময় প্রত্যেক ধাপের উপর হিংস্র জন্তুর মত দাঁত কিড়-মিড় করিতে করিতে এই কথাটা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল

তার শোবার ঘরে! তার শোবার ঘরে! অবশেষে দরজার কাছে পৌঁছিয়া, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া কর্ণপাত করিতে লাগিল।

কক্ষের ভিতরটা সব চুপচাপ। নিজের বুকের ধুকধুক শব্দ ছাড়া জুয়াংকো আর কিছু শুনিতে পাইল না। তাহার শত্রু ও তাহার মধ্যে এখন এই দরজার ব্যবধান মাত্র।

আন্দ্রে পালংকের উপর যন্ত্রণায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। মিলিতোনা তাহার পাশেই বসিয়াছিল;—সে যেন কলকাঠির দ্বারা চালিত হইয়া একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। বুড়ি আলদঞ্জা স্বীয় বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ চুম্বন করিয়া ক্রুশের চিহ্ন প্রদর্শন করিল।

দরজার বাহির দিক হইতে খুব একটা ঘা পড়িল। দরজায় ঐরূপ একটা ঘা যেই পড়িল, অমনি ভিতর দিক হইতে দরজার অর্গলটা নামিয়া গেল। আলদঞ্জা বুড়ি রন্ধ্রের ভিতর দিয়া জুয়াংকোর মাথা দেখিতে পাইল। বৃদ্ধা বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল মেরী মা রক্ষা কর, রক্ষা কর।

জুয়াংকো যখন দেখিল, কেহ দরজা খুলিতেছে না, তখন সে তার কাঁধের ঠেস দিয়া দরজায় একটা চাপ দিল; দরজার তক্তাগুলা মড়মড় করিয়া উঠিল। কবজা ও তালার চারিদিক হইতে পলস্তারা খসিয়া পড়িতে লাগিল। মিলিতোনা আন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে ও শান্তভাবে ভীতিবিহ্বলা বৃদ্ধাকে বলিল

'আলদঞ্জা দরজা খুলে দাও, আমি বলচি দরজা খুলে দাও।'

জুয়াংকো মনে করিয়াছিল, উহাকে সহজে প্রবেশ করিতে দিবে না—কিন্তু কোন বাধা না পাইয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইল। জুয়াংকো সেই কপাটটা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিল; তাহার পর দরজায় পিঠ দিয়া, বক্ষের উপর বাহুদ্বয় আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবস্থাটা বড়ই ভীষণ; কোন গোলমাল নাই, কোন শব্দ নাই যে তাহা শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিবে। ঘর হইতে বাহির হইবার যে কোন উপায় নাই!

ছোরার আঘাতে আহত বেচারী আন্দ্রে রক্তস্রাবে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে; তাতে আবার এখন নিরস্ত্র; মিলিতোনার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহার এই ভীতিজাত পাণ্ডুবর্ণে তাহার সৌন্দর্য যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মিলি-

তোনা সেইখানে দাঁড়াইয়া এক হাতে আন্দ্রের পালঙ্কের কিনারা ধরিয়া আছে, আর এক হাত, মহিমাময়ী রাজরাণীর মত আদেশের ভঙ্গিতে দ্বারের অভিমুখে প্রসারিত;—মিলিতোনা কম্পিতস্বরে জুয়াঙ্কোকে বলিল :—'নরহত্যাকারী পিশাচ, কি জন্য তুমি এখানে এসেছ? হত্যার চেষ্ট করেও যথেষ্ট হল না, আবার গুপ্তহত্যা?'

জুয়াঙ্কোর চিত্ত বিচলিত হইল, লজ্জায় উহার মুখ লাল হইল, খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিল, 'দেবতা সাক্ষী করে, মাতৃ-দেবীকে সাক্ষী করে, শপথ কর্ যে, এই যুবককে তুই ভালবাসিস নে, তা হলে এখনি আমি এখান থেকে চলে যাব।'

তরুণী কোন উত্তর দিল না।

এই নিস্তব্ধতা আন্দ্রের পক্ষে মৃত্যু-দণ্ডের নীরব ঘোষণা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জুয়াঙ্কো আবার বলিল :—

'যদি শপথ করতে না চাস, শুধু একটা মুখের কথা বল। তা হলেই আমি বিশ্বাস করব। তুই কখনোও মিথ্যা কথা বলিস নি। এখনো তুই চুপ করে রয়েছিস?—তবে তোকে খুন করব।'...

তরুণীর চোখ হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল,—সে ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিল, —'আমার জন্য ওর যদি মরতেই হয়, তা হলে অন্তত ও এইটুকু জানুক যে, ও আমার ভালবাসা পেয়ে মরেচে। আর তোমার পক্ষে এই হবে মৃত্যুদণ্ড।'

জুয়াঙ্কো এক লাফে মিলিতোনার পার্শে আসিয়া সজোরে তাহার বাহু ধরিল।

'এখন যা বললি, আবার যেন এই কথা মুখ দিয়ে বের না হয়—যদি ফের এই কথা বলিস, তাহলে আমার এই ছোরা তোর বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে, ঐ হতভাগার শরীরের উপর তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

নির্ভীক বালা বলিল,—'তাতে আমার কি এল-গেল? তুমি কি মনে করচ, ও মরে গেলে আমি বাঁচব?'

আন্দ্রে পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিতে খুব চেষ্টা করিল। ক্ষতস্থানের মুখ আবার খুলিয়া গেল। আন্দ্রে বালিসের উপর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আন্দ্রের এই অবস্থা দেখিয়া মিলিতোনা বলিল

'তুমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও, তা হলে আমি মনে করব, তুমি অতি নীচ, নির্লজ্জ ও ভীরু।

'মিলিতোনা! মিলিতোনা! তোমাকে আমি যতটা ভালবেসেছি, কোন পুরুষ কোন রমণীকে কখন তেমন ভালবাসে নি —তবু আমার প্রতি বিরাগ দেখাবার অধিকার তোমার আছে; কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তোমার নাই।'

জুয়াঙ্কো বিষণ্ণস্বরে উত্তর করিল :—

'আচ্ছা,—যতদিন না ও সেরে ওঠে, আমি অপেক্ষা করব; কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি বেঁচে থাকতে, তুমি আর কারও হতে পাবে না।'

যখন এই বাদানুবাদ চলিতেছিল, বৃদ্ধা দরজার কপাট খুলিয়া, পাড়ার লোকদের সাহায্য চাহিয়া সঙ্কেতধ্বনি

করিয়াছিল; তখনি পাঁচ ছয় জন লোক আসিয়া জুয়াঞ্চোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, জুয়াঞ্চো ঘর হইতে বাহির হইল।

এই সমস্ত ব্যাপারে আন্দ্রের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিল।

মিলিতোনা প্রেমপূর্ণ উদ্বেগভরে খুব সন্তর্পণে ও সযত্নে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে বহু পরিশ্রম আর অনুসন্ধানের পর ডিটেকটিভদ্বয় জানিতে পারিয়াছে যে রাস্তায় সেই আহত ব্যক্তি আন্দ্রে ছাড়া আর কেহ নহে!

এই সংবাদ পাইয়া ফেলিসিয়ানা বলিল :—'বাবা, বেচারী আন্দ্রেকে আমাদের একবার দেখতে যাওয়া উচিত।'

তাহার সদাশয় পিতা উত্তর করিলেন :—

'আমি এতে খুব রাজি। আমিও তোকে এই প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলাম।'

আন্দ্রে—ঠিক অনুমান করিয়াছিল যে, তাহার অন্তর্ধানে ফেলিসিয়ানা, ডন জেরোনিমো এবং তাহার বন্ধুবান্ধবেরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। —এবং এই উদ্বেগ নিবারণের জন্য সে এখন কোন চেষ্টা করিতেছে না বলিয়া, মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিল। তথাপি, সে যে একজন সুন্দরী তরুণীর কক্ষে রহিয়াছে, সেই তরুণীর জন্যই সে ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে, এই সব কথা তাহার নব্যাকে বলিতে বড় একটা গা করিল না। এ কথা কবুল করা বড়ই শক্ত, অথচ কবুল না করাও অসম্ভব।

আন্দ্রে প্রথমে এতদূর গড়াইবে বলিয়া মনে করে নাই। সে মনে করিয়াছিল, একজন নগণ্য বালিকার সঙ্গে গোপনে প্রেম করা—এ ত অতি তুচ্ছ লঘু ব্যাপার। কিন্তু মিলিতোনার সেবাপরতা, আত্মোৎসর্গ ও সাহস মিলিতোনাকে আর এক পংক্তিতে স্থাপন করিয়াছে। যখন মিলিতোনা জানিতে পারিবে যে, আন্দ্রে পূর্বেই আর এক রমণীর সহিত বাগদত্ত, তখন সে কি বলিবে, ফেলিসিয়ানা রাগ করিবে; ইহা অপেক্ষা মিলিতোনা কষ্ট পাইবে এই কথাই আন্দ্রের মনে বেশী জাগিতেছিল। আন্দ্রে মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি করিতে লাগিল। ঘরের ভিতরকার সাদা দেয়াল, জাবড়া রং করা কতকগুলি জনপ্রিয় খোদাই ছবিতে বিভূষিত। ইহাই আন্দ্রেকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

এই সাদাসিধা ঘরটির সহিত ফেলিসিয়ানার আড়ম্বর বহুল কামরা ও খারাপ রুচির তুলনা করিয়া ফেলিসিয়ানার কামরার দেওয়াল ঘড়ি, পর্দাগুলা আন্দ্রের নিকট আরো বেশী হাস্যকর বলিয়া মনে হইল।

এই সময় রাস্তায় একটা টিং টিং টুং টাং শব্দ শোনা গেল।

মিলিতোনা হাতের শিল্প কাগজটা টেবিলের উপর রাখিয়া সহর্ষে বলিল :—'এই যে আমার প্রাতর্ভোজনের খাদ্য-সামগ্রী এল বুঝি। আমি নিচে নেমে যাই।'

এই কথাগুলি বলিয়া মিলিতোনা একটা পুরাতন গীতের একটা চরণ গুনগুন স্বরে গাহিতে গাহিতে অন্তর্হিত

হইল। কয়েক মিনিট পরে আবার ফিরিয়া আসিল। 'তুমি পাখির মত চটুল চটপটে। এই কালো সিঁড়িটা দেখছি এখানে স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে দাঁড়াবে।'

'কেন?'

আন্দ্রে উত্তর করিল, 'কারণ ঐ সিঁড়ি দিয়ে একজন দেবী নেমে গিয়েছিলেন।'

'প্রশংসা থাক্, এখন দুধটুকু আর এই রুটিটা খান দিকি মশায়।'

মিলিতোনা বলিল :—

'ভাল কথা, এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি। যদিও বহির্জগতের সঙ্গে আমার বেশি পরিচয় নেই, তবু আমার বিশ্বাস, তোমাকে যে পোষাকে প্রথম দেখেছিলাম, সেই পোষাকটাই তোমার আসল পোষাক। তোমার হাত দুটি ছোট ছোট ও সাদা; এতেই প্রমাণ হচ্চে তোমার কখন খেটে খেতে হয় নি।'

'মিলিতোনা, তুমি ঠিক বলেছ; তোমাকে আবার একবার আমি দেখব,—আর তুমি কোন বিপদে না পড় এই মনে করেই পোষাক পরেছিলুম। আমি যে কাপড় সচরাচর পরি, সে কাপড় দেখলে শীঘ্রই এ অঞ্চলের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই এই কাপড় পরে আমি জনতার মধ্যে ছায়ার মত মিশে গিয়েছিলাম। ঈর্ষার দৃষ্টিতে না দেখলে আমাকে কেহই চিনতে পারত না।'

লজ্জায় মিলিতোনার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল—মিলিতোনা আবার বলিল :—

'ঈর্ষার দৃষ্টি শুধু নয়, প্রেমের দৃষ্টিও বটে! তোমার ছদ্মবেশ আমাকে এক মিনিটের জন্যও ঠকাতে পারে নি।'

'জুয়াঙ্কো সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি, তা হলে বলবে কি?'

'ওঁচ্‌লো ছোঁড়ার মুখে, আমি কি তোমাকে বলিনি, আমি তোমাকে ভালবাসি?'

জুয়াঙ্কোর সহিত মিলিতোনার গুপ্ত প্রণয় সম্বন্ধে আন্দ্রের যাহা কিছু সন্দেহ ছিল, সমস্তই বাষ্পের মত উঠিয়া গেল।

'তাছাড়া, যদি তোমার শুনতে ভাল লাগে আমার ও জুয়াঙ্কোর ইতিহাস তোমাকে আমি বলব। প্রথমে আমার নিজের কথা থেকে আরম্ভ করা যাক। আমার পিতা সামান্য একজন সৈনিক; যুদ্ধে বীরের মত নিহত হন। আমার মা আমার পিতার বিয়োগে আর অধিক দিন বাঁচলেন না। ১০ বৎসর বয়েসে আমি অনাথা হলেম। আমার সবচেয়ে বেশী অর্থব্যয় হত, প্রতি সোমবারে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাওয়ার দরুণ। সেই তামাসার জায়গায় জুয়াঙ্কো আমাকে দেখেছিল; আর আমাকে দেখে, আমার উপর তার প্রচণ্ড উগ্র, অন্ধকারময় একটা ভালবাসা পড়েছিল। আমার মনে সে কখন কোন কিছুর উদ্রেক করতে পারে নি—তবু সে আমাকে ভালবাসত, অনেক সময় আমার মনে হত, তার ভালবাসার একটু সায় না দিলে, আমার অকৃতজ্ঞতা হবে। জুয়াঙ্কো যখন দেখলে আমি তাকে ভালবাসিনে, তখন তার মনে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ঈর্ষার ভাব এসে পড়ল।

'আমার একটা দৃষ্টিতে, একটা কথায়, সে ঝগড়া করবার একটা ওজর খুঁজে

পেত। সে আমার চারিদিকে একটা বিজনতা গড়ে তুলেছিল এবং এমন একটা গণ্ডীর মধ্যে আমাকে বন্ধ করে রেখেছিল যে, কেহ তা লঙ্ঘন করতে সাহস করত না।'

—'অন্ততঃ শীঘ্র আসবে না বটে; কারণ, যতদিন না তুমি সেরে ওঠ, সে পুলিসের হাত থেকে এড়াবার জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু সে যা হোক এখন বল দিকি তুমি কে?'

—'আমার নাম হচ্ছে, সাল্‌সেডো-র আন্দ্রে। আমার এতটা ধন-ঐশ্বর্য আছে যে, জীবিকার জন্য আমার কোন কাজ করা আবশ্যক হয় না, কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।'

মিলিতোনা একটু উদ্বেগ ও কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল :—

'বেশ রূপবতী, বেশ বেশ-ভূষায় ভূষিতা, বেশ ধনশালিনী তোমার কি কোন 'নব্যা' নাই?'

মিথ্যা কথা বলিতে আন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলাও শক্ত; তাই আন্দ্রে অস্পষ্টভাবে একটা উত্তর দিল।

মিলিতোনা আর কিছু বেশী জেদ করিল না।

'আমাকে একটা কলম আর একতস্তা কাগজ আনিয়ে দিতে পার কি? আমার কতকগুলি বন্ধুকে আমি লিখতে চাই। আমি হঠাৎ অন্তর্ধান করায় তাঁরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আমার বর্তমান অবস্থার কথা ব'লে আমি তাঁদের আশ্বস্ত করতে চাই।'

তরুণী খোঁজ করিয়া কিয়ৎকাল পরে তার ডেক্‌সের দেরাজ হইতে একতস্তা পুরোনো চিঠির কাগজ, একটা ট্যারা-বাঁকা কলম, একটা দোয়াত—যাহাতে কালি শুকাইয়া একেবারে কাঁই হইয়া গিয়াছে—আনিয়া দিল।

কাদার মত কালিতে দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া একটু তরল করিয়া লইয়া,

কাগজখানা কোলের উপর রাখিয়া ডন-জেরোনিমোর নামে এই পত্রখানি লিখিল :—

'আমার অন্তর্ধানে উদ্বিগ্ন হবেন না; একটা দৈব দুর্ঘটনা—যার পরিণাম গুরুতর নহে—কিছুকালের জন্য আমাকে এই গৃহে আটকাইয়া রাখিয়াছে। ঐ দুর্ঘটনার পর আমাকে এই গৃহে উঠাইয়া আনা হয়। আশা করি, আর কিছু দিনের মধ্যেই, ফেলিসিয়ানার চরণ-তলে আমার প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য যাইতে পারিব। ইতি

'সাল্‌সেডো-র আন্দ্রে

একটু চাণক্যনীতি-দুষ্ট এই চিঠিখানায় বাড়ির কোন ঠিকানা ছিল না, ঠিকঠাক করিয়া কোন কথাই বলা হয় নাই, ঘটনাদির উপর পরে আবশ্যকমত একটু রং-চং ফলাইবার অবকাশও রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আন্দ্রে মনে করিল, ইহাতে একটু সময়ও পাওয়া যাইবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর্গমিশিলা ও কোবাকুয়েলার কৃপায় ডন-জেরোনিমো আন্দ্রের সম্বন্ধে সমস্ত খবর যে পূর্বেই পাইয়াছে, এ কথা আন্দ্রে অবগত ছিল না।

ডন-জেরোনিমো আন্দ্রের পত্র পাইয়া ঐ পত্রখানা তাঁহার দুহিতার নিকট লইয়া গেলেন এবং মহা উৎফুল্লভাবে বলিলেন :—

'এই লও ফেলিসিয়ানা, তোমার ভাবী পতির কাছ থেকে পত্র এসেছে—'

ফেলিসিয়ানার পিতা ফেলিসিয়ানার হাতে যে পত্রখানি দিলেন, ফেলিসিয়ানা তাহা নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিল। কাগজের কোথাও একটু চেক্‌-নাই দেখিতে না পাইয়া বলিল :—

'চিঠিতে লেফাফা নাই, শুধু একটা গালার টিপ্‌ দিয়া বন্ধ করা! ভদ্র আচরণের খুবই বিরুদ্ধ! চিঠিটা পড়া হইয়া গেলে প্রাভোর একটি সম্ভ্রান্ত যুবককে কথায়-কথায় বলিলেন, 'এ-রকম বিশ্রী কাগজ কেহ কখন মনে ধারণা করতেও পারে কি, স্যার এড্‌ওয়ার্ডস?'

'অস্ট্রেলিয়ার বুনো-লোকেরাও ওর চেয়ে ভাল কাগজ তৈরী করতে পারে। এটা শিল্পের নিতান্ত শৈশবাবস্থার নমুনা। লণ্ডনে এই কাগজে চর্বির বাতিও কেউ মুড়বে না।'

ফেলিসিয়ানা বলিল :—'স্যার এড্‌-ওয়ার্ডস, আপনি ইংরেজী বলুন, আপনি ত জানেন, আমি ইংরেজী বুঝতে পারি।'

—'না, আপনার যে ভাষা সেই স্পেনীয় ভাষাটাই আমি ভাল করে শিখতে চাই।'

এই রসিকজন-সুলভ চাটুবচনে ফেলিসিয়ানার ঠোঁটে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। বস্তুতঃ এই ইংরাজ যুবকের কথাবার্তা ফেলিসিয়ানার বড় ভাল লাগে।

যদি ফেলিসিয়ানা লর্ড যুবকটির প্রসাধনের টেবিলটা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে একেবারেই বর্শীভূত হইয়া পড়িত। তাহার যে সব ভীতিজনক অদ্ভুত আকারের বাক্‌স ছিল, সেরূপ আকারের বাক্‌স, অস্ত্রচিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, পায়ের কড়া-ছেদক চিকিৎসকদের বাক্‌স সমস্ত একত্র করিলেও মেলে না। আন্দ্রে

বড় লোকের মত জীবন যাপনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই উচ্চ আদর্শের কাছ দিয়াও যাইতে পারে নাই।

'বাবা, যদি আমরা আন্দ্রেকে দেখতে যাই তা-হলে স্যার এড্ওয়ার্ড্স আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

কন্যার এই কথায় সামাজিক আব্রু-রক্ষার একটু বাড়াবাড়ি দেখিয়া, জেরোনিমো উত্তর করিলেন :—'তোর যদি মনে হয়, আন্দ্রেকে দেখতে যাওয়া তোর পক্ষে দস্তুরমত কাজ হবে না, তা-হলে আমি বরং একলাই যাব, আর আন্দ্রের ঠিক খবরাখবর সমস্তই তোকে এসে বলব।'

ফেলিসিয়ানা আবার বলিল—'যাকে ভালবাসা যায় তার জন্য কিছু আত্মত্যাগ করা আবশ্যক।'

ফেলিসিয়ানা, কে জানে কেন খুব আড়ম্বরের সহিত জাঁকালো রকমের সাজগোজ করিল। ফেলিসিয়ানা মনে করিয়াছিলেন, এইরূপ জাঁকালো সাজ-সজ্জা দেখিয়া আন্দ্রে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে। আন্দ্রের হৃদয়ও তাহার প্রতি আরও সহজেই আকৃষ্ট হইবে।

ফেলিসিয়ানা তাহার বড় আয়নায় একবার শেষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল এবং সন্তোষসূচক মৃদু মধুর হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল।

স্যার এডওয়ার্ড্স্ও হাল-ফ্যাসানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ফেলিসিয়ানাকে স্বকীয় বাহু-অবলম্বন দিলেন।

এরূপ মানানসই যুগলকে রাস্তা দিয়া পাশাপাশি চলিতে কেহ কখন দেখে নাই। উভয়ই যেন উভয়ের জন্য গঠিত; উভয়ের সাজ-সজ্জায় উভয়েই বিস্ময়মুগ্ধ।

অবশেষে উহারা 'পোভারের' রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল।

কুলমান-গর্বিতা ফেলিসিয়ানা যে বাড়িটাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং যাহার ভিতর এমন একটি নারী-রত্ন ছিল যাহা বড় বড় হোটেল খুঁজিলেও পাওয়া যায় না—সেই বাড়ির গলি-পথের মধ্যে উহারা তিন জন ঢুকিয়া পড়িল।

এই গলি-পথ পার হইবার সময় ফেলিসিয়ানা অতি সাবধানে নিজ কাপড়ের খুঁট হাতে করিয়া চলিয়াছিল।

সিঁড়ির কাছে আসিয়া ফেলিসিয়ানা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, তাই সে আবার স্যার এডওয়ার্ড্স্এর বাহু-অবলম্বন প্রার্থনা করিল।

একজন নিকট-বাসী অনাহূত কার্যোৎসাহী লোক আসিয়া রুজুটা তুলিয়া সিঁড়ির মুখ খুলিয়া দিল। এইবার বিপদ-সঙ্কুল আরোহণ সুরু হইল। 'তোমরা কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে ডন-জেরোনিমো যখন বলিলেন—"আমরা শান্ত-শিষ্ট লোক", তখন দরজা খুলিয়া গেল। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, আন্দ্রে প্রথমে স্যার এডওয়ার্ড্স্কে দেখিতে পাইল—তিনিই অগ্ররক্ষী হইয়া আসিয়াছিলেন। তারপর প্রবেশ করিলেন ডন-জেরোনিমো; —সর্বশেষে সাজ-সজ্জায় অতিসজ্জিতা ফেলিসিয়ানা।

সব চেয়ে সেরা আতস্-বাজির মত জ্বলিয়া উঠিয়া চোখ ঝল্সাইয়া দিবেন

মনে করিয়া ফেলিসিয়ানা সকলের শেষে দেখা দিলেন।

ফেলিসিয়ানা যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ নাটকীয় ধরনের খুব একটা চমক লাগাইতে পারিল না।

আন্দ্রের চোখ ঝলসিয়া যায় নাই শুধু নহে, তাহার হৃদয় একটা বিশুদ্ধ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। বরং তাহার মুখে একটা বিরক্তি ভাব প্রকাশ পাইল।

এই তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া মিলিতোনা উঠিয়া দাঁড়াইল, জেরোনিমোকে একটা চৌকিতে বসিতে বলিল এবং আর একটা চৌকি ফেলিসিয়ানাকে এগাইয়া দিবার জন্য আলদজাকে ইসারা করিল।

পাছে ময়লা হয় যেন এই ভয়ে ফেলিসিয়ানা স্বীয় পরিচ্ছদের প্রান্তভাগটা একটু গুটাইয়া লইয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া একটা বেতের চৌকিতে বসিয়া পড়িল এবং রুমাল দিয়া আপনাকে বাতাস করিতে লাগিল।

মিলিতোনা একটা কালো স্পেনীয় ঢং-এর রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল; তাহার সুন্দর বাহুদ্বয় অনাবৃত ছিল। ইহার পাশাপাশি ফেলিসিয়ানার আড়ম্বরময় সাজ-সজ্জায় কুরুচি আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ফেলিসিয়ানাকে দেখিলে মনে হয়, রবিবারের বেশভূষায় সজ্জিতা যেন একজন সামান্য ইংরেজ-পরিচারিকা; আর মিলিতোনা যেন এক-জন ছদ্মবেশী রাজকন্যা।

মিলিতোনা মনে মনে ভাবিল, 'এই রমণীটি না জানি কে! ইনি কি আন্দ্রের ভগিনী? না, তা-হলে এঁর মুখে এই-রকম উদ্ধতভাব থাকত না।'

জেরোনিমো পালঙ্কের কাছে গিয়া একটু স্নেহের স্বরে বলিলেন :—

'ভাল, আন্দ্রে! তুমি ত বেশ বেমা-লুম পালিয়েছিলে, এখন আছ কেমন বল দিকি?'

আন্দ্রে উত্তর করিল, 'শ্রীমতীর সেবাযত্নে একরকম ভালই আছি।'

ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের কথায় বাধা না দিয়া বলিল :—

'উনি যেরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার পুরস্কার স্বরূপ একটা কিছু জিনিস এঁকে উপাহার দেওয়া যাক—একটা সোনার ঘড়ি, একটা আংটি কিংবা ওঁর পছন্দমত আর কোন অলঙ্কার।'

ফেলিসিয়ানা যে ইংরাজী জানিত তাহা ভুলিয়া গিয়া, স্যার এডওয়ার্ডস অর্ধস্ফুটস্বরে এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না:—'শি ইজ এ ভেরী প্রেটী গার্ল' অর্থাৎ তরুণীটি বড়ই সুশ্রী।

শুষ্ক কণ্ঠে আন্দ্রে উত্তর করিল :—

'এরূপ সেবা-যত্ন মূল্যদিয়ে পাওয়া যায় না।'

জেরোনিমো আবার বলিলেন :—

—'তা নিশ্চয়ই। মূল্য দেবার কথা কে বলছে? এ শুধু একটা কৃতজ্ঞতার স্মৃতি: এই মাত্র।'

এই দরিদ্র গৃহের যে সব অভাব-ত্রুটি ছিল, তাহা এক নজরে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ফেলিসিয়ানা আবার বলিল :—

"আন্দ্রে, এখানে তোমায় থাকতে কখনই ভাল লাগবে না।"

—"এখানে ওঁর খুবই অনুগ্রহ। কষ্ট হচ্ছে ব'লে উনি কখনই আক্ষেপ প্রকাশ করেন নি।" এই কথা বলিয়া মিলিতোনা জানলার ধারে প্রস্থান করিল। ফেলিসিয়ানাকে দুর্বিনীত বাক্য প্রয়োগের পূর্ণ অবসর দিবার জন্যই মিলিতোনা তাহাকে মৌনভাবে যেন এই কথাগুলি বলিল :—

"তুমি আমার বাড়ীতে আছ, আমি তোমাকে তাড়িয়ে দেব না—তাড়িয়ে দিতে পারিও না। কিন্তু তোমার অপমান-সূচক বাক্যগুলা আর গৃহকর্ত্রীর ধৈর্য—এই দু'য়ের মধ্যে ত একটা সীমা-রেখা আছে।"

তাহার পর একটা নিস্তব্ধতা আসিল!

এদিকে মিলিতোনা মনে মনে ভাবিতেছিল :—

"এ ভারি অদ্ভুত! আমি যে কাউকেই কখন বিষ-দৃষ্টিতে দেখি নি, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি আমার ঘরে যখনই প্রথম পদক্ষেপ করেছে তখন থেকেই—একজন অজ্ঞাত শত্রু কাছে এলে যে রকম হয়—আমার বুকে সেই রকম একটা কাঁপুনি উপস্থিত হয়েছে। আমার কিসের ভয়? আমি বেশ জানি, আন্দ্রে একে ভালবাসে না। আন্দ্রের চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। স্ত্রীলোকটা দেখতে সুশ্রী নয়,—আর অতি নির্বোধ।

পক্ষান্তরে, ফেলিসিয়ানাও ঐ ধরনের কথা মনে মনে ভাবিতেছিল। কোন একটা খুঁৎ বাহির করিবার জন্য ফেলিসিয়ানা, মিলিতোনার রূপলাবণ্যের বিশ্লেষণ করিতেছিল। কোন খুঁৎ পাইল না বলিয়া তাহার বড় আপশোষ হইল। মিলিতোনার বদ্ মেজাজটা আরও বৃদ্ধি পাইল, এবং বেশ একটু কর্কশস্বরে বেচারা আন্দ্রেকে এই কথাগুলা বলিল :—

"যদি তোমায় ডাক্তার কথা কইতে বারণ ক'রে থাকে তা-হলে তোমার দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ আমাদের কাছে খুলে বল: কারণ আমরা যা জানতে পেরেছি, তা একটু ঘোলাটে রকমের, তেমন স্পষ্ট নয়।"

ইংরেজ বলিল :—

—"হাঁ হাঁ—তোমার ঔপন্যাসিক ঘটনার বিবরণটা বলতে চেষ্টা কর।"

জেরোনিমো পিতৃবৎ বাৎসল্যসহকারে এই কথায় বাধা দিয়া বলিলেন :—

—"তোমরা ওকে কথা কওয়াতে চাচ্ছ, কিন্তু দেখছনা এখন কতটা দুর্বল!"

—"ওতে উনি বেশী কিছু শ্রান্ত হবেন না, আর আবশ্যক হ'লে শ্রীমতী ওঁকে সাহায্য করবেন। শ্রীমতী ত সমস্ত ঘটনাই জানেন।"

আন্দ্রে বলিল :—

"আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপলো যে, আমি শিল্পজীবীর ছদ্মবেশে সহরের পুরাতন অঞ্চলটা একবার ঘুরে আসি, আর ইতরসাধারণের শুঁড়ীখানা ও নাট্যশালায় সজীব ভাব খানা একটু উপভোগ ক'রে আসি। তারপর এই রাস্তা দিয়ে যখন আসছিলেম, একজন গোম্‌সামুখো সেরিনেড্-গায়কের সঙ্গে দেখা হ'ল।

সে একটা ছুতো ক'রে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে; তার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হল, সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ন্যায়-নিয়মানুসারে, আমাকে ছোরার আঘাতে সে আহত করলে। আমি সেই আঘাতে ধরাশায়ী হলেম। শ্রীমতী তাঁর বাড়ির সামনে অর্ধ-মৃত অবস্থায় আমাকে দেখতে পেয়ে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন।"

—"কিন্তু তুমি এ বেশ জেনো আন্দ্রে, এই ঘটনাটা খুব ঔপন্যাসিক ধরনের, এবং ওতে একটু কবিত্বের রং চড়ালে, দিব্যি একটা করুণরসাত্মক বিষয় হয়ে উঠবে। একজন সুন্দরীর গৃহ-গবাক্ষের নীচে দুই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীর পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটল...

মিলিতোনা গম্ভীরভাবে বলিল :—

—"দেখুন, আর দুই আঙ্গুল নীচে হলেই, ছোরার ফলাটা হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করত।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু যা চিরকাল হয়ে আসছে—এই সব ছোরা একটু পিছলে গিয়ে শুধু একটা সুন্দর আঁচড় কেটেই ক্ষান্ত হয়—"

তরুণী উত্তর করিল—"আর যাই হোক, আপনার দেখছি এই আঘাত সম্বন্ধে বড় একটা দরদ নেই।"

—"আমার সম্মান রক্ষার জন্য ত এই আঘাতটা পাওয়া হয় নি; তাই তোমার এতে যতটা দরদ হবে আমার তা হবে না। তবু দেখ, আমি তোমার আহতকে দেখতে এসেছি। তুমি যদি ইচ্ছে কর, আমরা দু'জনে পালা করে আহতের শুশ্রূষা করব। সে বেশ হবে।"

মিলিতোনা উত্তর করিল—"এ পর্যন্ত আমি একলাই ওঁর শুশ্রূষা করেছি—এখনও করব।"

তোমার পাশে, আমাকে লোকে একটু উদাসীন বলে ঠাওরাতে পারে। কিন্তু একজন পুরুষকে রাস্তা থেকে তুলে নিজের বাড়িতে আনা—এমন কি, বুকে একটা সামান্য আঁচড় লাগার জন্যও আনা —আমার মতে শিষ্টাচার নয়।"

—"লোকনিন্দার ভয়ে আপনি কি অর্ধ-মৃত অবস্থায় ওঁকে রাস্তায় ফেলে আসতে পারতেন?"

—"সবাই ত তোমার মত স্বাধীন নয়; তাদের ঘর-সংসার সামলাতে হয়; গেরস্তের মত থাকতে হয়। যাদের একটু মানমর্যাদা আছে, তারা সহজে তা হারাতে চায় না।"

মিলন-কামী জেরোনিমো বলিলেন :—

—"না না, ফেলিসিয়ানা, তুমি যে সব কথা বলচ তাতে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখছি; তুমি অনর্থক রাগ করচ। ও-সমস্তই আকস্মিক ঘটনা। এই দুর্ঘটনা-টার পূর্বে আন্দ্রে শ্রীমতীকে কখন দেখে নি। মিছামিছি ওর উপর তুমি সন্দেহ করোনা।"

পিতার কথায় দৃকপাত না করিয়া ফেলিসিয়ানা গর্বিতভাবে আবার বলিল :—

—"বাগদত্তা রমণী ত আর উপপত্নী নয়।"

এই শেষ অপমান-সূচক বাক্যে, মিলিতোনার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। একটা

তরল জ্যোতিতে তার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল, বুক ফুলিয়া উঠিল; বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু মিলিতোনা সামলাইয়া লইল। সে কোন উত্তর করিল না, কেবল ফেলিসিয়ানার প্রতি একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

—"এসো বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। এস্থান আমাদের নয়। একজন পতিতার গৃহে আর আমি ক্ষণমাত্রও থাকতে পারব না।"

আন্দ্রে মিলিতোনার হস্তধারণ করিয়া বলিল :—"ফেলিসিয়ানা, শুধু এই কারণেই যদি এখান থেকে তোমার চলে যেতে হয়—তা-হলে একটু সবুর কর। ডন-ফেলিসিয়ানার সঙ্গে আমার ধর্ম-পত্নী শ্রীমতী মিলিতোনার পরিচয় করে দিচ্ছি। এখন বোধ হয় এখানে একটু বিলম্ব করলে কোন ক্ষতি হবে না। আমার দ্বারা তোমার কোন অসুবিধা হলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।"

জেরোনিমো বলিয়া উঠিলেন :—"কি! আন্দ্রে তুমি বলছ কি? ১০ বৎসর থেকে তোমার সঙ্গে বিবাহ হবে বলে ঠিকঠাক হয়ে আছে! তুমি পাগল হলে নাকি!"

আন্দ্রে বলিল :—"আমি বুঝেসুঝেই এই কথা বলচি। আমি বেশ বুঝতে পারচি, আমি আপনার কন্যাকে কখনই সুখী করতে পারব না।"

জেরোনিমো আবার বলিলেন :—

—"ধন-ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তোমাদের এমন মিল হয়েছিল·· "

আন্দ্রে উত্তর করিল :—

"হৃদয়ের মিল অপেক্ষা ঐ মিলটাই বেশী হয়েছিল। আমার মনে হয় না, ডনা-ফেলিসিয়ানা আমাকে না পেলে বেশী কিছু কষ্ট অনুভব করবেন।"

ফেলিসিয়ানা উত্তর করিল :—

—"তুমি খুব বিনয়ী; আমার কষ্ট হবে না, তাই এখন মনে কর। আর কিছু না হোক, তা-হলে অনুতাপের হাত থেকে এড়াতে পারবে। বিদায়, ঘরকন্না পেতে সুখী হও। শ্রীমতী, তোমাকে নমস্কার। এসো বাবা; স্যার এডওয়ার্ডস আমাকে তোমার বাহু-অবলম্বন দেও।"

ইংরেজ যুবক এক বাহুর দ্বারা ফেলিসিয়ানার কটিদেশ বেশ শোভনভাবে বেষ্টন করিল এবং উভয়ে বুক ফুলাইয়া সগর্বে বাহির হইয়া পড়িল।

ফেলিসিয়ানাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার সময়, স্যার এডওয়ার্ডস জাগ্রত অবস্থায় নানা সুখের স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন।

এদিকে ফেলিসিয়ানাও এইরূপ নানা প্রকার সুখের কল্পনায় গা ঢালিয়া দিয়া-ছিল; যে ঘটনাটা কিঞ্চিৎ পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাতে অবশ্য ফেলিসিয়ানা বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছে। আন্দ্রে তাহার হাত-ছাড়া হওয়ায় তাহার যে বেশী কিছু দুঃখ হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু আন্দ্রে প্রকাশ্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তাহার আত্মাভিমানে একটু খোঁচা লাগিয়াছিল।

ফেলিসিয়ানা, স্যার এডওয়ার্ডসএ স্বীয় আদর্শ মূর্তিমান দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিল, সে কখনও আন্দ্রেকে ভালবাসে নাই।

যেরূপ ইংরেজ তার স্বপ্নের জিনিস ছিল, স্যার এডওয়ার্ডস ঠিক সেইরূপ ইংরেজ।

ইংরেজ যুবকটি সংকেত-স্থানে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে কেমন সময়-নিষ্ঠ, গণিতের কষা অঙ্কের মত কেমন ঠিকঠাক নির্ভুল। খুব ভাল-সময়-রাখা ক্রনমেমর ঘড়ীকেও তার কাছে হার মানিতে হয়।

উপরোক্ত যুগলটি—যারা উভয়ে উভয়ের মনের মত গঠিত—উহাদের এখন পথ ধরিয়া চলিতে দেও; এখন এস, পোভার রাস্তায় গিয়া মিলিতোনা ও আন্দ্রে কি করিতেছে দেখা যাক্।

ফেলিসিয়ানা, ডন-জেরোনিমো ও স্যার এডওয়ার্ডস চলিয়া যাইবার পর মিলিতোনা আন্দ্রের স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু এ অশ্রুপাত আনন্দের অশ্রুপাত: সেই অশ্রুবিন্দুগুলি মুক্তার ন্যায় পেলব গালদুটি দিয়া গড়াইতে লাগিল।

রাত্রি সমাগত হইল। মিলিতোনা আন্দ্রের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া আনন্দে বিভোর হইল।

আমাদের বন্ধু জুয়াংকো একটু আমাদের নজরের আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে এখন খুঁজিয়া বাহির করা যাক; কেননা সে মিলিতোনার ঘর হইতে এরূপ ক্রোধান্ধ হইয়া বাহির হইয়াছিল যে, তাহার সেই ক্রোধ কতকটা উন্মাদের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিড়বিড় করিয়া অভিসম্পাৎ করিতে করিতে, পাগলের মত মুখভংগী করিতে করিতে, অজ্ঞাতসারে সে মাঠ-ময়দান পার হইয়া একেবারে হিষেবরোর বন্দরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।

দুই এক ঘণ্টা পথ হাঁটিয়া, চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত অসাধারণ বলিষ্ঠ জুয়াংকো একটা গর্তের উপরকার মাটির উপর উপুড় হইয়া,—কনুইয়ের উপর ভর দিয়া, থুৎনি ও গাল দুই হাতে ধরিয়া সম্পূর্ণ অবসন্ন ও নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল।

জুয়াংকো দেখিল,—তাহার নিকট দিয়া গরুর গাড়ি সারি সারি চলিয়াছে—রাস্তার ধারে একটা শয়ান শরীর দেখিয়া গরুগুলি ভড়কাইয়া একপাশে সরিয়া যাওয়ায়, গাড়োয়ানেরা তাহাদের পৃষ্ঠে অঙ্কুশের খোঁচা দিতেছে। খড়ের বোঝাই লইয়া গাধাগুলি চলিয়াছে। দসুর মত চেহারা কৃষকেরা, ঘোটকপৃষ্ঠে গর্বিত-ভাবে উপবিষ্ট হইয়া জঙ্ঘা ও জিনে বাঁধা বন্দুকের উপর হাত রাখিয়া চলিয়াছে।

জুয়াংকো তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে-ছিল।

এখন হইতে সে কি করিবে?

যাহা হৃদয় স্বীকার করিতে কিছু-তেই রাজি হইতেছিল না, সেই মারাত্মক সত্যটা স্পষ্টরূপে হৃদয়ংগম করিবার জন্য জুয়াংকো বারম্বার এই কথা আবৃত্তি করিতেছিল :—'সে আমাকে ভালবাসে না, সে আর একজনকে ভালবাসে। ইহা কি সম্ভব? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

আমাকে যদি সে ভাল না বাসে সে যেন আর কাহাকেও না ভালবাসে!

আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারতেম; কিন্তু সে আমাকে চলে যেতে বললে, আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না বললে; আমি যেন তাকে রাহুর মত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছি, সে আমার উৎপীড়ন আর সহ্য করতে পারে না! যাই হোক্, আমি যখন চলে এলেম তখন সে একলা ছিল। হতভাগ্য আমি—আমার মত এই তিক্ত-মধুর রস ইতিপূর্বে আর কেহই আস্বাদ করে নি! এই অমূল্য নিধি আমার হয় নি সত্য, কিন্তু আর কেহও তার চাবি পায় নি!

আর এখন—এখন আমার সব শেষ হ'য়ে গেছে; আর কোন আশা নেই! যখন সে আর কাহাকে ভালবাসে নি, তখন সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; কিন্তু এখন, আর একজনের উপর তার ভালবাসা পড়ায় আমার প্রতি তার বিরাগ না জানি আরও কত বৃদ্ধি হয়েছে! যাকে এই দণ্ডেই হত্যা করা উচিত, তাকে কি না আমি অনায়াসে ছেড়ে দিলেম!

"ধিক্ এই হাত, আমার এই অদক্ষ অনিপুণ হাত,—তোর কর্তব্য তুই করতে পারলি নে—এখন তার শাস্তি ভোগ কর!"

এই কথাগুলি বলিয়া জুয়াঙ্কো নিজের ডান হাতে এমন এক কামড় দিল যে, রক্ত ঠিক্‌রিয়া বাহির হইবার মত হইল।

—"যখন ও ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে তখন আর কিছুই বাকি রাখব না। কিন্তু আমি যদি ওকে হত্যা করি, তা-হলে মিলিতোনা আমার আর মুখ দর্শন করবে না। যে দিক থেকেই দেখা যায়, মিলিতোনা আমার হাত-ছাড়া হ'য়ে গেছে! আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে এই রকম শাস্তি দেওয়া হচ্ছে! স্পেনের কত সুন্দরী আমার ভালবাসা পাবার জন্য লালায়িত। আমি যখন রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করি, তখন কত সুন্দরীর হৃদয় আবেগে স্পন্দন ক'রে ওঠে; কত ধব্‌ধবে সাদা হাত বন্ধুতার সঙ্কেত ক'রে আমাকে অভিবাদন করে। কিন্তু সে সব আমি অবজ্ঞা করেছি। তাদের আদর যত্নে আমি ভ্রূক্ষেপ করি নি। হা ভগবন্! হা ভগবন্! এখন করি কি? আমাকে সে হতশ্রদ্ধা করে। একথা মনে হ'লে, রাগে উন্মাদ হয়ে যেতে হয়!"

এই কথা বলিয়া এক লাফে সে উঠিয়া পড়িল এবং মাঠ-ময়দানের মধ্য দিয়া আবার চলিতে লাগিল।

বুদ্ধি লুপ্ত-প্রায়, চোখ কোটরস্থ, মুষ্টি সঙ্কুচিত—এইরূপভাবে জুয়াঙ্কো সমস্ত দিন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বস্তু-সমূহের আকার পরস্পর মিশিয়া যাইতে লাগিল, তাহার কপালের রগ্ টানিয়া ধরিল। তাহার চোখ যেন আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে; এবং তাহার মুখ বাহিয়া ঘাম ঝরিতে থাকা সত্ত্বেও, জুন মাসের প্রখর সূর্যের উত্তাপ সত্ত্বেও, তাহার শীত করিতে লাগিল।

জুয়াঙ্কোর বাহুতে আর বল ছিল না। জুয়াঙ্কো পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

একটা পান্থশালায় আসিয়া সে একটা শয্যা চাহিয়া লইল, এবং সেই শয্যায় শুইয়া জড়পিণ্ডের মত নিশ্চল হইয়া

অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল, এবং তাহার শারীরিক যন্ত্রণা হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইল। ১২ ঘণ্টা দীর্ঘ-নিদ্রার ফলে জুয়াংকো অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। যখন উঠিল তখন আর জ্বর নাই, মাথা-ব্যথা নাই—আছে কেবল দুর্বলতা। চলিবার সময় পা টলে, চোখে আলো সহ্য হয় না, একটু আওয়াজেই মাথা ঘুরিয়া যায়; তার বোধ হইতে লাগিল,—যেন তার অন্তঃকরণটা, তার অন্তরাত্মাটা একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে; তার ভিতরে যেন একটা মস্ত ভাং-চুর হইয়া গিয়াছে; যেখানে প্রেম গজাইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে একটা গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে—সে গহ্বর আর কিছুতেই পূরণ হইবার নহে।

সে এই পান্থশালায় একদিন মাত্র ছিল। একটু ভাল হইয়াই সে একটা ঘোড়া যোগাড় করিল, এবং সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মাদ্রিদ্-অভিমুখে যাত্রা করিল।

জুয়াংকো যাহাকে ভালবাসিত, আন্দ্রে তাহাকে পাইয়াছে—ইহাই আন্দ্রের পক্ষে যথেষ্ট। টিক্‌টিকিরা যে জুয়াংকোর পিছুপিছু ফিরিতেছে, তাহাও আন্দ্রে জানিত না।

আর্গম্‌শিল্লা ও কোবাকুয়েল্লা অপরাধীকে গিরিফ্‌তার করিবার জন্য বাহির হইয়াছে; এবং খুব সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিতেছে। একজন গোয়েন্দা উহাদিগকে বলিয়াছিল যে, জুয়াংকোকে ষাঁড়ের আড্ডায় প্রবেশ করিতে সে দেখিয়াছে। তাই, সেইদিকে উহারা চলিল।

যাইতে যাইতে আর্গম্‌শিল্লা তার জুড়িদারকে বলিল :—

"দেখ ভাই কোবাকুয়েল্লা, একটু বিবেচনা ক'রে চোলো; তোমার বীরত্ব একটু কমিয়ে এনো, তুমি ত জান সেই পালোয়ানটার হাত কেমন সাফাই। তুমি পুলিসের মধ্যে সব চেয়ে একজন বড় লোক,—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুর মত লোকে তোমার গায়ে আঁচড় কাট্‌বে—সেটা ত ভাল হবে না। তাই একটু গা বাঁচিয়ে চলতে হবে, ভায়া!"

"সে বিষয়ে আমি খুবই চেষ্টা করব —তোমার বন্ধুকে তা আর বলতে হবে না। নিতান্ত দরকার না হ'লে, আমি সাহস দেখাব না। ভদ্রতায় যতদূর হয়, প্রথমে তাই করতে হবে।"

জুয়াংকো বাস্তবিকই সার্কাস-ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। যে সময় সে অঙ্গনটা পার হইতেছিল, সেই সময় আর্গম্‌শিল্লা ও কোবাকুয়েল্লা একদল পাহারাওয়ালা সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোবাকুয়েল্লা আদব-কায়দা-দুরস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া খুব ভদ্রতার সহিত জুয়াংকোকে জানাইল যে, উহাকে এখন জেলখানায় যাইতে হইবে।

জুয়াংকো অবজ্ঞা সহকারে কাঁধ ঝাঁকাইয়া চলিতে লাগিল; থামিল না।

পুলিস কর্মচারীর সঙ্কেতে দুইজন পাহারাওয়ালা বৃষ-মল্লের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; কিন্তু বৃষ-মল্ল আস্তিনের ধূলা-কণার ন্যায় উহাদিগকে এক ঝাঁকানিতে ঝাড়িয়া ফেলিল।

তখন সমস্ত পাহারাওয়ালার দল জুয়াংকোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জুয়াংকো উহাদের চারিটাকে ধরাশায়ী

করিল. চারিটাকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিল। কিন্তু সংখ্যার বল বেশী হওয়ায় জুয়াংকো একা আর পারিয়া উঠিল না। জুয়াংকোর মুখ লাল হইয়া উঠিল; আস্তে আস্তে কৌশল করিয়া বৃষভদের ঘরের নিকট আসিল এবং হাতের এক ঝাঁকনি দিয়া বৃষভ-গৃহের দরজা খুলিয়া ফেলিল; এবং ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সেইখানে রহিল।

আক্রমণকারীরা জোর করিয়া সেখান হইতে উহাকে বাহির করিবার জন্য দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল; দরজাটা ভাঙ্গিয়া গেল।

জুয়াংকো এখন মুক্তির জন্য তেমন লালায়িত ছিল না—তাই উহা লইয়া আর বেশী বিবাদ করিল না; আর্গমুশিল্লা ও কোবাকুয়েল্লার হাতে সে আত্মসমর্পণ করিল। উহারা জুয়াংকোকে সসম্মানে সহরের জেলখানায় লইয়া গেল।

যখন দরজার তালার চাবি লাগাইবার কেঁচ্‌কেঁচানি শব্দ থামিয়া গেল, তখন জুয়াংকো তাহার খাটিয়ায় লম্বা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল:—"যদি তাকে আমি খুন করতেম! যে দিন তার বাড়িতে আন্দ্রেকে দেখেছিলেম সেই দিনই তাকে খুন করা উচিত ছিল। তা-হলে পুরোপুরি শোধ তোলা হ'ত; তার সামনে তার প্রেয়সীর বুকে ছোরা বসিয়ে দিলে, তার নিশ্চয়ই ভয়ানক যন্ত্রণা হ'ত! কিন্তু সে দুর্বল, রোগশয্যায় আবদ্ধ, সে কখনই আত্মরক্ষা করতে পারত না; সুতরাং তাকে আমি মারতেম না। ও রকম অপরাধ আমি কখন করতেম না। মিলিতোনাকে খুন ক'রে আমি পাহাড় পর্বতে পালিয়ে যেতেম কিংবা পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে শাস্তি বুক পেতে নিতেম। এখন, না এ দিক্, না ও দিক্!

আমায় বাঁচতে হ'লে, তার মরা দরকার; আর তার বাঁচতে হ'লে, আমার মরা দরকার। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

কিন্তু কি! আমি তার অমন সুন্দর বক্ষকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেল্‌ব? আমার ছোরার ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলাটা তার হৃদয়কে অনুভব করাব? আর তার সেই ধব্‌ধবে সাদা রং-এর উপর দিয়ে তার সুন্দর সিন্দূরবর্ণের রক্ত গড়িয়ে পড়্‌বে—আর আমি তা স্বচক্ষে দেখব?

না, না, এরূপ বর্বরতা আমি কখনোই করব না।

জেলখানায় জুয়াংকোর মনে এই ধরণের নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা চলিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে আন্দ্রে বেশ একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। সে শয্যা হইতে উঠিয়াছিল, এবং মিলিতোনার বাহুর উপর ভর দিয়া ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, জানালার কাছে গিয়া হাওয়া খাইত। শীঘ্রই এতটা বল লাভ করিল যে, নীচে নামিয়া আসিতে পারিল; এবং আসন্ন বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া নিজ গৃহে উপনীত হইল।

এদিকে স্যার এড্‌ওয়ার্ড্‌স্-এর বিবাহ বিঘোষিত হইল। স্যার এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ ফেলিসিয়ানার পাণিপ্রার্থী হইয়া দস্তুরমত ডন-জেরোনিমোর অনুমতি চাহিয়াছিলেন। ডন-জেরোনিমোও আগ্রহের সহিত

উহার অনুমোদন করেন। ফেলিসিয়ানার অন্তরাত্মা এক্ষণে অসীম আনন্দ-সাগরে সাঁতার দিতে লাগিল।

এদিকে মিলিতোনাও যার পর নাই সুখী হইলেও, তাহার একটু আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তাহার মনে হইল, সে যে শ্রেণীর লোক, সম্ভ্রান্ত-বংশীয় আন্দ্রেকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শোভা পায় না।

সে মনে মনে ভাবিল :—

"আমার ইচ্ছা নয়—আন্দ্রে আমার জন্য লজ্জা পায়। আমি লেখা-পড়া শিখব, বই পড়ব, আমি আপনাকে তার যোগ্য ক'রে তুলব। আমার যে একটু রূপ আছে তা আমার বিশ্বাস হয়, আন্দ্রের চোখের দৃষ্টিতেই আমি তা বুঝতে পারি। আর, জুয়াঙ্কো,—

"তার কোন ভয় নেই। জুয়াঙ্কো এখন জেল-খানায়। আন্দ্রেকে হত্যা করেছে ব'লে তার নামে নালিশ রুজু হয়েছে।

জুয়াঙ্কোর মোকদ্দমার অবস্থাটা একটু খারাপ দিকেই গেছে। সেদিনকার নৈশ যুদ্ধটা আদালতে, ঔৎ-পাতিয়া খুন করা অথবা নরহত্যার চেষ্টা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। লোকটা যে মরে নাই,—তার কারণ জুয়াঙ্কোর হত্যা করিবার যে ইচ্ছা ছিল না, তাহা নহে। এইরূপ ভাবে বিচার করায় ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে, আন্দ্রে আদালতে এই ব্যাপারের যেরূপ কৈফিয়ৎ দিল, তাহাতে গুপ্তহত্যার স্থলে শেষে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বলিয়াই সাব্যস্ত হইল। তা-ছাড়া আঘাতটা গুরুতর হয় নাই, আন্দ্রে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে; আর এই বিবাদে, গোড়ায় আন্দ্রেরই দোষ ছিল; আন্দ্রের সৌভাগ্য যে ইহার পরিণামটা একটু আঁচড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে, আর বেশী দূর গড়ায় নাই। গুপ্তহত্যার অভিযোগে হত্যাকারী যাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত, সেই ব্যক্তি যদি সুস্থ-সবল থাকে এবং সে নিজে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়া দুইকথা বলে, তাহা হইলে সেই মোকদ্দমা কখন বেশীক্ষণ টিঁকিতে পারে না। সুতরাং জুয়াঙ্কো কিয়ৎকাল পরেই খালাস পাইল। তবে জুয়াঙ্কোর এই দুঃখ, যে তার পরম শত্রু, যাহার নিকট হইতে সে কোন উপকার পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহারই কথায় কিনা সে মুক্তি লাভ করিল!

জেলখানা হইতে বাহির হইয়া, মুখ অন্ধকার করিয়া সে এই কথা বলিল :—

"এখন আমি এই উপকারে আবার আবদ্ধ হ'য়ে পড়লেম; এ কি দুর্দৈব! আমি এখন যদি তার কোন অনিষ্ট করি, তা-হলে আমার মত নরাধম কাপুরুষ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এর চেয়ে যদি আমার নির্বাসন দণ্ড হ'ত তা-হলে আমি খুসী হতেম; তা-হলে ১০ বৎসর পরে আবার ফিরে এসে আমি তার উপর শোধ তুলতে পারতেম।"

আজ হইতে জুয়াঙ্কো অন্তর্হিত হইল।

মিলিতোনা আরামে নিঃশ্বাস ফেলিল। কেননা সে বিলক্ষণ জানিত, জুয়াঙ্কো এখানে থাকিলে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইবে না।

দুই বিবাহের অনুষ্ঠান একই সময়ে এবং একই গির্জায় সম্পন্ন হইল। মিলিতোনা ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহার বিবাহের পরিচ্ছদ সে আপন হাতেই তৈয়ারী করিবে।

একটা প্রাচীন মঠের নিকট একটা ছোট পাহাড়ের ঢালু-অংশের উপর একটা সাদা ধবধবে বাড়ী, চারি ধারে সবুজ গাছপালা।

গোটা-পাথরের ছিপছিপে সাদা মার্বেল-স্তম্ভ। থামের মাথাগুলায় ফুলকাদা আরবী অক্ষর খোদিত,—এখন উহার সোনার গিল্টি কোথাও কোথাও ঝিকমিক করিতেছে।

ফটক বন্ধ নহে; এস না, ফটকের দরজা ঠেলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। অঙ্গনের শেষ-প্রান্তে আর একটা দরজা, এ দরজাটাও খোলা; এই দ্বার দিয়া একটা উদ্যানে উপনীত হওয়া যায়।

এখানে আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই দারুচিনী গাছের একটা বীথিকা প্রসারিত, উহার ধারে দুইটি পৃষ্ঠসমন্বিত মার্বেলের বেঞ্চি এবং ধবল-প্রস্তর নির্মিত লহরের মধ্য দিয়া দুইটি জল-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

এই সময় সূর্য অস্তগত হইল এবং নীহারমণ্ডিত গিরি-চূড়াগুলিকে এক অপূর্ব গোলাপী রঙে রঞ্জিত করিল!

ঠিক এই সময় একটি যুবক ও একটি তরুণী বাতায়ন-বারান্ডায় পাশাপাশি বসিয়া এই গম্ভীর মহান দৃশ্যের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল।

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইবামাত্র আন্দ্রে পত্নীকে লইয়া গ্রেনাডায় আসিয়াছে।

মিলিতোনা পূর্বেই বলিয়াছিল, আন্দ্রের সহিত বিবাহে তাহার সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধি হইলেও বিবাহের পরেই সে লোক-সমাজে বাহির হইবে না—এই জন্য যে, পাছে তাহার অজ্ঞতায় আন্দ্রে লজ্জা পায়। তাই, তাহার অবস্থা-উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য সে এক্ষণে এই বিজন নিবাসের আশ্রয় লইয়াছে।

এইখানে আসিয়া মিলিতোনার শরীর ও মন দুই-ই বেশ একটু উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে রমণীকে আন্দ্রে ভালবাসিত সেই রমণীর অভ্যন্তরে যেন আর এক উন্নততর রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া আন্দ্রে অত্যন্ত সুখী হইল।

আন্দ্রে ও মিলিতোনার সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল। কেবল মিলিতোনা কখন কখন বেচারা জুয়াঙ্কোর কথা ভাবিত; জুয়াঙ্কোর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় না।

বাস্তবিকই কি জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে ভুলিয়া গিয়াছিল? ইহা সন্দেহস্থল। জুয়াঙ্কো যতটা দূরে গিয়াছে বলিয়া তরুণী মনে করিয়াছিল, আসলে জুয়াঙ্কো তত দূরে যায় নাই। কেননা, যে মুহূর্তে মিলিতোনা এইরূপ ভাবিতেছিল, সেই সময় মিলিতোনা উচ্চ পাহাড়ের পার্শ্বস্থ প্রাচীরের চূড়ার দিকে যদি তাকাইয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত তরুপল্লবের মধ্য দিয়া বাঘের মত দুইটা জ্বলন্ত চোখ একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

একটা লোক ঝোপঝাপের মধ্যে বাঘের মত মাটির দিকে মুখ করিয়া

গুঁড়ি মারিয়া শুইয়া আছে;—যেন এক লম্ফে কোন শিকারের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িবে বলিয়া তাগ্‌বাগ্‌ করিতেছে। এ লোক আর কেহ নহে—এ হচ্ছে জুয়াঙ্কো। জুয়াঙ্কো দুই মাস হইতে গ্রেনাডার গুহা-গহ্বরে লুকাইয়া বাস করিতেছে। এই দুই মাসে সে দশ বৎসরের মত বুড়াইয়া গিয়াছে। এখন মুখের রং কালো, গালে গর্ত পড়িয়াছে, চোখদুটো আগুনের মত জ্বলিতেছে।

যে ব্যক্তি দিবা-রাত একই চিন্তায়—সর্বগ্রাসী একমাত্র চিন্তায় নিমগ্ন, তাহারই অনুরূপ এই সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সেই চিন্তাটি কি?—না, মিলিতোনাকে খুন করিতে হইবে।

ইতিপূর্বে বিশবার সে তাহার মৎলব হাসিল করিতে পারিত;—কেননা, সে অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞেয় ভাবে, গোপনে মিলিতোনার চারিদিকে শিকারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইত—কিন্তু কার্যকালে শেষ-মুহূর্তে তাহার সাহসে কুলাইত না; হাত যেন অসাড় হইয়া পড়িত।

এইবার সে এইখানকার ঝোপঝাপের ভিতর ওঁৎ পাতিয়া লুকাইয়াছিল; কেননা, সে লক্ষ্য করিয়াছিল, আন্দ্রে ও মিলিতোনা প্রতিদিনই একই সময়ে এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে। জুয়াঙ্কো এইবার শপথ করিল, তাহার ভীষণ সংকল্প সিদ্ধ করিয়া চিরকালের মত সব শেষ করিয়া দিবে।

"সে আমার আত্মাকে হত্যা করেছে, আমি তার শরীরকে হত্যা করব।"

বনপথের শেষপ্রান্তে একটা সুস্পষ্ট হাসির আওয়াজ শুনা গেল!

মিলিতোনা তাহার স্বামীকে বলিল,—"আমার মনে হয়, আমরা এস পথ ধরে একটা ভূ-স্বর্গে এসে পড়েছি—কি ফুলের বাহার, কি সুগন্ধ, পাখীর কি মধুর গান, কি কিরণচ্ছটা!"

এই কথা বলিতে বলিতে মিলিতোনা সেই কালস্বরূপ বটবৃক্ষের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

বন্দুকের টিপকলের উপর আঙ্গুল রাখিয়া জুয়াঙ্কো গুন্‌গুন্‌ স্বরে বলিল :—

"এইবার—আর দুর্বলতা নয়। এই-মাত্র শুনিলাম, সে বলিল,—'আমি এখন খুব সুখী'—এমন সুযোগ আর পাব না। মরুক এইবার তবে—"

আর এক মুহূর্ত—তাহার পরেই মিলিতোনার মস্তক উড়িয়া যাইবে, এমন সৌন্দর্যরাশি তাহা কেবল কতকটা রক্ত-মাংস-অস্থিতে পর্যবসিত হইবে।

কিন্তু পুতুলটি ভাঙিবার সময় জুয়াঙ্কোর হৃদয় আর্দ্র হইল।

ঝোপঝাপের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে করিতে জুয়াঙ্কো বলিল,—"আমি নিশ্চয়ই একজন কাপুরুষ। আমার যত সাহস শুধু ষাঁড়দের সহিত যুদ্ধে, শুধু পুরুষের সহিত যুদ্ধে"।

কিয়ৎকাল পরে, একটা খুব গুজব রটিল যে, আমেরিকা হইতে একজন বৃষভ-মল্ল আসিয়াছে। দক্ষতা ও সাহস নাকি অসাধারণ, তার মত 'গোয়ার্তুমি' কাজ কেহ কখন দেখে নাই। শান্তা মারিয়ার বন্দর-নগরে এক্ষণে তাহার যুদ্ধ-ক্রীড়া দেখান হইতেছে।

পুয়র্তোর অধিবাসীরা উজ্জ্বল বর্ণের

পরিচ্ছদ পরিয়া নগর অঙ্গনে, পান্থশালায় মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রমণীরা ওড়নার উপরেও একটা শাল পরিয়াছে। তাহার ফেরের মধ্য দিয়া উহাদের পাণ্ডুবর্ণ মুখগুলি সুন্দর দেখাইতেছে।

রঙ্গশালায় প্রবেশ করিয়া আন্দ্রে ও মিলিতোনা তাহাদের নির্দিষ্ট 'বক্স্'—আসনে গিয়া বসিল। মল্লক্রীড়া সুরু হইল।

বিখ্যাত বৃষ-মল্ল কালো রঙের পোষাক পরিয়াছে। তাহার জামা কালো-জেট্ পাথর ও রেশমী অলঙ্কারে বিভূষিত; তাহার ভীষণ কঠোর চেহারার সহিত এই পোষাক বেশ খাপ খাইয়াছে। একটা হলদে কোমরবন্ধ তাহার শীর্ণ পঞ্জরকে ঘিরিয়া আছে; তাহার এই দেহকাঠামে পেশী ও অস্থি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এই মুখ, এই দেহ-গঠন আন্দ্রের নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না।

মিলিতোনা এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ করে নাই। পূর্বের সহিত সাদৃশ্য খুব কম হইলেও মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে তখনই চিনিয়া ফেলিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ভয়ানক পরিবর্তন দেখিয়া মিলিতোনা ভীত হইল। মিলিতোনা বুঝিল মনের কতটা আবেগ, জুয়াঙ্কোর মত লোহার দেহকে চূর্ণ করিতে পারে।

মিলিতোনা তাড়াতাড়ি হাত-পাখাটা খুলিয়া আপনার মুখ ঢাকিল এবং পিছনে গিয়া আন্দ্রেকে বলিল;—"ও জুয়াঙ্কো।"

কিন্তু পিছনে যাইবার পূর্বেই, জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং হস্তের ইঙ্গিতে এক প্রকার অভিবাদন করিয়াছিল।

আন্দ্রে বলিল :—

"এ জুয়াঙ্কোই বটে! বেচারা ভয়ানক বদলে গেছে; দশ বছরের মত বুড়িয়ে গেছে।

মিলিতোনা তার স্বামীকে বলিল :—

—"এসো ভাই, আমরা এখান থেকে চলে যাই। জানি না কেন—আমার মনটা বড় কাকুল হয়েছে; আমার মনে হচ্ছে, কি যেন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটবে।"

আন্দ্রে উত্তর করিল :—

—"আর কি ঘটতে পারে:—ঘোড়-সওয়ার রক্ষীরা ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে পারে, ষাঁড় গুঁতিয়ে ঘোড়ার পেট চিরে দিতে পারে। এর বেশী আর কি হবে?"

—"আমার ভয় হচ্চে পাছে জুয়াঙ্কো একটা কিছু বাড়াবাড়ি করে—ক্রোধান্ধ হয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড করে।"

—"তার সেই ছোরার আঘাতের কথাই দেখছি তোমার সর্বদাই মনে হয়—তার ভয় নেই। তা কখনই হবে না। এতদিনে সে নিশ্চয়ই তার মনকে শান্ত করতে পেরেছে।"

জুয়াঙ্কো রঙ্গাঙ্গনে অদ্ভুত কাণ্ড করিতে লাগিল। ষাঁড়ের লেজ ধরিয়া ষাঁড়কে ঘুরপাক খাওয়াইতে লাগিল। দুই শিংএর মাঝে পা রাখিয়া তারপর এক

লাফে নীচে নামিয়া পড়িল। ষাঁড়ের গা হইতে সাজ-সজ্জা ছিনাইয়া লইতে লাগিল, ষাঁড়ের ঠিক সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; এরূপ দুঃসাহসিকতার কাজ করিতে লাগিল যাহা এ পর্যন্ত কোন মল্লকে কেহ কখন করিতে দেখে নাই।

লোকেরা উন্মত্তভাবে বাহবা দিতে লাগিল—বলিল, এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড এ পর্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই।

জুয়াঙ্কো ষাঁড়গুলিকে যে সব ছোরার আঘাত করিতেছিল, তাহা উচ্চ হইতে নীচে ও ষাঁড়ের কাঁধের মাঝখানে; আঘাতের ঘায়ে ষাঁড়গুলা বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িতেছে।

আন্দ্রে বলিল :—"জুয়াঙ্কো দেখছি মন্তে, অর্চনা লাঠি প্রভৃতি বিখ্যাত বৃষ-মল্লদেরও হারিয়েছে।"

মিলিতোনাও 'বাহবা' না দিয়া থাকিতে পারিল না। আন্দ্রে ভূতলে পায়ের আঘাত করিতে লাগিল। আনন্দ-উচ্ছ্বাস চূড়ান্ত-সীমায় উঠিল; জুয়াঙ্কোর প্রত্যেক চলা-ফেরায় উন্মত্ত প্রশংসাধ্বনি চারিদিক হইতে উত্থিত হইল।

এইবার আর একটা ষাঁড়কে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—এটা সংখ্যায় ষষ্ঠ।

এই সময় একটা অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। জুয়াঙ্কো ষাঁড়টাকে বেশ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া, কয়েকবার সুদক্ষ-ভাবে ছোরা চালাইয়া, শেষে অসি গ্রহণ করিল; লোকে মনে করিল, এইবার জুয়াঙ্কো ষাঁড়ের গলায় অসি বিদ্ধ করিবে; কিন্তু জুয়াঙ্কো তাহা না করিয়া অসিটা এত জোরে উপর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিল যে, উহা ঘুরিতে ঘুরিতে জুয়াঙ্কোর বিশ কদম দূরে পড়িয়া মাটিতে গাড়িয়া গেল।

চতুর্দিক হইতে সবাই বলিয়া উঠিল; —"জুয়াঙ্কো করবে কি? এ ত সাহস নয়, তাহা পাগলামি! এই নূতন কৌশলটা না জানি কি? শেষে নাকের উপর একটা টোকা মেরে ষাঁড়টাকে মারবে নাকি?....."

যেখানে মিলিতোনা বসিয়াছিল, জুয়াঙ্কো সেই দিকপানে একটা করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; সেই দৃষ্টিতে তাহার সমস্ত প্রেম ও হৃদয়ের সমস্ত যাতনা কেন্দ্রীভূত ছিল; তাহার পর সে ষাঁড়ের সম্মুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পশুটা মাথা নোয়াইল। তাহার সমগ্র শিং জুয়াঙ্কোর বক্ষদেশে প্রবেশ করিল, এবং আমূল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শিং-দুইটা বাহির হইয়া আসিল।

দশ সহস্র কণ্ঠ হইতে আতঙ্কের চীৎকার ঊর্ধ্বদিকে সমুত্থিত হইল।

মিলিতোনা মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া চৌকির উপর উল্টাইয়া পড়িল; এই চরম মুহূর্তে মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে ভাল-বাসিয়াছিল।

# আনন্দই জীবন

বিশ্বনাথ রায়

মানুষ তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে থেকে কি পেতে চায়? এ প্রশ্নের উত্তর বহুবিধ হতে পারে। কেউ বলবেন, সময় কাটাতে হবে তাই একটা কিছু না করলে সময় কাটে না। সুতরাং কাজ করা দরকার। অলস নিদ্রা যাপনের মধ্যেও বিরক্তি কিম্বা ক্লান্তি আছে। তাই কেউ কেউ মনে করেন জীবনকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখাটা মানসিক বেঁচে থাকার একটা উপায় মাত্র। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দৈহিক বেঁচে থাকাটা কোনও সমস্যা নয় অর্থাৎ বস্তুর প্রাচুর্য (মেটেরিয়াল সাফিসিয়েন্সি) তার আছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন 'দুঃখ, কষ্ট, বাড়ির ঝামেলা ইত্যাদির হাত থেকে মানসিক পলায়ন করার মনোবৃত্তিটাই আমাদের কোনও একটা কিছু কাজ করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যারা নৈরাশ্যবাদী তারা বলবেন "পার্থিব জীবনটা যতদিন থাকবে ততদিন কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে, একটা কিছু করে, আস্তে আস্তে, চুপিচুপি পৃথিবী থেকে সরে যাওয়াটাই উদ্দেশ্য।" আবার আশাবাদীরা বলবেন—"আমরা কাজ করি আমাদের আশাকে পরিপূর্ণ করার জন্য।" আশা অনেকরকম হতে পারে। যেমন, ক্ষমতাবান হওয়া, বিদ্বান হওয়া, লেখক হওয়া, মন্ত্রী হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসবের পরেও একটা কথা শেষে মনে আসে অর্থাৎ আমরা কাজ করি কাজের মধ্যে থেকে আনন্দ পাওয়ার জন্য। দৈহিক আনন্দ, মানসিক আনন্দ, সাংসারিক আনন্দ, ইত্যাদি। অর্থাৎ, "যে কোনও প্রকার কর্মযোজনায় আমি ব্যস্ত থাকি না কেন, আমি তার থেকে আমার সর্বপ্রকার আনন্দকে পেতে চেষ্টা করি।" তাই বেন্থাম ও স্পেন্সার বললেন, জীবনে আনন্দ আহরণ ও উপভোগ করাটাই আমাদের বেঁচে থাকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেন্থাম গোড়াতেই বললেন যে সমাজজীবনে দয়ামায়ার কোনও স্থান নেই। মানুষ তার সকল প্রকার ব্যবহারের মাধ্যমে দুঃখকে বর্জন করে সবসময় আনন্দ পেতে চায় (যাকে আমরা "সুখ" বলি)। যখন কেউ কোনও এক বিশেষ বিষয়ে কাজ করেন, সেই মুহূর্তে তার

কাছে সেই কাজটি তার মতে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির কারক। বেন্থামের সঙ্গে একমত হয়ে জনস্টুয়ার্ট মিল স্বীকার করলেন যে আনুপাতিক হিসাবে সুখের কল্পনা, সুখ পাওয়ার চেয়ে, বেশী আনন্দদায়ক। বেন্থাম বললেন, আনন্দকে মাপা যায়। তার চারণভঙ্গী, প্রয়োজনীয়তাও মাপা যায়। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে আনন্দের উৎস বিভিন্ন। যেমন, জ্ঞান, অর্থ, কার্যক্ষমতা, সুখ্যাতি, ক্ষমতা ইত্যাদি। কিন্তু সমর্থ ব্যক্তিদের ক্ষমতা সমান। এক বোতল মদ আর একখানি কবিতার বই সমান হবে যদি তারা সমান সমান আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। মিল্ অবশ্য এখানে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু বেন্থামের কাছে সামগ্রীক আনন্দ দান করার ক্ষমতাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে একজন লোককে গোড়া থেকেই মেপেমেপে দেখে নিতে হবে তার কাজের মধ্যে কতটা আনন্দ আছে। এবং তারপর সেই পথ ধরে সে আরও আনন্দ পাওয়ার পথের দিকে এগিয়ে যাবে।

সুতরাং কার্যের মাধ্যমে আনন্দ পাওয়াটা 'উদ্দেশ্য' না ভেবে সেটা 'পাওয়া উচিত' বলে ধরা উচিত। হিসাবের খাতায় নিজস্ব সুখানুসন্ধানের সময় অপরের আনন্দও এসে যায়—প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ, নিজস্ব সুখবর্ধনের সাথে সাথে অপরের সুখবর্ধনের চেষ্টাও করে যাবে। এইভাবে সরকার এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও উদ্দেশ্য হবে "বহুজনের মধ্যে, সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দকে পরিবেশন করা।" কিন্তু মানুষ যদি শুধুমাত্র জৈবিক স্বার্থের খাতিরে আনন্দ পেতে চায়, তাহলে সেখানে আইনকানুন, রীতিনীতির বালাই থাকতে পারে না। সে তার নিজের দিক নিজেই ভেবে নেবে। কিন্তু তবুও কিছুটা নিয়মকানুনের প্রয়োজন আছে যদিও আমরা মনে করি আমাদের হাতের মধ্যেই আমাদের ক্ষমতা এবং আনন্দ। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, কোনও কারখানায় যদি দশহাজার কাপড় তৈরী করে সস্তায় বিক্রী করা যায়, তাহলেই তো মিটে যায় সমস্যা। অকারণ ঘরে বসে বেশী খাটার কোনও প্রয়োজন নেই। এই সূত্র থেকেই "অর্থানুসন্ধানী মানুষের" (ইকনমিক্ ম্যান) সৃষ্টি। ধরে নেওয়া হয়েছে যে মানুষ পরিশ্রম করে অর্থনৈতিক লাভের জন্য। কেননা অনেকে মনে করে যার টাকা আছে তার সব আছে। টাকার সাহায্যে একজন তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলো কিনতে পারে। এবং সে সেই জিনিষগুলোই কিনবে, যে বস্তুগুলো তার ধারনানুযায়ী তাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দিতে পারে। ধনবিজ্ঞানের নিয়মে "মানুষ সবচেয়ে কম দামে কিনে সবচেয়ে বেশী দামে বিক্রী করতে চাইবে।" কিন্তু যুদ্ধের সময় ব্যতিক্রম ঘটে। আবার এমনও দেখা গেছে যে এক শেয়ার কেনার ব্যাপারে একজন ব্যক্তি ঘটনাচক্রে ত্রয়োদশতম ব্যক্তি হন। তিনি শেয়ার কেনেননি। যদিও লাভের সম্ভাবনা খুব বেশীই ছিল।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আনন্দ পাওয়াটা অপ্রয়োজনীয় কিম্বা অমূলা কিছু নয়। কিন্তু এমনভাবে আনন্দকে উপভোগ করতে হবে যাতে একজনের আনন্দ আর একজনের নিরা-

নন্দের কারণ না হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে কোনও রূপ অযাচিত সংঘর্ষ উত্থাপিত না হয়। যেমন ধরা যাক ধূমপান করা। অনেকের কাছে ধূমপান করাটা বেশ কিছুটা আনন্দের কারণ এবং ধূমপান বেশ একটা উপভোগ্য বিষয়। কিন্তু আপনার ধূমপান যেন অন্যের মাথা ধরার কিম্বা পরিচ্ছদ দহনের কারণ না হয়। এবং আমরা দেখেছি এই ব্যক্তিগত স্বার্থ কি ভাবে সমষ্টির স্বার্থের কাছে হার স্বীকার করেছে। যারফলে কলকাতার ট্রামবাসের ক্ষেত্রে ধূমপান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার দেখা যায় দলের মধ্যে সমষ্টির স্বার্থ কি ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে এগিয়ে যায়। এবং সামগ্রীক স্বার্থ সেখানে আত্মসমর্পণ করে। যেমন ধরা যাক্—একজন নায়ক—দেশনায়ক, আলোকচিত্রের নায়ক, খেলাধূলা ইত্যাদি—যেকোনও এক যায়গার ঘরে এক বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। সেখানে সেই নায়ক হয়ত মনে করেন যে সকালবেলা চা পান করা উচিত নয় এবং তিনি সেটাকে পালন করেন। ফলে দেখা গেল একদল লোক তারা তাকে অনুসরণ করে সকালে চা পান করেন না। কিন্তু এই সমষ্টির স্বার্থের কাছে ব্যক্তির স্বার্থ কিম্বা ব্যক্তির স্বার্থের কাছে সমষ্টির স্বার্থের অবনতি স্বীকার যদিও সমযোজনা সৃষ্টিকারী তবুও কোথায় যেন কিছুটা বিসদৃশোর বহনকারী। সুতরাং সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা বললেন যে, এর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমকালীন সংস্কৃতির সংঘাতের প্রভাব অনেকাংশে দায়ী।

ঊনবিংশ শতাব্দী সমাজ পুনর্গঠনের যুগ। বিংশশতাব্দী সমাজ পুনর্গঠনের জন্য আশ্রয় নিয়েছে দুই বিশ্বযুদ্ধের এবং বিগত শতাব্দীর উন্নততর চিন্তাধারার। যে সংস্কৃতি বিগত কোনও এক শতাব্দীতে খুব বেশী প্রভাবশালী ছিল; আজকের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির পটভূমিকায়, সেটি অনেকভাবে প্রভাবান্বিত, পরিবর্দ্ধিত কিম্বা পরিমার্জিত। সংস্কৃতি সংস্কারেরই বাহ্যিক স্বরূপ। যেমন বাল্যবিবাহ কিম্বা বিধবা বিবাহ।

আমরা সভ্যতার মাপকাঠিতে যতবেশী উন্নতি দেখাতে পারছি আমাদের সংস্কৃতির সংঘাতেও ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতির কিম্বা সংস্কারের বেড়াজাল অদূর ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ ভাবে অপসারিত হবে বলেই আশা করা যাচ্ছে। সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা তাই বললেন যে, মানব সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত কিম্বা সমষ্টিগত আনন্দ আহরণের প্রতিবন্ধক এই সমকালীন সংস্কৃতির সংঘাতকে আমাদের অতিক্রম করে সামগ্রীক ভাবে জিনিষটাকে, দেহ ও মনের সম্পর্কের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। দেহ ও মন পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পর এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আসক্ত। তেমনি যদি পরস্পর নির্ভরশীল সমাজ পুনর্গঠন করা যায় এবং অর্থানুসন্ধানী মানবকে (ইকনমিক্ ম্যান) জ্ঞানানুসন্ধানী মানবে পরিণত করা যায় তাহলে এক বৃহত্তর স্বার্থ পরিপূর্ণতার পথ নামতে পারে। দেহ ও মনের সম্পর্কের মত, "বিশ্বভরা প্রাণকে," গড়ে তুলতে হবে, "আকাশ ভরা গানের" সুরে।

# চা পানের আর্ট

মুরলীজীবন ঘোষ

চার মতো পানীয়র সঙ্গ আজকের বেশীর ভাগ মানুষই কামনা করে; এবং ভিন্ন ব্যক্তি এই আসঙ্গে ভিন্নতর রুচির প্রয়াসী। সেই সকল প্রয়াস, যেমনটি হয়তো চোখে পড়ে ঠিক তেমন ভাবে লিখে ওঠা শক্ত। কারণ এর মূলে ব্যক্তি-গত অন্তর্চেতনার প্রবাহই অতিমাত্রায় প্রবল। প্রভাতে ছ'টার সময় উঠে যিনি চা খেতে ভালবাসেন, দিনটির প্রিয়তর সূচনা চা-র মাধ্যমে করতে চান তার কাছে ঠিক ওই সময়টিতে চা-র অভাব বা বিলম্ব যে কি মারাত্মক তা কেমন করে বোঝাব বলুন!

আবার চা-র সঙ্গে একাত্ম হবার সময় একেক জনের একেক রকম। কলকাতার একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ঠিক দশটায় তার দিনের প্রারম্ভ রচনা করেন দু' কাপ গরম কড়া চা দিয়ে। আবার একজন দক্ষিণ ভারতীয় ঠিক পাঁচটায় দু-কাপ কড়া চা দিয়ে প্রাত্যহিক কর্ম শুরু কর-বার পূর্বে শক্ত আঁক কষার মধ্যে দিয়ে মাথার জট ছাড়ানোয় অভ্যস্থ। এ ছাড়াও চা কি ভাবে পরিবেশিত হল অনেকের তীক্ষ্ন দৃষ্টি তার উপর। কাউপার এক জায়গায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন চা প্রসঙ্গে

প্রজ্বলিত আগুনের ধারে
খড়খড়ি বন্ধ;
আমরা সকলে ছিটিয়ে সোফার
চারপাশে।
কান পেতে শোনা-যায়
জল ফুটছে, হিসহিস সুমধুর
শব্দে মুখরিত কেটলি।
টুং—টাং সাজানো কাপ ডিসের
আওয়াজ;
আহা মন যেন চাপ্পা হয়ে এই ঘরে
বসে
মুক্তিকামী পাখি,—
মনোরম সন্ধ্যাটি হোক পরম বিলাসী
আমাদের সুখটুকু ঘিরে।

অনেকের কাছে চার আস্বাদের চেয়ে সুন্দর কাপের ঠোঁটে ঠোঁট মেলানো কুমারী মেয়েকে চুমু খাবার মতোই। বিগত শ্রীতেজবাহাদুর সপ্রু এমনটি পছন্দ করতেন। সুন্দর সুপাত্রের ঝোঁক

তাঁর বরাবরের। বহু লোক স্ত্রীর ললিত হাতে পরিবেশিত চা-র চেয়ে নিজেই এক গামলা চা ঢেলে নিয়ে খুশি হন।

চা-র উত্তপ্ত অবস্থার কোনো সাধারণ বাঁধাধরা নিয়ম নেই। একজন প্রাচীন সরকারী কর্মচারী সাংঘাতিক গরম চা নিয়ে বসতেন। হয়তো প্রথম স্পর্শ নিতেন সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু দীর্ঘ এক ঘণ্টার আগে সেই ছোঁয়া থেকে চা-কে সরিয়ে রাখেন না। কিন্তু তেমনি আর একদল ফুটন্ত চাকে পাওয়া মাত্র পাক-স্থলীতে পাঠিয়ে দেন। আরও একদল আছেন, যাঁরা গরম চাকে একটি নিম্ন মাত্রার উত্তাপে নিয়ে তবে পান করেন। এমন কি কখনো তা বরফের মতো হিম হয়ে যায়। সম্ভবত এই স্বভাবটি আমেরিকা থেকে এদেশে আমদানী করা হয়েছে।

আগেই বলেছি কি জাতের চা তা নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামান না। এবং খুব কমই আছেন, যাঁরা চা-য়ের গন্ধের তোয়াক্কা করেন। এ নিয়ে কোনো বাড়িতেই তেমন কোলাহল জেগে ওঠে না। চা চাই, তা পেলেই হল। কিছু হোটেল রেস্টুরেণ্ট আছে, যারা আবার চা-কে তার চরিত্র পাল্টে কফির আদর দেয়।

নিরীহ শ্রেণীর প্রচুর লোকই চা-র বর্ণাশ্রমে মাথা ঘামান, তাঁরা শুধু পরিবেশিত চা-র প্রতি সর্বদা সচেতন। চা-র আস্বাদ গ্রহণে প্রখর মননশীল। তার সঙ্গে চা-র প্রতি তেমনি উদাসীন ও নির্লোভ। আধুনিক অনন্য কবি জীবনানন্দ দাশ এই বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে অন্যতম। কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে তাঁর জুড়ি বহু পাওয়া যাবে। যার কারণে শিক্ষক, সাংবাদিক বা পশারহীন উকিল-দের বাড়িতে গেলেই আপনি এক কাপ ভাল চা পেতে পারেন, যা বহু নাম করা লাখপতির বাড়িতে পাওয়া যায় না।

বহুলোক নিজেরাই তাঁদের চা নিজের হাতেই তৈরি করে নিতে ভালবাসেন। স্টোভটি জ্বালানো থেকে চা-র লিকার তৈরি কাপে ঢালা সমস্ত প্রস্তুতিই নিজের হাতে করে নেন। হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জন ছয়েক চাকর রাখতে সক্ষম হলেও ঠিক চারটেয় রান্নাঘরের দরজা খুলে নিজে চা বানিয়ে নেন। যার নাম দিয়েছেন তিনি, 'রাইট রয়াল টি'। কিন্তু কলকাতায় পদ্মজা নাইডুর কাছে থাকাকালীন রাজভবনে তিনি এ অভ্যাস কি ভাবে বজায় রেখেছেন ভাবতে অবাক লাগে।

কেউ কেউ শুধু দুধ দিয়েই চা খান। দুধের মধ্যে চা ভিজিয়ে। তার মধ্যে দারচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ নানা ধরনের মশলাও মেলান বহু লোক। চীনারা তো ফুলের পাপড়িই ছিঁড়ে ফেলে দেয় পাত্রে। বকুল কিংবা ক্রিসেনথিমাম।

স্টেশনে-স্টেশনে মাটির ভাড়-এ চা বিক্রী আরেক অদ্ভুত জিনিস। ভ্রমণক্লান্ত যাত্রীর মুখে সেই চা-র আস্বাদ অনন্য। ভাল কি খারাপ এসব কোনো কথাই তখন মুখ দিয়ে বেরয় না, শুধু আর একটি শব্দই উচ্চারিত হয়—আঃ!

[ অমৃতবাজার পত্রিকা

এসব স্মৃতি কি ভোলা যায়? উজ্জ্বল হয়ে আছে দু'একটা দিন

# আগাছা

**খগেন দত্ত**

উঁচুনিচু অসমান জায়গা। আগাছার জঙ্গলে ভরা। মাঝে মাঝে দুর্ভেদ্য কেয়া-ঝাড়। আশেপাশে লোকালয়ের চিহ্নও নেই। সেই রেল স্টেশনের কাছাকাছি বাস করে কয়েকঘর কৃষক। তার কাছাকাছি জমিদার অন্নদা রায়। আরও পরে আরম্ভ হয়েছে শহরতলি। দিনের বেলায়ও লোক ঢুকতে সাহস পায় না, ঝোপেঝাড়ে একাকার জায়গাটায়। রাতের প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে—ডাকে ডাহুক কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে। পোড়া জায়গাটার পাশ দিয়ে চলে গেছে রেল-লাইন সোজা দক্ষিণে, দৃষ্টির অন্তরালে। সময়ের কাটায় কাটায় এই লাইনের উপর দিয়ে গমগম শব্দে গাড়ি ছুটে যায়। ক্ষণিকের জন্য নির্জন প্রান্তর জেগে ওঠে আবার ঝিমিয়ে পড়ে সীমাহীন নির্জনতায়।

পরান প্রথমে এল একটা দলের সঙ্গে। রাতারাতি কেটে পরিষ্কার করল কেয়াঝাড়—কেটে তছনছ করে দিল আস্তানা। দেখতে দেখতে মাথা তুলল কয়েকটা চালাঘর। বাঁশের কঞ্চির বেড়া দিয়ে নির্দিষ্ট করল যার যার সীমানা। লাউ কুমড়ো লতায় ছেয়ে গেল ঘরের চালা। ছেড়ে আসা গ্রামের মাটির মতো ভালবাসল সদ্য খুঁটি-গাড়া জায়গাটাকে। পাশ দিয়ে চলতি ট্রেনের যাত্রীরা গলা বাড়িয়ে দেখে। সন্ধ্যার পর থেকে প্রতিটি গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা মুখর হয়ে ওঠে। সারাদিন লোকগুলো শহরে ঘুরে ঘুরে চাকরি খোঁজে—সন্ধ্যার দিকে ক্লান্ত দেহ নিয়ে হতাশ মনে ফিরে আসে। পরান তাদেরই একজন।

সেদিন একটু সকাল সকাল ফিরল পরান। সেই সকালে বেরিয়েছে। পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অতিমাত্রায়।

একমনে কাজ করছে সুমনা। এ পাখাটা শেষ করতে পারলেই দু' ডজন হয়। একটা দিনে মাত্র চব্বিশখানা পাখা। আর একটু পরেই আসবে লোকটা। যে মানুষটি প্রত্যেকদিন দোরে দোরে ঘুরে পাখাগুলো সংগ্রহ করে বাজারের জন্য।

যেমন করে নিঃশব্দে সুমনার পাশ কেটে ঘরের ভেতর ঢুকেছিল ঠিক তেমন করেই বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল পরান। যেমন নীরবে এসেছিল তেমন নীরবেই বেরিয়ে যেত যদি না নাতনিটা সেই সময়ে বাড়ি ঢুকত সশব্দে।

—কি গো, কাজ পাইলা? হাল্কা সুরেই প্রশ্ন করল সুমনা।

—না, দাঁড়িয়ে পড়ল পরান : কোনো আশাই নাই কাজ পাইবার,—অনেকটা জোর দিয়েই বলল কথাটা।

একটু চুপ হয়ে রইল সুমনা। হাত ঠিকই চলেছে তার—কাজের বেলায় চুপ করে নেই সে। এখন তবু একবেলা হলেও জুটছে তার এই প্রাণান্তকর শ্রমের বিনিময়ে,—পাখা তৈরির পয়সা দিয়ে। সে চুপ করলে চলবে কেন—উপোস দিতে হবে তাহলে। সরু একগাছা বেত দিয়ে পাখার প্রান্তভাগ মজবুত করে বাঁধতে গিয়ে চুপ হয়েছিল ক্ষণিকের জন্য।

—এই ভর দুপুরে ফিরা আইলা কেন্? সদ্য শেষ করা পাখাটা পাশের স্তূপে রেখে দিয়ে মুখ তুলে প্রশ্ন করল সুমনা।

আর পারুম না। এই রোদের মাঝে ঘুইরা কি লাভ হইবো কইতে পার? রুক্ষ কণ্ঠেই জবাব দিল পরান। বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস। বেচারী দিবারাত্র কী খাটুনিটাই না খাটছে। মেয়েছেলে হয়ে ও অন্ন যোগাচ্ছে দু'মুঠো তিন তিনটে প্রাণীর মুখে। অথচ সে দায়িত্ব তারই।

—চুপচাপ বইস্যা থাকলে কি কাজ হইবো? চেষ্টা কইরা যাও; একটা না একটা কাজ পাইয়া যাইবা। আশ্বাসের সুর শোনা যায় সুমনার শান্ত কণ্ঠে।

ভুল ধারণা তোমার, কাজ হইবো না। কত বেকার জানো? আমাগোর মতন কত লোক ঘরবাড়ি ছাইড়া আইছে জানো? সবাই ঘুরতাছে পথে পথে কাজের লাইগা। আর আমার মতো হয়রান হইয়া হতাশ হইয়া ফিরা আইতেছে ঘরে।

কোনো উত্তর দিল না সুমনা। শুধু বড় বড় চোখ করে বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

—আর কয়ডা তালপাতা আইনা দিবা, একটাও নাই ঘরে। কাল থেইকা কাজ চলবো না আমার।

—ছুরিটা দেও..... যাই দেখি।

সুমনার হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে পথে নেমে এল পরান।

—'দাদু!' পেছন থেকে কিশোরী কণ্ঠের আহ্বান ভেসে আসে। ফিরে দাঁড়ায় পরান। বছর আটেকের একটি মেয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। কাছে এসে পরানের ডান হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে আবদারের সুরে বলে; দুটা পয়সা দাও না,—দাদু!

হাসে পরান,—বিষণ্ণ ম্লান হাসি। মেয়েটির কোঁকড়ানো কুন্তলরাশির উপর দুর্বল হাতখানা রেখে জিজ্ঞেস করে; কেন দিদি? কি করবা পয়সা দিয়া?

দাওনা! বড্ড ক্ষিধা পাইছে।

ডান হাতখানা পকেটে ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বের করে আনল পরান। একখানি মাত্র সিকি আছে সম্বল। চল—দোকানে চল, কি খাবি? বিস্কুট—মুড়ি?

—বিস্কুট খাব। খুশিতে চিক্‌চিক্‌ করে মেয়েটির চোখমুখ।

দোকানের সামনে এল পরান। বিষ্টুর দোকান। দুখানা বিস্কুট তার দোকান থেকে নিয়ে মিনুর হাতে দিয়ে তাকে বাড়ি যেতে বলে পা চালাতে লাগল পরান। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময়ে আবার ডাক এল, দাদু!

—আবার হল কি? পেছু ডাকছিস কেন্‌?

আবার কাছে এল মিনু। পরানের গায়ে গা ঠেকিয়ে মুখের দিকে একবার তাকাল। ভীতু ভীতু চোখ—মুখে কিন্তু হাসির আভাস। কোঁকড়ানো চুলের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল পরান 'কি চাই দিদি?' বাকি আধখানা বিস্কুট মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বলল: 'এবার পুজোয় আমায় একটা ফ্রক দিবা তো? দিবা, কও...কও না দাদু?'

আবার হাসে পরান; বিষাদের হাসি। পুজোর তো দশদিন বাকি। দশটা পয়সা নেই হাতে, নাতনিকে ফ্রক দেবে কোথা থেকে? তবু বলে; হ, দিব, এবার নিশ্চয় দিব।

—না, তুমি দিবা না। খালি খালি মিথ্যা কথা কও তুমি। অভিমানে মুখ নিচু করে মিনু। ছাই দিবা, গেল বছরও কইলা দিবা, কিন্তু দিলা কই?

জবাবের ভাষা হারিয়েছে পরান অক্ষমতার পাথরে।

—কওনা, দাদু! পরানের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার অন্যমনস্কতা ভাঙে মিনু। ঠিক দিবা? দত্তদের রিনির মতো ফুলফুল ফ্রক? সত্যি কইছ?

সেই একই দাবি। শুধু একটা সুন্দর ফ্রকের আবদার। মিথ্যা স্তোকবাক্যে আজও হয়তো ভোলানো যায় চঞ্চল কিশোরীটাকে। কিন্তু...হ্যাঁ, দিব দিদি, এইবার যেমুন কইরা পারি দিব। মিনুর মাথায় স্নেহকাতর হাত বোলায় পরান। এখন বাড়ি যা, তোর দিদিমার কাছে যা।

...খিল খিল হাসিতে স্তব্ধ প্রান্তরকে সজাগ করে দিয়ে চলে যায় মিনু।

পলকহীন দৃষ্টি মেলে তার যাত্রাপথে চেয়ে থাকে পরান। হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

মা বাপ হারা এই ছোট্ট মেয়েটির জন্য সত্যি দুঃখবোধ করে পরান। ফুলের মতো পবিত্র, সুন্দর এই মেয়েকে রেখে তার একমাত্র বিধবা মেয়ে যেদিন মারা গেল সেদিন থেকেই ওর যত দায়িত্ব পরানের। বাপ মা মরা নাতনির সব ঝুঁকি তারই উপর। অথচ...এই মেয়েটির তুচ্ছতম একটি আবদারও পূরণ করতে পারে না পরান। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে সে। তারপর দ্রুত পা চালায় দিগন্তপ্রসারী জঙ্গলটার দিকে।

ছোট্ট ছোট্ট তালগাছের চারা। বাঁ-হাতে কচি কচি পাতাগুলো টেনে ধরে ছুরির এক এক ঘায়ে কেটে নিচ্ছে পরান।

হাত চলছে, সঙ্গে সঙ্গে চলছে মন। হাতের গতি সীমিত—মনের গতি বাঁধনহারা। মন চলে গেছে অনেক দূরে। সীমান্তের বহু স্মৃতিবিজড়িত ছোট্ট একটি গ্রামে। উঠানের পুবে বসতঘর—পশ্চিমে বৈঠকখানা—উত্তরে ঠাকুর-ঘর—দক্ষিণে ধানের গোলা। মাঝখানে তকতকে একটা বড় উঠান। বৈঠকখানার মাঝখান

দিয়ে সোজা বড়-রাস্তায় গিয়ে মিশেছে পথ। পথের দু'পাশে আম-জাম-সুপারির সারি। পেছনে বড় একটা পুকুর—তারই পাড়ে ফুলের বাগান—কলা-গাছের বন। ঠাকুর-ঘরের পাশেই শিউলি গাছ—ফুলে ফুলে ভরে গেছে নিকানো উঠান। দূরের ঝোপ ঝাড় থেকে হাসনুহানার মদির গন্ধ আসছে ভেসে। আনন্দময়ীর আগমনে গ্রামে জেগেছে সাড়া।

এসব স্মৃতি কি ভোলা যায়? উজ্জ্বল হয়ে আছে দু' একটা দিন। সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট মোহন এসে বলেছিল পরানদা, এটা তো পাকিস্তান হয়্যা গেল। আমরা থাকুম কৈ?

বিস্মিত হয়েছিল পরান, ক্যান্, ইয়ানে থাকুম—এই ঘরে—এই ভিটাতে!

—মুছলমানরা কি ইয়ানে থাকতে দিব?

—কিযে কস মোহন তুই, আমি কিছু বুঝতে পারিনা। বিরক্তি প্রকাশ করেছিল পরান।

—বুঝবা অনে পরে বুঝবা, যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই সেদিন ফিরে গিয়েছিল মোহন। সে চলে যাওয়ার পরেই বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। জল পড়েছিল অঝোরে আকাশ ভেঙে।

জল আরও একদিন পড়েছিল। তবে, সে জল আকাশের নয় চোখের। গ্রামের অনেকেই চলে গেছে কলকাতায়। প্রথম পয়সাওয়ালারা, তারপর লেখাপড়া-জানা লোকগুলো। সামান্য কয়েকঘর মাত্র অবশিষ্ট আছে। কড়ে গুনে শেষ করা যায়। ভয় ভয় করে রাতে, দুপুরে। ফাঁকা পথ-ঘাট—ফাঁকা পাড়া।

সেদিন রাত দুপুরে দরজায় টোকা দিয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় ডেকেছিল মোহন।

—পরানদা, অ—পরানদা! জাগা আছ?

—কে? ব্যস্ত হয়ে উঠল পরান ঘরের ভেতরে।

—আমিরে আমি।

—কে, মোহন তুই? ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল পরান। এই ভর রাতে কি মনে কইরা? ডাকছস ক্যান্? আয়—বস। অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে পরান।

—না, বসুম না, চল—আইজই পালাই, নয়লে বাঁচুম না, এই ক'ইয়া দিলাম। চঞ্চলতা এবং ভয় দু'টো যুগপৎ ফুটে ওঠে মোহনের চোখে-মুখে।

—কেন্, কি হইছে? বিস্মিত জিজ্ঞাসা পরানের মুখে।

—জীবন আইছে এই মাত্তর শহর থেইকা। ওখানে দাঙ্গা লাইগা গেছে। অনেক হিন্দুদের নাকি ছুরি মাইরা শেষ কইরা দিছে। কাঁপা অথচ নিচু গলায় জানায় মোহন।

শিউরে উঠল পরান। কি দোষ কইরাছে হিন্দুরা।

—এখানে নয়...হিন্দুস্থানে নাকি মুছলমান মাইরাছে হিন্দুরা··কৈলকাতায় নাকি একটা মুছলমানও রাখে নাই। তার শোধ লইবো না এখানে। জীবনরাও চইলা যাইতাছে আজ...তুমি একা একা থাকবা কি কইরা?

—রহমান-রসুল, ওরা যে রোজ কয় ওদেরে ছাইড়া না যাইতে?

—হ··হ··তাই তুমি বিশ্বাস কর। ওরাই তোমাদের শেষ করবো··এই কইয়া দিলাম। তুমি না যাও আমি চললাম আইজই।

সব চলে যাবে? দাস-পাড়ায় শেষ মানুষটিও থাকবে না আর। ভাবতে ভাবতে উতলা হয়ে উঠল পরান। সব কিছুই যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। অন্ধকারেই মোহনের বাড়ি বয়ে খবর দিতে এলো, সেও হবে তাদের সঙ্গী।

পোটলা-পুটলি বেঁধে মোহনের ডাকের প্রতীক্ষায় বসে রইল পরান—সুমনা—তার নাতনি।

ফজরের আজান ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে মোহন এল ডাকতে। ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এল সবাই রাস্তায়।

—দাদু! এই বাড়িতে কে থাকবো? কে খাইবো গোলার ধান? টমুকে কে দিবো ভাত! কওনা—ও দাদু!' প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে ক্ষতবিক্ষত করে দিল মিনু পরানকে। কোনো উত্তর দেয়নি পরান। পেছন ফিরে তাকিয়েছিল পরান ঘরের দিকে দু' একবার। আর ঝর ঝর করে কেঁদেছিল।

তালপাতা কাটতে কাটতে ভাবে পরান। জীবনের সেই বিস্মৃতপ্রায় পরিচ্ছেদটি চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। দিনান্তের সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে। আঁধারের যবনিকা নামে ধরণীর উপর।

তালপাতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসে পরান। পথের মাঝে নারকেল গাছটার নিচে জড়ো হয়েছে চাকরির ব্যর্থ চেষ্টায় হতাশ হয়ে ফিরে আসা ক্লান্ত লোকগুলো। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল পরান। একখানা নোটিশ। কে যেন কখন এসে এঁটে দিয়ে গেছে। জবর দখল করা জমি ছেড়ে দিতে হবে। সরকারী মোহর লেখাটার উপর।

একখানা কাগজই নাড়া দিয়েছে নতুন গড়া জনপদের শিকড়ে।

—কি অইচে? অসহায় আর্তনাদের মতো কথাটা ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মোহন। একদিকে সমাধান করে এনেছে প্রায় সে অপরাপর পরিবারের তুলনায়। এ এলাকা থেকে চাল নিয়ে রেশন এলাকাতে চড়া দামে বিক্রি করে কিছু পয়সা সে পাচ্ছে অন্তত চলার মতো। তার মাথায় যেন বাজ পড়ল।

—পরানদা! আবার পথে দাঁড়ামু? জোয়ারের টানে ভাইসা বেরামু? জটিল প্রশ্ন মোহনের মুখে।

জবাবের ভাষা হারিয়েছে পরান। তার হাত পা অসাড় হয়ে গেছে। জোয়ান জোয়ান ছেলেরা পরামর্শ জুড়ে দিয়েছে। চারদিকে একটা কানাকানি শুরু হয়ে গেছে।

হতাশাভারাক্রান্ত জনপদের প্রান্তে বুঝি আত্মপ্রত্যয়ের একটি ফুলকি ঝলক মেরে ওঠে। না, কিছুতেই ছাড়ুম না। একটা যুবকের কণ্ঠ বজ্রনির্ঘোষের মতো ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই নীরব হয়ে যায়।

পরান শুনল আর দারিদ্র্যজর্জর মাংসপেশীর মাঝে অনুভব করল একটা তীব্র শিহরণ, শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল, উষ্ণ রক্তের নদীতে লাগল দোলা।

একবার ছাইড়া আইছি সব কিছু ওপারে, কত শ্রম দিয়া গড়লাম এই কলোনি মাথার ঘাম পায়ে ফেইল্যা—যথাসর্বস্ব দিয়া। এটারেও ছাড়তে হইবো? উইঠা যামু একখান নোটিসেই। না, পারুম না ছাইড়া যাইতে—পারুম না কিছুতেই না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ঘোষণায় নড়ে ওঠে ভেঙেপড়া মনগুলি, শক্ত হয়ে ওঠে শিথিল

হওয়া আলগা মাংসপেশী। বিচ্ছিন্ন আক্রোশ দানা বেঁধে ওঠে জনপদময়।

পরদিন জমিদার এলেন স্বয়ং। এলেন দারোগা সাহেব—সঙ্গে লাঠিধারী একদল লোক। প্রাইভেট কার থেকে নামতেই·

জনপদ চমকে উঠল। ঘর ছেড়ে সবাই একে একে বেরিয়ে এল, হাওয়ায় ভেসে গেল খবরটা—এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। নারী পুরুষের মেলা বসে গেল সেখানে। দারোগা সাহেব আর জমিদারের লোক-গুলোকে ঘিরে ধরল তারা, সবার চাহনিতে একটিমাত্র জিজ্ঞাসা,—কেন আইল এরা?

দারোগা সাহেব চেষ্টাকৃত হাসিতে চোখমুখ উদ্ভাসিত করে বললেন, হেঁ· হেঁ··দেখতে এলাম। জঙ্গল কেটে আবাস গড়লেন আপনারা—একবার দেখতে এলাম।

জমিদার অম্বদা রায় যেন কি বললেন মৃদুকণ্ঠে দারোগার কানের কাছে মুখ নিয়ে। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে উঠে বসলেন দারোগাসাহেব। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল মানুষগুলো। কানাকানি কিন্তু থামল না। কিছু একটা মতলব আছে একথাটা বুঝতে পারল অনেকে। আবার হয়তো আসবে লাঠি-বন্দুক-পুলিস লইয়া।

বাইরে ঝড়ের রক্তমেঘ—পেটের ভেতরে খিদের আগুন। মোহনের সঙ্গে পরামর্শ করে সুমনার শেষ চুড়িগাছা বিক্রি করে দিয়েছে পরান। এ ছাড়া আর উপায় কি? নাতনি মিনুর আবদার এবার তাকে পূরণ করতেই হবে। যেমন করে হোক সুমনাকেও অন্তত একখানা শাড়ি কিনে দিতে হবে। ওর পরনেও কাপড় নেই। সেলাইয়ের উপর সেলাই পড়েছে তার কাপড়ে। মুখ ফুটে না বললে মনে মনে দুঃখ বোধ করে পরান।

শরতের রাত শেষ হল দূরের কাপড়ের কলের বাঁশির বিকট আওয়াজে। রাতেই চাল কিনে রেখেছিল একমণ। এক্ষুনি বেরুতে হবে শহরের উদ্দেশ্যে। বিক্রি করে লাভের পয়সা দিয়ে কিনে আনবে নাতনির ফ্রক সুমনার শাড়ি। অন্তত পুজোটাকে উপভোগ করবে সমস্ত সত্তা দিয়ে। সারা শরীরে রোমাঞ্চ লাগে পরানের। মা আসছেন আনন্দময়ী মা, আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠছে আকাশ-বাতাস।

এক্ষুনি আসবে হয়তো মোহন।

মোহন এসে কাঁপের দোরটায় আস্তে টোকা দিয়ে ডাকল, পরানদা! রাত শেষ হইছে··চল...।

চালের বস্তা মাথায় নিয়ে পথে নেবে এল পরান। বুকের ভেতর আশার দোলা। মোহনকে অনুসরণ করে চলল সে। আগে পিছে আরও দু'একজন একই উদ্দেশ্যে। রাতের অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। পাশের দীঘিটার বুক জুড়ে রক্তপদ্মের সমারোহ। জল দেখা যায়না ফুল আর পাতার ঠাসাঠাসিতে। সামনে ক্রমশ ক্ষীয়মান শ্বেতাভ পথরেখা একেঁ বেঁকে গিয়ে মিশেছে শহরের পিচঢালা রাস্তায়। রাস্তার দু'ধারে তরঙ্গময় সবুজ ঝোপ-ঝাড়ের সারি। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে একটা হাল্কা মিঠে গন্ধ।

পদক্ষেপ দ্রুততর করে মোহন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই, পরানও। রাত শেষ হবার আগে শহরতলীর প্রান্তে এন্‌ফোর্সমেণ্ট অফিসটাকে অতিক্রম করতে হবে। সেখান দিয়ে চাল নিয়ে যাবার সময় বড্ড হয়রান করে পুলিসগুলো।

পদক্ষেপ আরও দ্রুত হয়। দ্রুততর

অথচ লঘু পদক্ষেপের তালে তালে পথের ধুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ভেঙে পড়ে, যেন তাদের অনুসরণ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ধুলোগুলো।

—কোন্ হ্যায়.. কর্কশ চিৎকার ভেসে আসে পাশ থেকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পরান। সামনের পেছনের লোকগুলো ছুটতে চেষ্টা করে বোকা মাথায়।

—ঠ্যার্ যাও··বলিষ্ঠ আদেশ, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সেল টর্চের চোখ ঝলসানো আলো এসে পড়ে তার চোখে মুখে। চমক ভাঙে সেই মুহূর্তে। ছুটে পালাতে চাইল একবার। কিন্তু অসম্ভব। একমণ চাল নিয়ে ছুটতে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব··

ততক্ষণে কোমরে জড়িয়ে ধরেছে এক-জন পুলিশ। সামনেও একজন। ধরা পড়ল। একা পরান নয়। আরও অনেকে ধরা পড়েছে। একটা ঘরে আবদ্ধ রেখেছে তাদের যে দু'একজন পালিয়েছে তাদের নাম বল-বার জন্যে পীড়ন করছে নানাভাবে।

—অনেকদিন ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছ চাঁদুরা, কেমন? দারোগা সাহেবের রুদ্ধ জিজ্ঞাসা ভেসে এলো : এবার মজা দেখাব। কোথায় থাকা হয়! কাগজ কলম নিয়ে বসলেন দারোগা সাহেব।

—সেই যে দেখতে গেছিলেন...একজন বলতে চেষ্টা করল।

ও! জমিদার অন্নদা রায়ের জমি জবর-দখল করেছ তোমরাই বুঝি! চোখের ভুরু কোঁচকালেন তিনি এবার টের পাবে মজাটা। পরের জমি দখল করে, সরকারের আইন অমান্য করে চালের কালো বাজার চালানোর মজা টের পাবে।

খুব ভয় দেখিয়ে উঠে গেলেন তিনি। তারপর একদল পুলিসকে পাঠিয়ে দিলেন সেই জনপদে। নিরীহ বাচ্চা-যুবক-বুড়ো ধরে নিয়ে এল আরও অনেককে।

খবর গেল অন্নদা রায়ের কাছে। ছুটে এলেন তিনি। দারোগা সাহেবের কামরায় সিগারেট চায়ের ধুম পড়ে গেল। আর পেটের খিদেয় ছট্‌ফট্ করতে লাগল পরান।

একটা সিপাই এসে দাঁড়াল তাদের ঘরে। খুব ভালো ব্যবহারে আপ্যায়িত করে কাছে ডাকল পরানকে। কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলল যদি বাঁচতে চাও মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকা করে দিয়ে যাও। দারোগা সাহেব খুব দয়ালু লোক আছেন, তাহলে ছেড়ে দিতে পারি।

—টাকা!

—হ্যাঁ, বেশি নয় মাত্র পঞ্চাশ, কত টাকাই তো লাভ করেছ আগে।

—পঞ্চাশ টাকা! আঁতকে উঠল পরান। চোখ দুটো কপালে তুলে বলে খাইতে পাইনা একবেলা এত টাকা কোথায় পামু?

—দেখনা চেষ্টা-চরিত্র করে। নইলে মোকদ্দমা হবে, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। জরিমানা হবে—এমন কি জেলও হতে পারে। তাই...বলছিলাম...

এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে শুধু। কোনো জবাব দিতে পারেনা।

দিন শেষ হয়ে রাত এল। সারাদিনের উপোসে লোকগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঝিমুচ্ছে বসে বসে—কেউ বা মেঝেতে শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ ঠাস ঠাস শোঁ শোঁ শব্দে

জেগে উঠল মানুষগুলো। জানলার ফাঁকে দেখতে পেল দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন··লিক্ লিক্ করে আকাশ ছুঁতে চাইছে আগুনের শিখা; মেয়েরা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ছোটাছুটি করছে ইতস্তত—একটা সকরুণ কোলাহল ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আরও একটা সকরুণ কোলাহল হারিয়ে গেল থানা হাজতের চারটে দেয়ালের আয়তনে।

পরদিন জামিনে খালাস পেয়ে ফিরে এল পরান। ছাই হয়ে গেছে তার নিজ হাতে গড়া ঘর। কিন্তু সুমনা কোথায়? কোথায় নাতনি? মা-বাপ হারা মিনু? শুধু ছাই—পোড়া কাঠের টুকরো—লাল লাল টালির উপর পা দিয়ে দিয়ে পরিচিত মুখগুলোকে খুঁজছে পরান। 'সাইট ফর ফ্যাক্টরি' প্লেটটা হয়তো এক্ষুনি চোখে পড়বে।

[ পরিচয়

# ভারতনাট্যম ও তার ষড়াংগ

স্নিগ্ধা পাল

ভারতনাট্যম শব্দটি আজ সুপরিচিত। কলারসিক সকলেই অন্ততঃ এ শব্দটি জানেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি-কেন্দ্র কোলকাতা শহরে ভারতনাট্যমের চর্চা হয় সত্য, কিন্তু এর শিল্পী ও সমঝদারের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। শুধু তাই নয়, ভারতনাট্যম নামটির অপপ্রয়োগও কিছু কম হয়না।

ভারতনাট্যমের যে রূপটি বর্তমানে দেখা যায় তার প্রধান কেন্দ্র হ'ল দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলা। এই শিল্পটির বয়স নিয়ে নানা মতবাদ প্রচলিত। ভারত-নাট্যম ভারতবর্ষে প্রচলিত সবচেয়ে প্রাচীন নৃত্যশিল্প। এই শিল্পের সর্বা-পেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন আজ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে তামিল নাটক 'চিলাপ্পদিকরম'-এর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মূলতঃ এটি প্রেমবিষয়ক নাটক হ'লেও এতে 'ইস' বা সংগীতের একটি অধ্যায় যুক্ত থাকায় তৎকালীন নৃত্যগীত বিষয়ে এটিকে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ বলে ধরা হয়। এই গ্রন্থে 'কুত' (ভারতনাট্যমের প্রাচীন সমার্থক শব্দ) নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, এই গ্রন্থের রচনাকাল অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীর পরে নয়। অবশ্য তৎকালীন 'কুত'-এর সংগে আজকের ভারতনাট্যমের প্রচুর পার্থক্য। বর্তমানে আমরা ভারতনাট্যমের যে রূপটিকে দেখি, জানা গেছে, তার প্রব-র্তনের মূলে রয়েছেন চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম্ ও বাদিবেল্লু, এই চারজন শিল্পী। এই চার সহোদর ছিলেন সর-ফোজীর রাজসভায় নৃত্য ও গীতের শিল্পী এবং এ'দের সময় থেকেই তাঞ্জোরে ভারতনাট্যম চর্চার একটি ধারাবাহিক নজীর পাওয়া গেছে।

ভারতনাট্যম একক নৃত্য হিসেবেই উপস্থাপিত হয়। ভারতনাট্যমের প্রচলিত নাম 'সাদির নাচ' বলতে কিন্তু পুরো-পুরি নৃত্যনাট্যই বোঝাত। বর্তমানে নৃত্যরীতিটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিল্পী হিসেবে স্বর্গতঃ নাট্টুয়ান (নৃত্যগুরু) পন্দানেল্লুর মিনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন পূর্বোল্লিখিত চিন্নাইয়ার বংশধর।

নাট্টুয়ান কথাটি ভারতনাট্যমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ নাট্টুয়ান ও দেবদাসীগণই এতদিন পর্যন্ত ভারত-নাট্যমের ধারক ও বাহক ছিলেন। দেবদাসীদের সঙ্গে নাট্টুয়ানদের যোগ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। নাট্টুয়ানরা কেবল নৃত্যশিক্ষকই ছিলেন না, তাঁদের কাজ ছিল নাচটি পরিচালনা করা অর্থাৎ এক-কথায় Conductor. দেবদাসীরা এঁদের ছাড়া নাচতে পারতেন না। নাট্টুয়ানরা বংশপরম্পরায় এই কাজই করতেন। দেব-দাসীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কোনরকম বেতন দানের প্রচলন ছিলনা বটে, তবে তার বদলে দেবদাসীদের সারাজীবনের উপার্জনেই নাট্টুয়ানদের একটি অংশ থাকত। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই দুই শ্রেণী পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে এই শিল্পের চর্চা করে এসেছেন।

স্টেজের সঙ্গে ভারতনাট্যমের প্রথম পরিচয় ঘটল ১৯৩৪ সালে। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বালাসরস্বতীকে এর পথিকৃত বলতে হবে। ঐ বছর নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে সর্বপ্রথম ইনি সর্ব-সমক্ষে ভারতনাট্যম নৃত্য প্রদর্শন করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেদিনকার অন্যতম দর্শক। কয়েক বছর আগে থেকেই এ প্রচেষ্টা চললেও প্রায় বিপ্লব ঘটিয়ে যে শিল্পী একাজে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর সাহসের প্রশংসা না করে পারা যায়না। বালাসরস্বতীকে নতুনভাবে দেখে তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা তাঁকে মন্দিরগাত্রস্থ প্রস্তরমূর্তির সজীব সংস্ক-রণ বলে অভিহিত করেছিল। বালাসর-স্বতী ভিন্ন রুক্মিণী অরাণ্ডেল, ই কৃষ্ণ আয়ার প্রভৃতি শিল্পীরাও এই শিল্পের প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। রুক্মিণী দেবী প্রতিষ্ঠিত আধিয়ারের 'কলাক্ষেত্র' ভারতনাট্যম চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। তবে দক্ষিণভারতে এর চর্চা বেশ কিছুদিন যাবৎ সুরু হওয়া সত্ত্বেও উত্তরভাগে ভারতনাট্যম সেদিন পর্যন্তও নিতান্ত অপরিচিত ছিল। উত্তরভারতে মাঝে মাঝে দু'একটি সঙ্গীত সম্মেলন মারফত এর পরিচয় মিলত। কিন্তু সেখানেও, যথেষ্ট শিল্পোৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও গানের ভাষা ও সুরবিন্যাস একটি বিরাট বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। সহযোগী সঙ্গীত হিসাবে ভারতনাট্যমে যা ব্যবহার করা হয় তা প্রধানতঃ কর্ণাটক সঙ্গীত এবং গানের ভাষা দক্ষিণভারতীয়। কাজেই এতগুলি বাধা অতিক্রম করে এ শিল্পকে ভাল লাগান যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তবু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যরীতিগুলির মধ্যে ভারত-নাট্যমের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প হিসাবে এর এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা সত্যিই বিস্ময়কর। শিল্প মাত্রেরই কোন-না-কোন নিজস্ব বক্তব্য থাকে। ভারত-নাট্যমের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবেই প্রযোজ্য।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে একটি পূর্ণাঙ্গ ভারতনাট্যমের অনুষ্ঠানে মোট ছয়টি নৃত্যাংশ প্রদর্শিত হয়। এগুলির নাম যথাক্রমে আলারিপু, যতিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্, পদম্, ও তিলানা। রীতির দিক দিয়ে এর একটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়। আলারিপু, যতিস্বরম্ ও তিলানা হল 'নৃত্ত' বা এ্যাবস্ট্রাক্ট ড্যান্স-এর অন্ত-

ভুক্ত এবং শব্দম্, পদম্ ও বর্ণম্‌কে বলা যায় ইলাস্ট্রেটিভ ডান্স বা 'নৃত্য'। আলারিপু দিয়েই অনুষ্ঠান সুরু করা হয়। ঈশ্বর ভূমি বা স্টেজ এবং দর্শককে অভিবাদন জানিয়ে শিল্পী অনুষ্ঠান সুরু করেন। এরপর যতিস্বরম্। নামটি থেকেই এর রূপ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। তার মধ্যে 'যতি' শব্দটি টেকনিক্যাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'কত্থক নাচের যেমন 'বোল', ভারতনাট্যমের 'যতি' অনেকটা সেইরকম। তবে এর-মধ্যে তালের সঙ্গে ভঙ্গির বা ফিগার-এর বিভিন্ন প্রকার ভাঙাগড়া একটি লক্ষণীয় বস্তু। ভারতনাট্যমে প্রচলিত কোন একটি তালকে আশ্রয় করেই এই যতিগুলি গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি যতিস্বরমই কোন একটি বিশেষ তাল-এর ওপর গঠিত হলেও, এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, সেই বিশেষ তালটির মধ্যে আরও কয়েকপ্রকার তালকে এনে সন্নিবেশিত করা হয়। এইরকম পাঁচটি কি ছয়টি যতি নিয়ে সাধারণত একটি যতিস্বরম গড়ে ওঠে। ভারত-নাট্যমে যে নৃত্যধর্মীতা সেটি যতিস্বরমে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়।

যতিস্বরমের পর শব্দম্। কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। শব্দম-এ এসেই স্বরের সঙ্গে প্রথম কথার যোগ দেখা যায়। শব্দম্ মূলত অভিনয় প্রধান। গানের ভাষাটিকে অভিনয়দ্বারা নানা ভাবে ফুটিয়ে তোলা এবং ব্যাখ্যা করাই এর উদ্দেশ্য। এতে যতির ব্যবহার খুব কম। মনে হয়, যতিস্বরমে দীর্ঘকাল দ্রুতলয়ে দুরূহ ভঙ্গিগুলিসমেত নৃত্যপ্রদর্শনের পর শিল্পীকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া বিশুদ্ধ 'নৃত্ত'র পর শব্দমেই অভিনয়যোগে 'নৃত্য'র সঙ্গে দর্শকের প্রথম পরিচয় ঘটে।

এরপর আসে 'বর্ণম্'। বর্ণম্‌ই ভারতনাট্যমের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এখানে যতির সঙ্গে স্বরের এবং গানের সঙ্গে অভিনয়ের একযোগে দর্শন মেলে। নৃত্য ও অভিনয়ে একত্রিত হয়ে বর্ণম্ রসভাবব্যঞ্জনাদিযুক্ত হয়ে এক অপূর্ব শিল্পোৎকর্ষে উন্নীত হয়। সময়ের দিক দিয়েও বর্ণম্ সবচেয়ে দীর্ঘ। এককথায় বর্ণমে ভারতনাট্যমের পুরো রূপটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পীকে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এর পরের নাচটিও তাই শব্দম্-এর মতোই মূলতঃ অভিনয় প্রধান। এটি হ'ল পদম্। শব্দমে ছোট হলেও যতি থাকে কিন্তু পদম্ একেবারে যতিবর্জিত। ভজনজাতীয় ছোট ছোট ভক্তিরসাত্মক গানই পদমের প্রধান উপজীব্য। পদমে শুধুমাত্র অভিনয়-শিল্পীকে মুদ্রা ও মুখের অভিব্যক্তিপ্রকাশে যথেষ্ট পটু হতে হয়।

এরপর শেষ যে নাচটি দিয়ে ভারত-নাট্যমের একটি সূচী সম্পূর্ণ হয় তার নাম 'তিলানা'। তিলানা শব্দটি উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপরি-চিত। তিলানা কথাটি উত্তরভারতে তারাণা বা তেলেনা নামেও ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীতেও তিলানার রূপটি মোটামুটি একইরকম। আগেই উল্লেখ করেছি যে এটিও 'নৃত্ত' বিভাগের অন্ত-র্ভুক্ত। কোন কোন তিলানায় অবশ্য শেষের দিকে এক আধ লাইন কথার সঙ্গে অভিনয় জুড়ে দেওয়া হয়। সাধারণত তিলানায় অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয় ব্যবহার করা হয়। অত্যন্ত দ্রুতলয়ে যতি এবং

সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভঙ্গিসমূহের দ্রুত সঞ্চালন দর্শককে অভিভূত করে দেয়। প্রথমতঃ বলা দরকার যে প্রত্যেকটি নাচেই ভঙ্গি ও পদক্ষেপের মতই গলা ও চোখের সূক্ষ্ম কাজও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়।

ভারতনাট্যমের একটি সূচীর পরিচয় মোটামুটি এই। কিন্তু একজন ভারতনাট্যম শিল্পীকে কমপক্ষে অন্তত পাঁচ থেকে ছ'টি বিভিন্ন রাগরাগিণী আশ্রিত পূর্ণসূচী জানতেই হয়। অবশ্য এখনও অনেক নাট্টুয়ান আছেন যাঁদের এই ধরনের সঞ্চয় প্রায় সংখ্যাতীত।

বাংলাদেশে শিল্পরসিকদের সচেতনতা এ বিষয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, এইটুকুই কামনা।

[ মহেঞ্জোদারো

**প্যাট্রিক ডান**

প্রায় দশটা বাজে এখনই যেন মনে হয় বেশ রাত হয়েছে। আরাম কেদারায় বসে আমি সিগারেট টানছি বাড়িতেও কেউ নেই, আমার ভাই সাংহাই থেকে বাইরে গিয়েছিল কাজে। এমন সময় অদ্ভুত ধরনের শব্দ আমার কানে এল! বাড়িতে চাকর-বাকরও ছিল তাই কানটাকে খাড়া করে রইলুম! দরজা খোলা ছিল, জানলাও খোলা।

শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, পায়ানর পদ-শব্দ, সাংহাইএর এদিকটা নিস্তব্ধ তার-ওপর এই ভৌতিক শব্দে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম, শব্দটা ফরাসী সীমানার দিক থেকেই আসছিল, আমি আর স্থির থাকতে পারলাম উঠে দাঁড়াতেই দেখি এই পদশব্দটা এসে আমার দরজার সামনে এক মুহূর্ত থামল। আর আচমকা কে যেন আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমি লোকটিকে দেখে হতবুদ্ধি; কি করা উচিত তা ভেবে পেলাম না। হাতের সিগারেট কখন যে পড়ে গিয়েছিল তা আমি টেরই পাইনি। ভালভাবে তাকিয়ে দেখলাম, লোকটি একটি অল্পবয়সী যুবক, পরনের কাপড় চোপড় শতচ্ছিন্ন, মুখ শুকনো, কোথাও কোথাও ছড়ে গেছে।

চীনে
এসেছ

রহস্যময় আগন্তুক চীনা সভয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল. মুখটা যেন কে তার চেপে ধরেছে সে যে কি বলতে চায় তা বেশ স্পষ্টই বোঝা তবু লোকটির ভাব গতিকে বিশ্বাস না করে আমি খুব কড়া করে বলতে গিয়ে আবার থমকে গেলাম. কারণ ঠিক এই সময় বেশ কয়েকজনের পদশব্দ এসে থামল ঘরে আমরাও চুপ। বেশ খানিকক্ষণ পরে পদশব্দগুলো দূরে মিলিয়ে যেতেই আমি যেন কর্তব্যজ্ঞান পেয়ে জানলার দিকে যেতে গিয়ে বাধা পেলাম।

আমি বুঝলাম যে আগন্তুকই আমার হাত চেপে ধরে. কাতরকণ্ঠে আমায় বললে. "খবরদার আপনি জানলায় যাবেন না. ওরা গুলি ছুঁড়বে"

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক. তার সুন্দর ইংরাজী উচ্চারণে সত্যই মুগ্ধ! বুঝলাম লোকটি লেখাপড়া ওয়ালা।

আবার বললে "ওরা আমায় ধরতে আসছিল. আমি কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আপনার এখানে ঢুকে পড়েছি।"

অন্য ক্ষেত্র হলে আমি তৎক্ষণাৎ পুলিশ ডাকতাম কিন্তু—লোকটির এমনই অবস্থা যে অমন ধরনের কোন একটা কিছু করার কথা মনেই হল না। লোকটি তখনও ভয় জড়সড়। আমিও এতক্ষণ বাদে ভালভাবে তাকে খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়ে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম।

সমস্ত
বলতে
একটা ঘটনা
যুবকের কথাও আমার
কোন মানেই না।
আমি তাকে প্রশ্ন করলাম "দেখ এমন
পারে তোমায় পুলিশে তাড়া
তুমি হয়ত চুরি"

যুবক সত্যই যেন সাদা হয়ে গেল. বলেছিল যে তার নাম সেং কিং পিঙ... এবং তার বাবা এখানের হো ফেঙ-লিঙ. যিনি ডিফেন্স কমিশনার ছিলেন তারই

আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আজ যখন সে সন্ধ্যার ক্লাস করে ফিরছিল হঠাৎ দেখে চারজন লোক ছোরা এবং রিভলভার হাতে তার পিছু নিয়েছে। লোকরা তাকে বেশ করে ধরে, সে তাদের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করে কোনক্রমে পালায়। কিন্তু তারা ওর পিছন পিছন তাড়া করে, সেও ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছিল, এবং আমাদের বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে সে সোজা আশ্রয় নেবার জন্য ঢুকে পড়ে। এবং এখন যদি সে রাস্তায় বার হয় নিশ্চয়ই তাকে অপহরণকারীরা ধরবেই।

দেং-এর কথা শোনার পরই আমি উঠে গিয়ে পুলিশকে টেলিফোন করলাম। টেলিফোন করার কয়েক মিনিটের মধ্যে ফরাসী পুলিশের দুরোস বলে একজন ডিটেক্টিভ এসে হাজির। দুরোস খবর নিল যে, এ তল্লাটে দুর্বৃত্তদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবার হুকুম সে দিয়েছে, এই-সঙ্গে দুরোস একথাও প্রকাশ করলে যে সে দেং-এর জবাবদিহির ওপর খুব বিশ্বাস করছে না এবং সে তাকে নিজে জিজ্ঞেস করে দেখতে চায়।

পুলিশ অফিসারকে দেখে দেং-এর শুকনো ভাবটা আর ছিল না। সে বেশ সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুখে ভয়ডর নেই। পুলিশ অফিসার দুরোসের প্রশ্নের উত্তর বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে দিতে লাগল।

দেং-এর উত্তর অদ্ভুত রোমাঞ্চকর, তার বাবা বেশ কিছুদিন ধরে একটার পর একটা চিঠি পাচ্ছিলেন। চিঠির বক্তব্য সাধারণ, সহজ ভাষায় শক্ত কথা লেখা। টাকা চাই। প্রথম প্রথম এই সব চিঠিকে তার বাবা কোন পাত্তাই দেননি: পরে, ক্রমে ক্রমে, আরও ভয়ংকর চিঠি এল, 'এক লক্ষ ডলার দিতে হবেই' এই টাকা শহরের এক চায়ের দোকানে বেলা পাঁচটার আগে পৌঁছে দিতে হবে যদি তা না দেওয়া হয় তাহলে তার পরিবারের ভয়ংকর ক্ষতি হবে" দেং থামল। এইটুকু বলার পর সে বলেছিল "অবশ্য আমার বাবা এ পর্যন্ত কোন টাকাই পাঠাননি।"

এই সময় বাইরে রাস্তায় ভারী পদশব্দ এসে স্থির, আমরাও উদগ্রীব। পরক্ষণেই হঠাৎ একজন চীনা কনেস্টবল ঘরে ঢুকল—খবর দিলে আমরা যতটা সম্ভব ভাল ভাবে এ তল্লাটের অলিগলি দেখেছি, কিন্তু দুর্বৃত্তদের কোন হদিস করতে পারলাম না।

কনেস্টবলের কথা শোনার পর দুরোস উঠতে চাইল, আমি তাকে অনুরোধ করলাম, যে দেংকে দুজন পুলিশ দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হোক। কারণ মনে হয় ওর ধারণা দুর্বৃত্তরা ওকে ধরবার জন্য ওৎ পেতে আছে দুরোস রাজি হয়েছিল।

দেং যাবার সময় আমায় অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বললে, "আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম··"

"অত কিন্তু কিন্তু করবার দরকার নেই··বরং আমি নিজে তোমাদের দেওয়া চিঠিগুলো দেখতে পেলে খুব খুশী হব —যদি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি তাহলে খুব আনন্দ অনুভব করব"

দেং অভিবাদন করে বিদায় নিল। বিদায় নেবার সময় সে বলেছিল কাল আসব।

সকাল হয়েছে। একটি বিরাট গাড়ি

এসে আমাদের বাড়ির সামনে থামল। এবং যে লোকটি দরজা দিয়ে ঢুকল তাকে দেখে আমি অবাক। দেং-কিং পিঙ অসম্ভব স্মার্ট, অসম্ভব স্পষ্ট! আমি নিজে কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না গতকাল রাত্রে এই লোকই আমার ঘরে ভয়ে কেঁচো।

তার পরণে খুব শৌখীন ইংরেজী ছাঁটের পোশাক, মাথায় স্টিটসন টুপি একেবারে আদব কায়দায় অন্য মানুষ। মুখে কোন ভীতির চিহ্ন নেই শুধু গত-কাল রাত্রে বিপদের সময় চোখের উপরে একটু ছড়ে যাওয়ার দাগ।

আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বললে "বিপদ এখনও কাটেনি, আজ ভোর রাত্রে গুণ্ডারা আমাদের বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল, আমরা যথাসময় খবর পেয়েই পুলিশ ডাকি...আমাদের বাড়ির একজন চাকর তাদের সঙ্গে মারপিট করার ফলে ভয়ঙ্কর ভাবে জখম হয়েছে··কিন্তু তারা দমবার পাত্র নয়—যাবার সময় সদর দরজায় একটা কাগজে লিখে রেখেছে আজ যদি টাকা না দেওয়া হয় ··"

এরপর বলেছিল আমার বাবা আপ-সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি শয্যাশায়ী অসুস্থ...যদি দয়া করে আমাদের বাড়ি একবার আসেন—আমার গাড়ি আছে·· কাছেই বাড়ি—আপনাকে পৌঁছে দেবো"

দেং-এর কথায় বেশ বোঝা গেল বেচা-রারা আমার সাহায্য চায়, আমার খানিকটা ডিটেক্টিভগিরি করতে বেশ ইচ্ছেও হচ্ছিল, এছাড়া দেং-এর উপর আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল, তাই নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না।

গাড়িতে উঠে বসতেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি বিরাট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, গেট দিয়ে ঢুকে একটি প্রকান্ড সুন্দর বাগান পার হয়ে গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নেমে, সামনের দরজায় যেখানে আজ ভোর রাত্রে গুণ্ডারা চিঠি ঝুলিয়ে দিয়েছিল সে জায়গাটা দেং দেখাল। তারপর দরজা পার হয়ে আমরা একটি করিডোরে এলাম এবং এর পর পর্দার পর পর্দা দিয়ে ঢাকা অনেক গুলো পর্দা ভেদ করে অবশেষে একটা দরজার সামনে এসে দেং খুব আস্তে আস্তে টোকা মারল।

একজন চীনা চাকর দরজা খুলে দিলে, আমরা প্রবেশ করলাম। ঘরটি অসম্ভব বড়, লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফিট চওড়ায় তিরিশ। এমন শৌখীন ঘর অর্থাৎ হল আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি, পা ভেলভেটের কার্পেটে যেন ডুবে যাচ্ছে, দেওয়ালে সোনার সুতোর কাজ করা টেপসট্রি—কোথাও ডিভান, কোথাও নিখুঁত কাজ করা টেবিল, কোথাও সুন্দর চেয়ার—জানলার কাছে কাল কাঠের টেবিলের উপর বড় চাদানী-এবং এক কোণে 'চাব' কোম্পানীর বিশাল সিন্দুক।

হলের একান্তে একটি দামী খাটে, দেং-এর বাবা শুয়েছিলেন। পাশেই তার চাকর দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখেই কোন-মত একটু সোজা হলেন, আমাকে অভি-বাদন করার পর চাকরকে যেতে বলেন।

ভদ্রলোকের বয়স এমন কিছু হয়নি, কিন্তু মুখের চেহারায় মনে হল বেশ বয়স হয়েছে, চিন্তায় চিন্তায় কাহিল। মনে হয় অনেকরাত ঘুম হয়নি। ভদ্র-লোকের গলার স্বরে বেশ একটা উদগ্রীব

ভাব ছিল, বললেন "আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আমার ছেলের জন্য গত রাত্রে আপনি যা করেছেন তা কেউ করে না, তা ছাড়া আপনি যে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ, আমার সত্যিই কিছু টাকা পয়সা আছে, দেং আমার একমাত্র পুত্র, ওর যদি কিছু হয় তাহলে আমি সত্যিই মারা যাব..."

এইটুকু বলে ভদ্রলোক হাঁফাতে লাগলেন, তারপর একটু ঠিক হয়ে বললেন "কিছুদিন হল আমি একটার পর একটা চিঠি পাই, টাকা চাই লেখা, গতকাল পর্যন্ত আমি কোন পাত্তাই দিইনি, কিন্তু কালকে রাতের ঘটনার পর এবং আজ ভোর রাত্রের চিঠি আমাকে যেন পিষে ফেলছে...নিশ্চয়ই ও আপনাকে সে কথা বলেছে..."

আমি বললাম "আজ্ঞে দেং বলেছে।"

"শেষ চিঠিতেও লেখা এক লাখ ডলার আজকের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে,—এক লাখ ডলার কি কম কথা? আর এইটুকু সময়ের মধ্যে আমি যোগাড় করবই বা কি করে? তাছাড়া গুণ্ডাদের টাকা দেওয়া আমার কোন মতেই ইচ্ছে নয়...আবার একথাও যখন ভাবি একদিন না একদিন এই গুণ্ডারা তাদের কার্যসিদ্ধি করবেই—চীনে পুলিশরা ওদের কিছু করতেই পারবে না, আমি কয়েকজন ডিটেক্টিভ লাগিয়েছিলাম কিন্তু তারা সবাই কোন কাজের নয়।" বলে ভদ্রলোক আশায় আমার দিকে চাইলেন। তাঁর ইংরাজী খুব ধীরে ধীরে উচ্চারিত হলেও অদ্ভুত স্পষ্ট এবং পরিষ্কার।

আমি বললাম..."যে সব চিঠিগুলো ওরা এ পর্যন্ত পাঠিয়েছে সেগুলো একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়"

তাঁর নিশ্চয় বলার সঙ্গে সঙ্গে দেং সেই সিন্ধুক খুলে একতাড়া চিঠি নিয়ে এল। প্রত্যেকটি চিঠিই হলদে কাগজে চীনে ভাষায় লেখা। যে চিঠিটা আজ ভোর রাতে পাওয়া যায় সেটার অনুবাদ করতে বললাম। দেঙ অনুবাদ করলে।

"আমরা ১০০,০০০ ডলার চাই, গোল্ডেন ড্রাগন টি-হাউস, (রেস্টুরেন্ট) ওয়েস্ট গেট, রাত ১২টায় পৌঁছান চাই! না যদি পাই তাহলে বিপদ ঘটবে।"

'কালো হাত'

কালো হাত কথাটা লেখা ছিল না, তার পরিবর্তে একটি বড় বড় বাঁকা নখ ওয়ালা হাতের ছবি আঁকা ছিল। অন্য অন্য চিঠিতে ঠিক একই কথা লেখা, এবং স্বাক্ষরের জায়গায় সেই বাঁকা নখওয়ালা হাতের ছবি। টাকা পৌঁছবার কথা প্রত্যেক চিঠিতেই এক জায়গার কথা—মানে গোল্ডেন ড্রাগন টি হাউস ঠিকানাই ছিল। গুণ্ডারা যে বেপরোয়া এবং কোন আক-ঢাক নেই তা স্পষ্ট, আমার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা কথা খেলে গেল, দুরোস ফরাসী ডিটেক্টিভকে এবং আর দু'চার-জনকে নিয়ে যদি আজই রাত্রে গোল্ডেন টি-হাউসে যাওয়া যায় তাহলে?

চিঠিগুলো ফেরত দিয়ে আমি ভদ্র-লোককে আমার ফন্দীর কথা বলে বললাম দেং যদি আমাদের সঙ্গে যায়। দেং খুব ইচ্ছুক, কিন্তু তার বাবা এমনভাবে যাওয়া একেবারেই পছন্দ করলেন না বললেন "গুণ্ডারা আপনি জানেন না, ভয়ঙ্কর লোক যদি তাদের হঠাৎ এইভাবে আক্রমণ

করা হয় তাহলে তারা ছেড়ে কথা কইবে না; আমার কথা যদি শোনেন আমি বলব তাদের আস্তায় না যেতে, শেষে হিতে বিপরীত হবে···"

"আপনি অত ভাবছেন কেন, আমরা ত একলা নই, সঙ্গে দুরোস আছে সেই সব ব্যবস্থা করবে, আপনার কোন ভাবনা নেই, এতে খারাপ কিছু হবে না ভালই হবে।"

ভদ্রলোক অগত্যা রাজী হলেন।

তখন বেশ রাত হয়েছে, ১২টা বাজেনি। আমরা চারজন চলেছি। দুরোস এবং তাঁর সহকারী ওয়াঙ—ওয়াঙকে আমি চিনি সে একজন এসব বিষয়ে পাকা লোক, খুব চতুর ডিটেক্টিভ—আমি এবং দেঙ। সাংহাইএর ভয়াবহ আঁকা বাঁকা অলি গলি দিয়ে চলেছি ওয়েষ্ট গেটের দিকে। চারদিকে নিশুতি শুধু আমাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল আমরা যেন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে যাচ্ছি। পথের শেষ নেই। খানিকটা পার হবার পর আবছায়া আলোয় দেখা গেল একপাশে খড়ো ঘর এবং অন্য পাশে গোল্ডেন ড্রাগন টি হাউস! আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

আকাশে চাঁদ ছিল না, সারা আকাশ জুড়ে অনেকটা ধোঁয়াটে ভাব, তারাগুলি চোখে পড়ে না। কোথাও সাড়াশব্দ নেই শুধু ক্রমাগত ব্যাঙের ডাক এবং রাস্তার কুকুরের আওয়াজে আবহাওয়া অত্যন্ত রহস্যময়। লক্ষ করে দেখলাম কেউ কোথাও নেই, গোল্ডেন ড্রাগন টি হাউসে মিটমিট করে আলো জ্বলছে, কিন্তু ঘর ফাঁকা। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

কি কর্তব্য! দুরোস এবং আমি পরামর্শ করলাম, দেং এবং ওয়াঙ টি-হাউসের মধ্যে যাক। আমাদের কখন যেতে হবে তারা ইসারা করবে। চার-জনেই ঢুকে ওদের সন্দেহ ভাজন হবার কোন প্রয়োজন নেই।

যেখানে আমরা গা-ঢাকা দিয়েছিলাম সেখান থেকে টি-হাউসটির ভিতর পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। ঘরটা বেশ বড়, ঠেসাঠেসি করে চেয়ার টেবিল পাতা একপাশে একটা উনুন, তার উপর বড় একটা জল গরম করার ট্যাঙ্ক মত, একটি মাত্র কেরাসিন তেলের আলো ঝুলছে। এবার দেখা গেল, দুজন বীভৎস ধরনের চেহারা দুজন চীনে, পায়চারি করছে—মুখে কথা নেই। আর একটু ভাল করে নজর করে চেয়ে দেখি এক কোণে আর একজন নির্বিকারভাবে একটা লম্বা পাইপ টানছে। আমি দুরোসকে বললাম আমার মনে হয়—ওই লোকটাই দলের সর্দার।

ইতিমধ্যে ওয়াঙ এবং দেং দুজনে চায়ের দোকানে ঢুকে বেঞ্চিতে বসল। বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই দেংকে দেখে চিনতে পেরে, তাড়াতাড়ি উঠে এল। যখন ওরা খানিকটা এসেছে এমন সময় আমরা ওয়াঙের কাশির আওয়াজ পেলাম। পকেটের রিভলভার হাতে নিয়ে আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চাখানায় ঢুকলাম। ওয়াঙও প্রস্তুত ছিল সেই প্রথমে রিভালভার উঁচিয়ে বললে, "খবরদার হাত তোল!"

আমরা বেশ জায়গা মত তখন ছড়িয়ে

ছিলাম, এবং এ কথাও মনে হয়েছিল, ভয়ংকর গুণ্ডাকে খুব সহজেই ধরা যাবে না। সে চালাকি খেলবেই, এবং সত্যিই দেখলাম হাত তোলার আগেই তার হাতে চক চক করে উঠল রিভলভার, আমরা কেউ ঘোড়াটেপার আগেই একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার, আর কাঁচ ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল! আমি হতবুদ্ধি। এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি যে ঘটল, তা বুঝতে পারলাম না। সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।

হতচকিত হয়ে শুধু শুনতে পেলাম বেঞ্চি আর টেবিলের ধাক্কা ধাক্কি উল্টান-পাল্টানো শব্দ, এই প্রলয়ের মধ্যে কে যে কোথায় আছে তা বুঝেই পাওয়া দুষ্কর। বন্দুক চালাব তার উপায় নেই, কারণ যদি নিজের লোকের গায় লাগে!

সেখানে দলের সর্দারটা ছিল সেই জায়গাটা আন্দাজ করে আমি এক লাফ দিলাম, কাণ্ডজ্ঞানহীনতাই প্রমাণ হল। হুড়মুড় করে টেবিল বেঞ্চি নিয়ে একেবারে মাটিতে; এই সময় কে একজন দেশলাই জ্বালাল, দেখি, গুণ্ডা তিনজন রাস্তায় নেমে পড়েছে। আমি তাদের তাক করে গুলি ছুঁড়লাম, দুরোসও গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু বিফল হল। তাদের আর দেখা গেল না।

দুরোস বললে "চল, চল," বলার সঙ্গে আমরা তাদের পিছন পিছন—অন্তত মনে হয়—ধাওয়া করলাম, তারা আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে চোখের বাইরে চলে গেল। আমরা গলি পার হলাম। দেখি, গলি ভাগ হয়ে দুদিকে গেছে। দুদিকই ফাঁকা। গুণ্ডারা আমাদের বোকা বানিয়ে হাওয়া।

রাস্তায় কুকুরের ডাক নেই কিছু নেই। লোক নেই যে জিজ্ঞাসা করি, কোথাও পদশব্দ নেই যে তাই লক্ষ্য করে যাই। এমন সময় শুনলাম ঠিক বারোটা বাজল।

দুরোস বললে "আজ আর থাক্, আমাদের কলা দেখিয়েছে চল ফিরি"

আমরা কয়েকজন আস্তে আস্তে বড় রাস্তার দিকে ফিরে এলাম যেখানে দেং গাড়ি রেখেছিল। গাড়িতে উঠে দুরোস বললে "সাংহাইতে 'কালো হাত' গুণ্ডার দল ভয়ংকর! হাতে-নাতে কখনও যাদুদের ধরবার সুযোগ পাইনি। বলে রাখলাম আর বেশী দিন নয়।"

আমার নিজের কিছু বলার ছিল না। আজই সকালবেলা, ওদের কাজকর্ম দেখে মনে হয়েছিল খুব সাদামাটা মোটা বুদ্ধির গুণ্ডা। কিন্তু এমনভাবে যে তুড়ি মারবে তা ভেবেই পাইনি। বার বার আপসোসে হাত কামড়েছিলাম।

এর পর এক সপ্তাহ বেশ ঠাণ্ডা-ভাবেই কাটল। এমন সময় আমাকে সাংহাই ছেড়ে যেতে হবে তা ভেবে পাইনি, কারণ ওদের সঙ্গে তখন একটা খুব সঙ্গীন খেলা চলেছে। যাই হোক যাবার আগে আমি দেং-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেং আমাকে একটা সোনার ঘড়ি উপহার দিলে—ঘড়িতে আমার নাম খোদাই করা ছিল—আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিল আর বোধহয় 'কালো হাত' আমাদের বিরক্ত করবে না, সম্ভবত ওরা বেশ টের পেয়েছে। আমি নিজে দেং-এর মত অতটা স্বস্তি বোধ করিনি, বললাম

"তবু দেখ সাবধানে থাকা ভাল, ওরা খুব যে বোকা তা নয়"

দেং হেসেছিল।

বাইরের কাজ সেরে আমি আবার মাস দুয়েক ত বটেই তারপরে সাংহাই-এ ফিরে এলাম। ফিরে এসেই আমি সোজা আমার বন্ধু মঁসিয়ে দুরোস ফরাসী ডিটেক্টিভের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মঁসিয়ে দুরোস বাড়িতেই ছিল। জিজ্ঞেস করলাম কালো হাতের খবর কি? দেং এখন নির্ঝঞ্ঝাট কিনা!

মঁসিয়ে দুরোস ম্লানভাবে বললে, "খবর অনেক, দেংকে কালো হাতের দল, বেশ কিছুদিন হল ধরে নিয়ে গেছে, এখন তাদের চাহিদা মোটা, বলে দুলাখ ডলার না দিলে ছাড়া হবে না, দেং-এর বাবা দুদিন আগে ছেলের শোকে মারা গেছেন।"

"বলেন কি দেং কবে নাগাদ ধরা পড়ল"

"আজ থেকে ঠিক দুমাস আগে। মনে পড়ে যে রাতে আমরা গোল্ডেন ড্রাগন টি-হাউস ঘেরাও করতে যাই; তার বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত তাদের কোন পাত্তাই ছিল না, কিন্তু তারপরই হঠাৎ একদিন খবর পেলাম দেংকে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং সেই দিনই 'কালো হাত' আঁকা চিঠি এল, দু লাখ ডলার পেলে দেংকে ফিরে পাওয়া যাবে।

কালো হাত তাঁকে, দেং-এর বাবাকে, দুমাস সময় দিয়েছিল। তার মধ্যে যদি টাকা না পাওয়া যায় তাহলে দেং-এর মৃত্যু নিশ্চিত। আমার মনে হয় তা ওরা পারে। আমি এমন ঘটনা বহু জানি। তবু এখনও আমাদের হাতে এক সপ্তাহ আছে, দেখা যাক বেচারা দেং-এর ভাগ্যে কি আছে? আমার সহকারী ওয়াঙ এ বিষয়টি হাতে নিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করছে, ওদের আস্তানার হদিশ পেয়েছে, শীগগিরি আমরা চড়াও করব।"

"মঁসিয়ে দুরোস তাহলে আমায়ও একটা খবর দেবেন, যদি কোন কাজে লাগি"

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল! রাত নিশুতি, ঘড়িতে তিনটে বাজে। আমি টেলিফোনটা ধরলাম। গলা পেলাম মঁসিয়ে দুরোসের "এত ভোরে জাগানর জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, ওয়াঙ কালো হাতের আস্তানা খুঁজে পেয়েছে। এরা খামার বাড়িতে আছে, হাঁ কেনয়ান রোডের উপরে, যাবে? বেশ আমরা বার হচ্ছি যাবার পথে রুত স্লেলুপ আর রু পের রোবেয়ার-এর মোড়ে ঠিক ঠিক! রিভলভার নেওয়া চাই।"

সাংহাই-এর রাত তিনটের রাস্তা আমি একা। হঠাৎ বিরাট লরী করে চীনে পুলিশ ডিটেক্টিভ এসে দাঁড়াতেই আমি উঠে পড়লাম, গাড়ি দ্রুতগতিতে চলল কেনয়ান রোডের দিকে।

মঁসিয়ে দুরোস বললে "ওয়াঙের খবর —ওরা বেশ তৈরি, বন্দুক রিভলবার ত বটেই তাই আমি আর হেলাফেলা না করে, এদের নিয়েছি।

গাড়ি একটা জায়গায় এসে থামল। মঁসিয়ে কে ওয়াঙ, প্রায় সিকি মাইল দূরে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি দেখাল। চাঁদের আলোয় আবছায়া। আমরা সবাই ছড়িয়ে পড়লাম বেশ সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছি। ঝোপের পর ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে। বেশ খানিকটা কাছে এসে মঁসিয়ে দুরোস আমায় বললে, "দেখ, খামার

বাড়ির দরজা আলোতে দেখা গেল একটা লোক পায়চারি করছে। নিশ্চয় পাহারায় আছে।"

লোকটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খানিক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, দরজাটা খুলে ভিতরে চলে গেল। নিশ্চয়ই কিছু সে সন্দেহ করেছে বেশ বোঝা গেল। এই অবসরে আমরা যখন আর একটু এগিয়েছি তখন ওয়াঙ, বেশ চীৎকার করে বললে "বাড়িতে যারা আছ বার হয়ে এস।"

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনটি গুলির আওয়াজ এল।

তৎক্ষণাৎ আমাদের হুইসিল বেজে উঠল। আমাদের তরফ থেকে, গুলির ঝড় বয়ে গেল। ওরাও থামবার পাত্র নয়! বেশ ভালভাবে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। তার কারণ, ওরা আড়ালে আর আমরা ফাঁকা মাঠে, ঝোপ ঝাড় ত আড়াল নয় বরং আরও বিপদজনক। বেশ এই-ভাবে গুলি চালাচালির পর মঁসিয়ে দুরোস বললে: "এভাবে হবে না, ক্রমে সকাল হয়ে আসবে আমরা—অনেক লোক হারাব—ওয়াঙ এক কাজ কর বাড়ির দুটো দরজা, এসো দুদলে ভাগ হয়ে আমরা একেবারে ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু এত দ্রুত যেতে হবে ওরা যেন নিশানা করার সময় না পায়।

আমাদের দল এমনভাবে ভেঙে পড়ে এগিয়ে গেল যে ওরা বিশেষ সুবিধে করতে পারলে না। আমি এক দরজায় অন্য দরজায় মঁসিয়ে দুরোস। ঘরে ঢোকার পরই গুলির আওয়াজ থামল। একে একে কালো হাতের গুণ্ডারা যখন বার হচ্ছে, ইতিমধ্যে দরজার পুলিশকে আচমকা গুলি করে পালাতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরলেও পুলিশ বেচারী তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে।

মাটির তলার ঘরে আলো নিয়ে দেখলাম এক কুবের ভাণ্ডার, সেখানে দেং এবং আরও দুজন যুবক হাত-পা বাঁধা পড়ে আছে? তাড়াতাড়ি তাদের আমরা মুক্ত করলাম।

এর পর কালো হাতের দলের সাংহাই-এ কোন চিহ্ন ছিল না।

[ ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন

# সমালোচনা সইতে পারেন

অসীম বর্ধন

'...আমার কাজের ভুল ধরতে এসো না! আমি ওসব পছন্দ করি না!...' আপনি কি এমন কথা বলেন? হয়তো, এতখানি কথা দিয়ে নয়, কিন্তু আপনার মুখ সিটকানো বা শক্ত করে চাপা ঠোঁট দেখেই কি সেই বিরক্তির মনোভাব প্রকাশ পায়? চোখের মধ্যেও সেই বিরক্তি নীরবে প্রকাশ পেতে পারে, পেতে পারে আপনার কণ্ঠস্বরেও।

নিজের সমালোচনা শুনলে যদি আপনি এরকমভাবে কোন বিরক্তি 'প্রকাশ' না করেন, তাহলে সত্যিই সাধারণ মানুষের চেয়ে আপনি বেশ কিছুটা বিশেষ ধরনের। নিঃসন্দেহে এই গুণটি আপনার বৈশিষ্ট্য। আর ধরুন, কোনরকম সৌজন্যের মুখোস না রেখেই কেউ আপনাকে সোজাসুজি বলে বসল, 'তোমাকে এ আলোয়ানটা মোটেই মানাচ্ছে না, কী যে পছন্দ করে কিনেছ!' কিংবা বলল, 'তোমার দ্বারা সাতজন্মেও কবিতা লেখা হবে না, এজন্মটা অন্তত ছড়া মক্স করেই কাটাও!'—তখন যদি আপনি কোনরকম বিরক্তি 'বোধ' না করেন, তাহলে আপনি অবিশ্যি একজন শ্রেষ্ঠমনা ব্যক্তি; এবং আপনি তাহলে এই প্রবন্ধটির বাকীটুকু না পড়েই ছেড়ে দিতে পারেন। সেই সময়টুকু বরং ভাবতে পারেন, কি করে আপনার মধ্যে এই শ্রেষ্ঠত্ব এলো?

সমালোচনা সইতে না-পারাটা আমাদের মধ্যে বড়ই ব্যাপক হয়ে পড়েছে। যিনি সমালোচনা সইতে পারেন এবং সেই সমালোচনা থেকে লাভবান হতে পারেন, তিনি তাঁর নিজের মনকে অনেকখানি ভালোভাবেই বোঝেন, একথা মানতে হবে। তিনি স্পষ্ট জানেন যে, স্বাভাবিকভাবে এবং সর্বাঙ্গীণভাবে প্রতিটি সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারার কৌশলটি শিখতে পারলেই শান্তিপূর্ণ জীবনের পথে আমাদের মস্তবড় একটি বাধা চিরতরে সরে যাবে।

তবে, মতামত প্রকাশ করা এ জগতের মানুষের স্বাভাবিক নিয়ম, নিতান্তই স্বাভাবিক; স্বভাবসিদ্ধও বলতে পারেন। ভালোই হোক আর মন্দই হোক, আমাদের সকলেরই নিজস্ব মতামত আছে, অভিমত আছে; এবং আমরা তা প্রকাশ করেও থাকি। তবে যদি আমরা অন্য লোকের

অভিমতে মনঃক্ষুণ্ণ হই, তাহলে মনে রাখতে হবে, ঠিক তেমনি আমরা যেসব অভিমত প্রকাশ করি, তাতে অন্য লোকও মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারে!

একথাটা ঠিক যে, মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার মতো সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিচ্ছাসত্ত্বেই হয়ে যায়। ঠিক খুঁত ধরবার জন্যে, চোখে আঙুল দিয়ে ভুলটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যে, বলি না; নিতান্তই স্বতঃস্ফূর্ত অভিমত প্রকাশ করি মাত্র। কিন্তু অভিমতটুকু কিভাবে গ্রহণ করলেন শ্রোতা, তার মধ্যেই, সেই গ্রহণ করার ভঙ্গির মধ্যেই থেকে যায় যতো মুস্কিল। অভিমানী স্পর্শকাতর লোক পিঠ সোজা করে বলে ওঠেন, 'তোমার এইরকম খুঁত ধরা আমি মোটেই সইতে পারি না!'...আপনি যথেষ্ট হাসিমুখেই বললেন, 'না ভাই, আমি বন্ধুভাবেই বলেছি।'...কিন্তু দুঃখের বিষয়, অভিমানী বন্ধুটির অহম্-বোধ সে যুক্তি গ্রহণ করতে পারবে না।

যে কোন সমালোচনা সইতে না-পারাটাই মানুষের স্বভাব। এ একরকমের প্রতিরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া (ডিফেন্স রিঅ্যাকশন)। আপনা থেকেই অবচেতনভাবে আমরা আমাদের অহম্-বোধকে প্রতিরক্ষা করি। শ্বাস নেওয়ার মতোই-সহজভাবে এটি আমরা করে থাকি। কিন্তু নিজের মনকে না বুঝে অহম্ প্রতিরক্ষা করার ফলে অনেকেই হয়ে পড়েন অভিমানী, খুব স্পর্শকাতর, আর সেটা দুর্বলতারই লক্ষণ। নিজের অভিমতকে এতটুকু অবহেলিত হতে দেখলেই এই অতি অভিমানী লোকেরা দারুণ অহম্-যাতনায় ছট্‌ফট করে ওঠেন, দিশেহারা হয়ে পড়েন। নিজের প্রতি অত্যধিক সুবিচার প্রত্যাশা করতে গিয়ে অন্ধ-স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়ে ফেলেন, কারণ অতিরিক্ত অহম্-বোধ থাকলে মানুষ সংকীর্ণমনা হয়ে পড়বেই।

সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি ঘটতে পারে যদি সেগুলি আমাদের বন্ধুদেরই থেকে আসে। একজন নতুন মানুষের মুখের প্রশংসা আপনার অহম্-বোধকে উল্লসিত করতে পারে, কথাগুলো বেশ উপাদেয় লাগতে পারে। কিন্তু একজন বন্ধুর মুখের একটা খাঁটি কথাও তিক্ত মনে হতে পারে, যদি তা আপনার অহম্‌কে বিন্দুমাত্র আঘাতের চেষ্টা করে। এই ধরনের মন্তব্য নিয়েই তো যতো ঝঞ্ঝাট যায় বেঁধে; মন কষাকষি, কথা কাটাকাটি, এমন কি মুখ দেখা বন্ধ—কতো কী-ই না ঘটতে পারে তা থাকে!

এর কারণ হতে পারে। আমাদের কাছের মানুষ আমাদের নিয়ে এভাবে বিশ্লেষণ করবে, এটা বোধহয় আমরা অন্যায় বলে মনে করি!

আসলে, বন্ধুর কাছ থেকে সমালোচনা এলে তাকে সবার আগে বিবেচনার মর্যাদা দেওয়াটাই শুভ। কারণ একজন বন্ধুর সমালোচনা সবসময়েই আমাদের অনুকূল। বন্ধুটি ভুল সমালোচনা করলেও তার কথা মন দিয়ে শোনার চেয়ে বড় কর্তব্য খুব কমই আছে।

সমালোচনামূলক মন্তব্যটি অগোছালো হতে পারে, হতে পারে অস্পষ্ট। কিন্তু তা যদি আমার মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তবে সে দোষ আমার নিজের। একটা বিরূপ মন্তব্য শুনে যদি নিজের মনের প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তবে সমালোচনাকারীর চেয়ে আমরা নিজেরাই বেশি দোষী হবো।

শ্রীকান্তবাবুর শরীর খুব খারাপ, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সন্তোষজনক ও শান্তিপূর্ণ নয়। তাই মন তাঁর অধিকাংশ সময়েই বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে, স্বভাবতই। তাঁর ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, তিনি যা করতে পারতেন, যা হতে পারতেন, কিছুই হচ্ছে না, কারণ চারিপাশের সব কিছুই যেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছে। আত্মবিশ্বাস ও সাহসের অভাব শ্রীকান্তবাবুকে দিনদিন যেন শ্রীহীন করে ফেলছে।

এই আত্মদীনতা আসলে দুর্বলতা ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরনের আত্মদীন মানুষ নিজের মর্যদা ও মূল্য সম্পর্কে ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে পড়তে থাকেন এবং শহীদের মতো আত্মদানের মহৎ উদ্দেশ্যের কাল্পনিক ছায়াতে নিজের দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সবসময়ে ভাবেন, 'আমাকে সকলে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। কেন, বুঝি না! বেশ, করুক। আমিও তাঁর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়ে আঘাত হানবো, তাতে যা হয় হবে!'...এই শহীদের মতো মনোভাব শ্রীকান্তবাবুর হতে পারে, আর পাঁচজন দুর্বল মানুষেরও হতে পারে। তবে এ মনোভাব দুর্বলতাকে কেবল আরও দুর্বল করে, একথা যেন না ভুলি।

অথচ বন্ধুর সমালোচনাকে আমাদের অহম্-বোধের কাছে যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ করে তোলা সম্ভব, যদি এটুকু ভাবতে পারি যে, বন্ধুটি যখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কথাগুলো বলছে, তখন সেটা তো তাঁর অন্তরঙ্গতারই পরিচয়, আমাদের প্রতি তাঁর আগ্রহেরই প্রকাশ। সমালোচনাকে আত্মগত করার মধ্যে যে সহনশীলতা থাকে, তাঁর আর এক নাম নির্ভীকতা, একথাটাও ভুলি কেন?

বন্ধু যদি বন্ধুর কাছে মন খোলার অধিকার না পেলো, তবে কি দাম সে বন্ধুত্বের? বন্ধুর সঙ্গেও মেপেজুপে কথা বলতে হবে, কখনও সে ভুল বুঝবে এই ভয়ে? এভাবে পোষাকী আদবকায়দা আর এটিকেট বজায় থাকতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের চিন্তার বিনিময় হতেই পারেন না। দুই বন্ধুর মধ্যে একজন যদি বোঝে অপরজন তার মন্তব্যকে খুশি মনে নেবার আগে ভালো করে ওজন করে কষ্টি পাথরে ঘষে নেয়, তাহলে বন্ধুত্ব ভেঙে যায়, শুধু কাষ্ঠহাসিটুকু বেঁচে থাকে।

সত্যিকারের বন্ধুত্বের পরিচয় হলো একাত্মতার লক্ষণ। সেক্ষেত্রে মতের মিল যদি হলো তো উভয়েরই অহম্ পায় পরম শান্তি। মতের মিল না হলেও তৃপ্তি আসে এই ভেবে যে, 'ও আমার কথা বেশ মন দিয়ে শোনে, শুনতে ভালবাসে; নিজের অনেক কথা নিঃশেষে আমায় বলে যায়, যেন আপনমনে নিজের সঙ্গেই কথা বলছে!'

এই মনোভঙ্গি দিয়ে যদি সমালোচনামূলক মন্তব্যকে আপনি গ্রহণ করতে পারেন, তবে নিশ্চিত আপনার অহম্-বোধ খুশি হবে। সমালোচনা শুনলেই কড়া জবাব দেওয়ার কষ্টকর তীব্র উদ্বেগ থেকে রক্ষা পাবেন, অভিমানী স্পর্শকাতরতার কবলে ছট্‌ফট্ করার অবসান ঘটবে।

অন্যজনে আপনার সম্পর্কে যা বলে, তার পাল্টা জবাব দেবার জন্য আগে থেকেই মনের মধ্যে প্রতিরক্ষাত্মক বালির বস্তা সাজাবেন না, বরং প্রতিরক্ষার তোড়জোড়টা

বেশ খানিকটা শিথিল করেই রাখুন! প্রতিরক্ষা দৃঢ়তর করবেন শত্রুর বিরুদ্ধে; কিন্তু আগেই বলেছি, সমালোচনা আপনার শত্রু নয়। মনে রাখবেন, লোকে যে বিষয়ে আগ্রহান্বিত নয়, যে বিষয়ে কোন মূল্য স্বীকার করে না, সে বিষয়ে কথা বলে তার সময় নষ্ট করতে মোটেই চায় না। বলে, 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে লাভ কি বাপু!'...তাই জানবেন, আপনজনই বেশি সমালোচনা করে, কারণ তারা আপনাকে নিয়ে ভাবে। আপনার ভালোমন্দ তাদের মনে নিশ্চয়ই দোলা দেয়।

এইভাবে নিতে পারলে অধিকাংশ সমালোচনাই হয়ে পড়বে উপহারের মতো লোভনীয়। যদি বন্ধু আপনার কবিতা পড়ে ভুল বা'র করে, তবে মনে রাখবেন, সে আপনার কবিতাকে মূল্য দিয়েছে বলেই সময় ও চিন্তা ব্যয় করে পড়েছে। তা'র সমালোচনার ভাষাকে অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করতে গেলে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন: কিন্তু উদার মনোভঙ্গি দিয়ে গ্রহণ করুন, সমালোচনার ভাষার পেছনে এক দরদী চিন্তার পরিচয় পেয়ে খুশিই হবেন।

সত্যি সত্যিই ভাষার কোন রঙ নেই, তাকে আমরা যেমন খুশি রঙে রাঙিয়ে নিতে পারি। নিজের দুর্বলতাকে বড় করে ভাবলে সমালোচনার ভাষা বিভীষিকার রূপ ধরবে। আর নিজের সামর্থ সম্পর্কে মনোবল অটুট থাকলে সেই সমালোচনাই আপনাকে শীতের সোনালী রোদের মতো উষ্ণ আবেশে মগ্ন করবে, সে-রোদ হোক না মধ্যাহ্নের, ভয় কি!

জগতকে আমরা যেভাবে মনের মধ্যে গড়ি, সেভাবেই তা চোখের সামনে ধরা দেয়। তেমনি ভাষাকে যে ভাবে রূপ দিই অন্তরে, সেভাবেই আমরা তার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করি। এই রূপ দেওয়ার কাজে যাঁর মন কুশলী শিল্পী, তিনি জানেন কিভাবে তীব্র স্পষ্ট সমালোচনার মশলা দিয়ে প্রশান্তিময় সার্থকতার শিখরে ওঠার সোপান গড়ে তোলা যায় ধাপে ধাপে।